কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা সাহিত্য পত্রিকা

পঞ্চম বর্ষ

১৯৭৭-৭৮

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্মরণ-সংখ্যা

ও

পুনর্মিলন উৎসব রচনাবলী

সম্পাদক

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ

কলিকাতা-৭০০০৭৩

সূচীপত্র

পুনর্মিলন উৎসব প্রবন্ধাবলী

BĀNGLĀ SĀHITYA PATRIKĀ

Research Journal of the Department of Bengali
University of Calcutta
Vol. V
1977-78

Edited by
Professor Asit K. Banerjee, M. A., Ph. D.
Saratchandra Chatterjee Professor and Head of the Department
of Bengali, Calcutta University

Published by Sri Dilip Mukhopadhyay for and on behalf of the Department of Bengali, Calcutta University at Asutosh Building, Calcutta-700073

Price : Rs. 10/- each copy
Subscription (For 5 years) : Rs. 40/-

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

১। মহাভারত (সঞ্জয় বিরচিত)—ডঃ মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত ৪০'০০

২। শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য সংস্কৃতি (কমলা বক্তৃতা) শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী ১২'০০

৩। মধ্যযুগের বাংলার সংস্কৃতি (কমলা বক্তৃতা) ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ৫'০০

৪। পরিজনপরিবেশে রবীন্দ্রবিকাশ—ডঃ সুকুমার সেন ৩'০০

৫। ছান্দসিকী—দিলীপকুমার রায় ৭'৫০

৬। জ্ঞান ও কর্ম—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৬'০০

৭। মঙ্গলচণ্ডীর গীত—ডঃ সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ১২'০০

৮। প্রাচীন কবিওয়ালার গান—ডঃ প্রফুল্ল পাল সম্পাদিত —১৫'০০

৯। ভারতীয় বনৌষধি—ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায় (১ম থেকে ৫ম খণ্ড)—৩০'০০ (প্রতি খণ্ড)

১০। গোবিন্দ বিজয়—ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ২৫'০০

১১। বাংলা অভিধান-গ্রন্থের পরিচয়—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য —১২'০০

১২। বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী—ডঃ নরেশচন্দ্র জানা ১৫'০০

১৩। দাশরথি রায়ের পাঁচালী—ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত —১৫'০০

১৪। চণ্ডীমঙ্গল (কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বিরচিত) ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত ১৫'০০

বিস্তৃত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ

৪৮, হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯

স্বর্গত অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী

১৮৯৫—১৯৭৮

একদা প্রথম যৌবনে এম. এ. ক্লাসে যাঁহার নিকট রসসাহিত্যের প্রথম পাঠ লইয়াছিলাম সেই সর্বজনপ্রিয় অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয় গত ১৯ মার্চ ১৯৭৮ সালে তিরাশি বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার পুরাতন ছাত্র-ছাত্রীরা এখনও তাঁহার প্রসন্ন মূর্তি মনে করিতে পারিবেন। মনে করিতে পারিবেন তাঁহার সরস অধ্যাপনাভঙ্গী, বিচিত্র কল্পনার ঐশ্বর্য, কৌতুকরসের ঝিকিমিকি। বস্তুতঃ তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্যভোগে নূতন দৃষ্টি দান করিতেন, সাহিত্যকে তত্ত্ব ও তথ্যের শিলাস্তূপ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার স্থাবর জড়ত্বকে রসের আনন্দবেগে গতিময় করিয়া তুলিতেন। সাহিত্য পাঠ যে কঙ্কালতত্ত্বের অস্থিপরীক্ষা নহে, পরন্তু তাহা একপ্রকার সৃষ্টিকর্ম, এবং সে সৃষ্টি দুই পক্ষেরই—অধ্যাপক এবং অধ্যেতার, তাহা আমরা পূজ্যপাদ অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়ের নিকট শিক্ষা করিয়াছি।

বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয় শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতের রসে বুঁদ হইয়া থাকিতেন। কখনো উতরোল রঙ্গকৌতুকে উচ্ছল হইয়া উঠিতেন, সহকর্মীদের লইয়া কত পরিহাস করিতেন। আমরা কৌতূহলী ছাত্রের দল আড়াল-আবডাল হইতে তাহার কিছু প্রসাদ পাইতাম। বস্তুতঃ তাঁহার ক্লাস সর্বপ্রকার গাম্ভীর্য পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রম্ভালাপের আসরে পরিণত হইত, অথচ কর্তব্যকর্মে কিছুমাত্র অবহেলা ছিল না। হাস্য পরিহাসের মধ্যেও শ্রোতাকে সর্বদা উৎকর্ণ হইয়া থাকিতে হইত, বুদ্ধিকে অতন্দ্র রাখিতে হইত।

বিশুদ্ধ শিল্পীর মন লইয়া তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কখনও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে, কখনও চিত্রকলায়, কখনও কথাসাহিত্য রচনায় মগ্ন থাকিতেন। সেকালের মাসিকপত্রে তাঁহার অঙ্কিত রঙিন চিত্র অনেকেই দেখিয়াছেন, তাঁহার গল্প-উপন্যাসও পড়িয়া থাকিবেন। তাঁহার প্রথম গল্পসংগ্রহ 'ব্যথা' ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। তারপর ক্রমে-ক্রমে এই গল্পসংগ্রহগুলি মুদ্রিত হয়—স্বপ্নশেষ (১৩৩৭), বহুরূপী (হাসির গল্প, ১৩৩৯), সেতু (১৩৪১)। একদা তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাসও (ঘরের

ডাক—১৩২৮, বৃন্তচ্যুত—১৩৩৬, ঘূর্ণি—১৩৩৮) পাঠকের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। তাঁহার দুইখানি প্রবন্ধগ্রন্থ (কাব্যে রবীন্দ্রনাথ—১৩৪১, কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ—১৩৫০), ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনের সীমা ছাড়াইয়া বৃহত্তর রসিক ও সমালোচকমহলে আদৃত হইয়াছিল। রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসবিশ্লেষণের প্রথম পর্যায়ে আমরা দুইজন লেখকের উপর নির্ভর করিতাম—অজিতকুমার চক্রবর্তী ও বিশ্বপতি চৌধুরী।

বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয় ১৯২১ সালে নন-কলেজিয়েট ছাত্র হিসাবে বাংলা এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী লাভ করিয়া উত্তীর্ণ হন। তারপর ১৯২২ সালে আংশিক সময়ের জন্য অধ্যাপকের পদ লাভ করিয়া বাংলা বিভাগে প্রবেশ করেন। ১৯৩২ সালে স্থায়িপদে যোগদান করিয়া ১৯৫৫ সাল পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়াছেন। তারপর অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি যেন লোকচক্ষু হইতে দূরে সরিয়া গেলেন। বাংলা বিভাগে কদাচিৎ আসিতেন। ইতিমধ্যে স্ত্রীবিয়োগ হইল, তিনি যেন আরও সঙ্কুচিত হইয়া নিজ ভাবনাচিন্তার মধ্যে তলাইয়া গেলেন, দৃষ্টিশক্তিও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, ফলে বাহিরের সহিত তাঁহার যোগাযোগও ছিন্ন হইয়া গেল। অধ্যাপনা হইতে অবসর গ্রহণের তেইশ বৎসর পরে অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী জীবনরঙ্গমঞ্চ হইতে চির-অবসর গ্রহণ করিলেন।

দেহাবসানের পর সত্ত্বান পুরুষের যে সদ্‌গতি প্রাপ্য নিশ্চয় তিনি তাহা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার গুণমুগ্ধ অগণ্য ছাত্র-ছাত্রীর দল তাঁহাকে আজীবন স্মরণে রাখিবে, শ্রদ্ধা নিবেদন করিবে। তিনি যে-লোকেই অবস্থান করুন, তাঁহার প্রসন্ন আননের শুভেচ্ছা ও দক্ষিণ পাণির আশীর্বাদ আমাদের উপরে বর্ষিত হইবেই॥
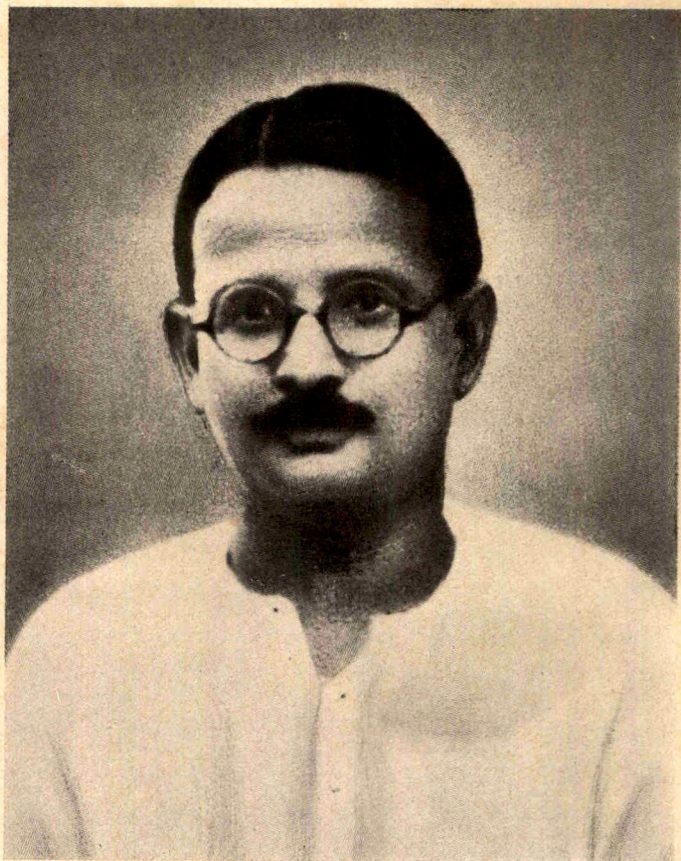
অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী

১৮৯৫—১৯৭৮

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
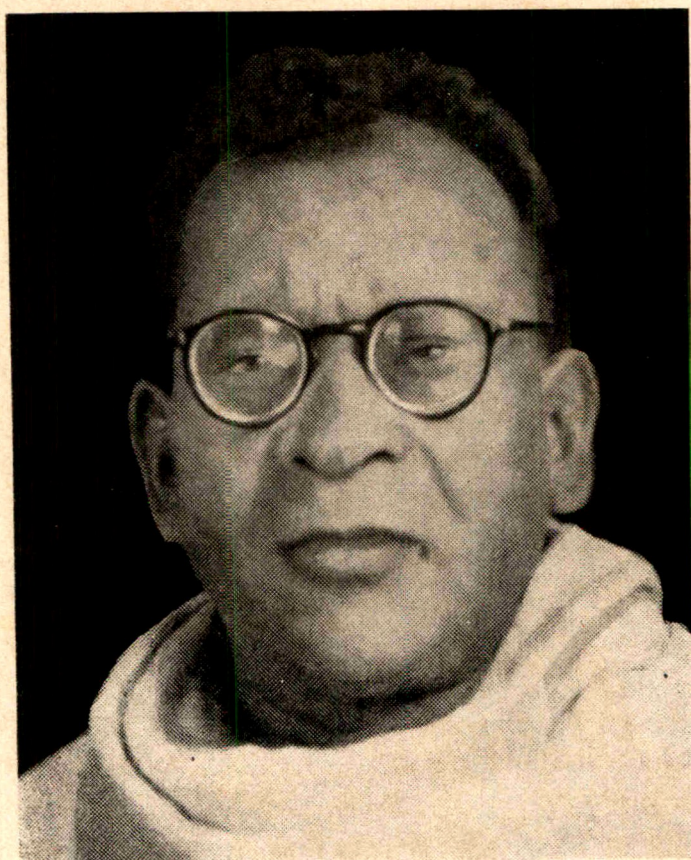
১৮৯০—১৯৭৭

ব্লক—শ্রীপ্রহ্লাদ প্রামাণিক'র সৌজন্যে

সম্পাদকের নিবেদন

প্রায় বৎসর ঘুরিতে চলিল সুনীতিকুমার নশ্বর জীবন ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। মানবিকী বিদ্যার শ্রেষ্ঠ ভারতীয় পথিকের জীবনান্ত হইয়াছে। বিশ্বের সারস্বত সমাজে যিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করিতেন, যাঁহার জীবন ও সাধনা হইতে বিশ্বের বিদ্বজ্জন ভারতাত্মার যথার্থ স্বরূপের সন্ধান পাইতেন, তিনি পূর্ণ গৌরবে অস্তমিত হইয়াছেন। আমাদের দুর্লভ সৌভাগ্য, তিনি বহু বর্ষ ধরিয়া বাংলা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার ছাত্রদের অনেকেই তাঁহার চরণমূলে স্থান লইয়া ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের গহন বনে প্রবেশের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে সারা দেশেই নানা চেষ্টা চলিতেছে। এই দিক দিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগেরও কিছু করণীয় আছে। সেই অভিপ্রায়ে 'বাংলা সাহিত্য পত্রিকা'র পঞ্চম বার্ষিক সংখ্যা (১৯৭৭-৭৮) 'সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্মারক সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত হইল। বিভাগীয় অধ্যাপকগণ তাঁহার বিচিত্র প্রতিভার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে এখানে কয়েকটি প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং সম্পাদকের অনুরোধক্রমে যথাসম্ভব শীঘ্রই শ্রদ্ধাঞ্জলি রচনা করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। এই সংখ্যার শেষাংশে বিবিধ বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ 'পুনর্মিলন উৎসব প্রবন্ধাবলী' শীর্ষক উপচ্ছেদে গৃহীত হইয়াছে। ১৯৭৬ সালে বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। উৎসবের স্মারক গ্রন্থের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং দু-একটি কলেজের অধ্যাপকগণ যে সমস্ত প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন, অনিবার্য কারণে তাহা তখন প্রকাশিত হয় নাই। উক্ত উৎসবও অনুষ্ঠিত হয় নাই, স্মারক পত্রিকাও প্রকাশিত হয় নাই। এখানে তাহা হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ নির্বাচিত করিয়া প্রকাশ করা হইল। এই নির্বাচনে বাংলা বিভাগের রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্র মহাশয় আমাদিগকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই 'পুনর্মিলন উৎসব প্রবন্ধাবলী' ও অন্যান্য প্রবন্ধ সম্পর্কে একটি কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছি। প্রবন্ধগুলিতে যে-সমস্ত অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা লেখকদের নিজস্ব মতামত বলিয়া গৃহীত হইলে বাধিত হইব।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : জীবনকথা

মানস মজুমদার

জন্ম ও বংশ পরিচয়

১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১১ই অগ্রহায়ণ (১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর), বুধবার, রাত্রি ২ দণ্ড ১০ পলে, বৃষরাশি ও বৃষলগ্নে, রোহিণী নক্ষত্রে, মাতুলালয় হাওড়া-শিবপুরে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। সেদিন ছিলো রাসপূর্ণিমা। পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের সময় তাঁর জন্ম।

প্রায় তিরিশ পুরুষ পূর্বের কথা। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে কাশ্যপ গোত্রীয় সামবেদী ব্রাহ্মণ বীতরাগ উত্তরপ্রদেশের কনৌজ থেকে আর চারজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বাঙলায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। বীতরাগের পুত্র দক্ষ। দক্ষের পুত্র সুলোচনকে গৌড়ের রাজা (খ্রীঃ ১১৫৮-১১৭৯) বল্লাল সেন বিশেষ সম্মান দেখান এবং পশ্চিম বাঙলার 'চাটুতি' গ্রামটি (বর্ধমান জেলা) দান করেন। "'চাটুতি' বা 'চট্টপুত্রিক' গ্রামের, সংক্ষেপে 'চাটু' গ্রামের 'জীব বা জীবক, জীয়া, জিয়া' অর্থাৎ মাননীয় ব্যক্তি—আধুনিক হিন্দীতে 'জী, জীউ'—ব'লে বংশপদবী 'চাটুর-জীয়া', চাটুর্জ্যা, চাটুর্জ্যে, চাটুজ্জে' সুলোচনের উত্তরপুরুষগণ প্রাপ্ত হন।"[১]

এঁদের অনেকেই বেশ নামী ছিলেন। কেউ কেউ ছিলেন বিশিষ্ট পণ্ডিত। বীতরাগ থেকে অষ্টম পুরুষে ছিলেন শ্রীকর, বৈদিক যজ্ঞ করে ইনি সম্মানসূচক অধ্বর্য্যু উপাধি পান। একাদশ পুরুষে অবস্থা সর্বেশ্বর, হুগলী জেলার দেশমুখা গ্রামের বাসিন্দা, স্বগৃহে টোল খুলেছিলেন। বিনা বেতনে ছাত্র পড়াতেন। ষোড়শ পুরুষে পরাশর। তাঁর ছোটোভাই জগন্নাথের বংশে পরবর্তী সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। অষ্টাদশ পুরুষে রবিকর, ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সর্বানন্দী মেলভুক্ত হন। তাঁর পুত্র বিষ্ণু শিকদার বরিশালের ঝালোকাঠি পরগণায় মুসলমান সুলতানের অধীনে কর্মরত ছিলেন। বিষ্ণু শিকদারের তিনপুত্রই কৃতবিদ্য। তাঁদেরই একজন যাদব সার্বভৌম। আর এই যাদব সার্বভৌমের বংশধর ভৈরবচন্দ্র (বীতরাগ থেকে ষড়বিংশ পুরুষ) সুনীতিকুমারের প্রপিতামহ।

কুলীন ব্রাহ্মণ-সন্তান ভৈরবচন্দ্রের বাস ছিলো ফরিদপুর জেলার পাংশা গ্রামে। সেকালের কৌলীন্য প্রথানুযায়ী অনেকগুলি বিয়ে করেছিলেন তিনি। এইসূত্রে এপার বাঙলায় তাঁর আগমন ঘটে। এখানে একাধিক বিয়ে করেন। তার একটি হলো হাওড়া জেলার সিংটি-শিবপুর সোনাগাছি গ্রামে। ভৈরবচন্দ্রের ঐ পত্নীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন ঈশ্বরচন্দ্র (আনু ১৮১৬-১৯০৬ খ্রীঃ); সুনীতিকুমারের পিতামহ ইনি।

১। জীবন-কথা—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শারদীয় যুগান্তর, ১৩৮৪, পৃ. ১৭।

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম শিংটি-শিবপুর সোনাগাছিতে, মাতুলালয়ে। ঐ গ্রামের কার্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা যাদুমণি দেবীকে বিয়ে করেন তিনি। কর্মসূত্রে কলকাতায় আসেন। এক সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নিয়ে উত্তর ভারতে যান। পরে কলকাতার Ewing কোম্পানিতে কেরাণীগিরি করতে থাকেন। কলকাতার বাহির সিমলার চালতাবাগান অঞ্চলে বাসগৃহ নির্মাণ করেন।[২] ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন দীর্ঘকায়, গৌরাঙ্গ, বেশ সুপুরুষ। স্পষ্টভাষী মানুষ। ফারসী, সংস্কৃত ও ইংরেজী জানতেন। সাহিত্য, পুরাণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান—নানা ধরনের গ্রন্থের ছোটোখাটো একটি সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন তিনি। পিতামহের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সুনীতিকুমার পেয়েছিলেন পুস্তক সংগ্রহের নেশা ও সাহিত্য-প্রীতি। পিতামহের মতো তিনিও ছিলেন স্পষ্টভাষী।

ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (খ্রীঃ ১৮৬২-১৯৪৫)। স্বামী বিবেকানন্দের কৈশোর ও প্রথম যৌবনের একজন সঙ্গী ছিলেন তিনি। হেয়ার স্কুল আর সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে সপ্তম-অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া-শিবপুরে নবগোপাল মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা কাত্যায়নী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল ছেড়ে টার্নার মরিসন কোম্পানিতে কাজ নেন। ১৮৮২ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত একটানা এখানে কর্মরত ছিলেন।

হরিদাস আর কাত্যায়নীর চার পুত্র দুই কন্যা। অনাদিকৃষ্ণ, সুনীতিকুমার, সুজ্যোতিনাথ, বাসন্তীকুমার, জীবনচণ্ডী ও জীবনতারা।

কাত্যায়নী ছিলেন সংস্কৃতিসম্পন্ন অভিজাত পরিবারের কন্যা। তাঁর পিতা নবগোপাল টার্নার মরিসন কোম্পানীর বড়োবাবু ছিলেন। তাছাড়া তাঁর একটি জমিদারীও ছিলো।

বেশিদিন বাঁচেন নি কাত্যায়নী। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। সুনীতিকুমারের বয়স তখন বারো বছর। পরলোকগতা জননীর স্মৃতিচারণ করে তাঁর 'জীবন-কথা'য় সুনীতিকুমার লিখেছেন—

> মায়ের চেহারা পুরোপুরি মনে আসে না, কিন্তু মুখের আর দেহাবয়বের আদল এখনও কতকটা যেন ভুলি নি। মাথায় ঘোমটা, ডাগর চোখ, হাসি হাসি মুখ, স্নেহভরা চাউনি—বড়োই মিষ্টি লাগত। আর মায়ের কাজের বিরাম কখনও দেখতুম না। রান্নাবান্না তো ক'রতেনই, নোতুন নোতুন অল্প খরচের কত রকম জলখাবার আমাদের জন্য ক'রতেন—একাজে ঠাকুমা তাঁকে সাহায্য ক'রতে আসতেন, কিন্তু মা তাতে বাধা দিতেন। সাজিমাটি দিয়ে কাপড়

২। একালের ৩-নম্বর সুকিয়াস রো। এখানে সুনীতিকুমার ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাস করেছেন। পরবর্তী সময়ে ১৬-নম্বর হিন্দুস্থান পার্কের 'সুধর্মা'য় বাস করতেন।

> বিছানার চাদর কাচা, গোবর কয়লার ঘেঁষ দিয়ে ঘুঁটের জন্য উনুনের গুল দেওয়া, ঘরের ঝাড় পোঁছ করা, ঝুল ঝাড়া, সেলাই করা, পশমের বোনার কাজ নোতুন এসেছে, সেই "উল-বোনা", খুঞ্চীপোষ তৈরী করা, কাঁথা সেলাই করা, লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না, তারি মধ্যে আমাদের বর্ণ-পরিচয় পড়ানো—মাকে কখনও ব'সে থাকতে দেখতুম না। তারই মধ্যে আবার তিনি সংসারের সুখদুঃখ নিয়ে "গান বাঁধতেন" তাঁর আঁকাবাঁকা অক্ষরের লেখায়—আজকাল-কার ভাষায় "কবিতা লিখতেন"—(শারদীয় যুগান্তর, ১৩৮৪, পৃ. ৩৪)

কাত্যায়নী যে শুধু গান রচনা করতেন তাই নয়, চমৎকার গানের গলাও ছিলো তাঁর। তাঁর পিত্রালয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা হতো। মাতুলালয়ের ঐ সাংগীতিক পরিবেশই সুনীতিকুমারকে উচ্চাঙ্গ সংগীতানুরাগী করে তোলে।

হরিদাস সামান্য বেতনের কেরানী ছিলেন। অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। কিন্তু গুণী মানুষ ছিলেন। ভালো বেহালা বাজাতেন। কবিতা রচনার ক্ষমতাও ছিলো। পত্নীর মৃত্যু উপলক্ষে গদ্যে-পদ্যে একটি মর্মস্পর্শী স্মরণিকা লেখেন।[৩] গ্রন্থপাঠে অবসর সময় কাটাতেন। ছেলেমেয়েদের জন্যও নানা ধরনের গ্রন্থ সংগ্রহ করে আনতেন। পিতামহের মতো পিতার কাছ থেকেও গ্রন্থপাঠ ও গ্রন্থ সংগ্রহের নেশাটা পেয়েছিলেন সুনীতিকুমার। আর উত্তর জীবনে পিতার সাদাসিধে জীবন যাপনের আদর্শটি অনুসরণ করেছিলেন।

ছাত্রজীবন

পাঁচ বছর বয়সে পাঠশালায় ভর্তি হন সুনীতিকুমার। পাঠশালাটি ছিলো একালের কৈলাস বসু স্ট্রীট আর রাজা রামমোহন সরণির সংযোগস্থলের পশ্চিমে যে শিবমন্দির আছে তার সামনে। গোলপাতার ছাউনি দেওয়া দুখানা ঘরে থাকতেন গুরুমশাই, সামনে ছোট্ট একটি বারান্দা। উঠোনে মাদুরের আসনে ছেলেরা পাঠাভ্যাস করতো। গুরুমশাই ব্রাহ্মণ, মাঝ বয়সী, খালি গা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, মাথায় টিকি। হাতে একখানা বেত নিয়ে দাওয়ায় মাদুরে বসে থাকতেন। এখানেই হাতেখড়ি হয় সুনীতিকুমারের—

> প্রথমটায় মাটিতে "দাগা বুলিয়ে" অর্থাৎ রামখড়ি দিয়ে গুরু-মশাই "অ, আ, ক, খ" সব লিখে দিতেন, সেগুলি খড়ি দিয়ে বুলিয়ে, পরে তালপাতায় খাগের কলমে লিখে, মা সরস্বতীর সাধনা শুরু হ'ল। (জীবন-কথা। শারদীয় যুগান্তর, পৃ. ২৬)

৩। সহধর্মিণী কমলা দেবীর মৃত্যুতে (মৃত্যু: ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬৪) সুনীতিকুমারও অনুরূপ স্মরণিকা রচনা করেন। এটি 'In Memoriam: Kamala Devi (1900—1964) নামে ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সকাল সাড়ে সাতটা আটটা থেকে এগারোটা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত পাঠশালা চলতো। এখানে পড়ানো হতো বিদ্যাসাগর মশাইয়ের 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ—দ্বিতীয় ভাগ, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' ও বটতলায় ছাপা 'শিশুবোধক'। সেই সঙ্গে ছিলো শতকিয়া, কড়াকিয়া, বুড়িকিয়া আর নামতা শেখানোর ব্যবস্থা। এখানে অবশ্য পড়াশুনো বেশিদূর এগোয় নি। কিছুদিনের মধ্যেই পোলিও রোগে আক্রান্ত হন তিনি। শয্যাশায়ী অবস্থায় প্রায় ছ' মাস কাটে। চিকিৎসাগুণে পোলিও থেকে সেরে উঠলেও দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা (Myopia) দেখা দেয়। পরবর্তী জীবনে এই ক্ষীণতা আরো বৃদ্ধি পায়।

রোগমুক্ত সুনীতিকুমার ঐ অঞ্চলেরই (একালের রাজা রামমোহন সরণির) ক্যালকাটা একাডেমীর শিশু শ্রেণীতে ভর্তি হন। এখানে 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ ও 'শিশুশিক্ষা' ছাড়াও প্যারীচরণ সরকারের ইংরেজী First Book of Reading পড়তে হয়। বছর দুই পড়েছিলেন এখানে।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্লেগ দেখা দিলে শিবপুরে মাতুলালয়ে বিদ্যালয়-বর্জিত একটি বছর বড়ো আনন্দে কাটলো। প্লেগের প্রকোপ কমলে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আবার কলকাতায় ফিরে এলেন। হ্যালিডে ষ্ট্রীটের (একালের চিত্তরঞ্জন এভেন্যু) মতিলাল শীলের অবৈতনিক স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। তাঁর স্কুল-জীবনের ঠিকমতো সূত্রপাত এখানেই। টানা আটটি বছর এখানে পড়াশুনো করেন তিনি। স্কুল-জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সুনীতিকুমার লিখেছেন—

> ক্লাসে বয়সে ছোটো "ভালো ছেলে" ছিলুম, প্রত্যেক বৎসরই প্রথম হ'তুম, ইংরিজিতে খুব লায়েক ছিলুম ব'লেই বেশী খাতির—কিন্তু গণিতে অত্যন্ত পিছপা ছিলুম—ভালো নম্বর কখনও পেতুম না, যদিও কষ্টেস্থষ্টে পাশের মত নম্বর পেয়ে সব ছেলেদের মধ্যে প্রথম স্থানটি কোনও রকমে বজায় রাখতুম। (তদেব, পৃ. ৩০)

স্কুলের মাষ্টারমশাইরা সুনীতিকুমারকে ভালোবাসতেন, তাঁর প্রতি তাঁদের বিশেষ মনোযোগ ছিলো। গৃহে পিতামহ ঈশ্বরচন্দ্র এবং পিতা হরিদাস পড়াশুনোয় নানাভাবে সাহায্য করতেন।

পাঠ্য তালিকা বহির্ভূত পুস্তকাদিও পড়তেন। পিতা-পিতামহের সংগ্রহ তো ছিলোই। সপ্তম শ্রেণীতে যখন পড়েন তখন কয়েকজন সহপাঠীকে নিয়ে গড়ে তোলেন একটি পাঠচক্র। দুপুরে টিফিনের সময় ঐ পাঠচক্রে স্কট, ডিকেন্স, হুগোর 'লা মিজারেবল' এবং বিবেকানন্দের রচনা ও বক্তৃতাবলী সকলে মিলে পড়া হতো। এছাড়া হ্যারিসন রোডের (একালের মহাত্মা গান্ধী রোড) Y. M. C. A.-র Boys' Branchএ ভর্তি হয়েছিলেন। এখানে একটি ভালো লাইব্রেরি ছিলো। সুনীতিকুমার লিখেছেন—

> আমার কাছে এ যেন এক নোতুন স্বর্গের দরজা খুলে দিলে।

ছোটোবড়ো ছবিওয়ালা নানান্ রকমের ছেলেদের উপযোগী ইংরিজি বইয়ের এত বড়ো সংগ্রহ আগে দেখি নি। আমি তো গা ঢেলে দিয়ে এই সব বই প'ড়তে মেতে গেলুম। Boy's Own Paper, Chatterbox প্রভৃতি সচিত্র ছেলেদের পত্রিকা পেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে পড়তুম—বিনা শ্রমে ইংরিজি ভাষার Swing-এর মধ্যে অর্থাৎ তার অন্তরঙ্গ প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় হবার পথ একটা পেলুম। G. A. Henty ব'লে সে যুগে কিশোর বয়সের ছেলেদের উপযোগী ঐতিহাসিক কাহিনীর উপন্যাস সবগুলিই আসত। সেগুলি নিয়ে আর Andrew Lang-এর অদ্ভুত সুন্দর Fairy Books নানা জাতির রূপকথার বই—H. M Brock ব'লে সে যুগের শিল্পীর রঙীন আর কালি-কলমের টানে আঁকা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছবিতে ভরা এই বইগুলি—এসব নিয়ে কল্পলোকে বিচরণ করতুম। (তদেব, পৃ. ৩২)

আর ছিলো ব্যায়ামের ব্যবস্থা, সান্ধ্য সম্মেলন, নানা রকম আড্ডা। রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু বিষয়ে উপভোগ্য আলোচনা করতেন, উপদেশ দিতেন। সংস্থা-পরিচালক ইংরেজ পাদ্রি আর্থার লিফিভার (Arthur Lefevre)-এর সান্নিধ্য ছিলো লোভনীয়। কিশোর সুনীতিকুমারের দেহ-মনের বিকাশে এসব কিছুই প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছে।

মতিশীলের স্কুলে পাঠকালে বিবেকানন্দের বেদান্তব্যাখ্যা ও অন্যান্য লেখা, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর অবনীন্দ্রনাথ, রাজপুত, মোগল ও কাংড়া শৈলীর চিত্রকলার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে তাঁর (১৯০৩-৪ খ্রীঃ)। এর ফল হয় সুদূরপ্রসারী। সুনীতিকুমার লিখেছেন—

১. উত্তরকালে, ভাব ও কর্মজগতে নিজের কৈশোর ও যৌবনের মুখ্য প্রেরণা বিচার করিয়া দেখি, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ—উঁহাদের দুইজনের ব্যক্তিত্ব আমার জীবনে সর্বাপেক্ষা কার্যকর হইয়াছে।⋯ ⋯ এই দুই মহাপুরুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিক্ষা ও আশীর্বাদ আমার জীবনকে অর্থপূর্ণ করিয়াছে, ধন্য করিয়াছে,—আমার কাছে আত্ম-চেতনা আনিয়া দিয়াছে, অপূর্ব চিত্ত-প্রসাদ আনিয়া দিয়াছে। (যুগাবতার শ্রীবিবেকানন্দ, মনীষী স্মরণে, ১৯৭২, পৃ. ১২৩)

২. আমার সাংস্কৃতিক জীবনে আর একটি বড়ো জিনিসের সঙ্গে আমার সংযোগ ঘটে, সেটি হ'চ্ছে, ক'লকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট ইস্কুলের ছবির গ্যালারিতে। একদিন বিকালে, একসঙ্গে মধ্যযুগের ভারতের মোগল রাজস্থানী কাংড়ী চিত্রকলার প্রথম দর্শন, আর অবনীন্দ্রনাথের কয়খানি ছবির সঙ্গে প্রথম পরিচয়—'বুদ্ধ ও সুজাতা', 'সিদ্ধ-দ্বন্দ্ব', 'গ্রীষ্ম', 'বসন্ত', 'অভিসারিকা', 'দেওয়ালি', 'জ্যোৎস্নারাতে

> খোলা ছাতে গানবাজনার জলসা'—আর তা ছাড়া fresco বা ভিত্তি-চিত্র 'কচ ও দেবযানী' আর 'রাধাকৃষ্ণ'। এইসব ছবি চোখের ভিতর দিয়ে আমার আভ্যন্তর শিল্পচেতনাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মদিদৃক্ষাকে নোতুনভাবে জাগিয়ে তুললে, আত্মসমীক্ষার পথে যেন অনেকটা এগিয়ে দিলে। (জীবন-কথা, পৃ. ১৩)

সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটে। স্কুল থেকে পুরস্কার পেলেন ভিনসেণ্ট স্মিথের 'অশোক'। এতে অশোক লিপিগুলি দেখে প্রবল আকর্ষণ অনুভব করলেন। একদিন যাদুঘরে ছুটলেন, সেখান থেকে ভারহুতের অশোক লিপিটি নকল করে নিয়ে এলেন।

এ সময় তিনি নানারকম ছবি খাতায় সংগ্রহ করে রাখতেন। নিজেও ছবি আঁকতেন। কলেজ স্কোয়ারের গোলদীঘিতে শুনতেন টহলরাম গঙ্গারাম ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশাত্মবোধক বক্তৃতা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় (১৯০৫ খ্রীঃ) টালা পার্কে শুনতে যেতেন বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা। ১৯০৭-এ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে রবীন্দ্রনাথ 'আত্মপরিচয়' বক্তৃতা দিলেন। সুনীতিকুমার সেই প্রথম দেখলেন তাঁকে।

যথাকালে স্কুল-জীবন শেষ হলো। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। প্রথম পাঁচজনের পরেই তাঁর স্থান। কুড়ি টাকার মাসিক বৃত্তি পেলেন। সুনীতিকুমার ভাবতে লাগলেন—

> ভালো কলেজে এইবার প'ড়বো, যেখানে লাইব্রেরিতে অনেক বই আছে—মনের সুখে প'ড়বো। ইতিহাস, সংস্কৃত প'ড়বো, অন্য ভাষা শিখবো। (জীবন-কথা, পৃ. ৪১)

জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিট্যুশনে (পরবর্তী কালের স্কটিশ চার্চ কলেজ) ফার্স্ট আর্টস ক্লাসে ভর্তি হলেন। এখানে তখন যে সমস্ত অধ্যাপক পড়াতেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য Dr. A. B. Wann, Evelyn Evans, অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বরুণচন্দ্র দত্ত, মন্মথনাথ বসু, নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ, গৌরীশঙ্কর দে প্রমুখ। সহপাঠীরূপে যাঁদের পান তাঁদের কেউ কেউ উত্তরকালে বেশ খ্যাতিলাভ করেন। যেমন, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ মিত্র, আনন্দকৃষ্ণ সিংহ, ভোলানাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। স্কুলের বন্ধু গৌরগোবিন্দ গুপ্ত (কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভাই রামচন্দ্র গুপ্তের প্রপৌত্র) এখানেও তাঁর সহাধ্যায়ী ছিলেন।

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে এখানেই প্রথম পরিচয়। ১৯০৮-এ সুনীতিকুমার যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শিশিরকুমার তখন তৃতীয় বর্ষের (প্রথম বার্ষিক বি. এ) ছাত্র। সুনীতিকুমার লিখেছেন—

> যদিও শিশির আমার এক ক্লাস উঁচুতে প'ড়ত, তথাপি শিশিরের এমন একটি আকর্ষণী শক্তি ছিল যে আমরা চট ক'রে তার

> বন্ধু ব'লে গৃহীত হ'লুম। (শিশিরকুমার ভাদুড়ী ১, মনীষী স্মরণে, পৃ. ১৭৭)

উভয়েই আবার ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিট্যুটের সদস্য হয়েছিলেন। ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিট্যুটের সঙ্গে তখন কতকগুলি বড়ো বড়ো মনীষী ও বাঙলার তরুণ জগতের হিতৈষী সংশ্লিষ্ট ছিলেন।'[৪] কলেজ ও ইন্স্টিট্যুটে অভিনয় উপলক্ষে দু'জনের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে উঠলো। শিশিরকুমার তখন থেকেই অভিনয়-পাগল, সুনীতিকুমার অভিনয় না করলেও অভিনয় ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। কলেজ আর ইন্স্টিট্যুটের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয়ে অভিনেতাদের যথোপযুক্ত পোষাক-পরিচ্ছদ এবং মঞ্চসজ্জা উদ্ভাবনের দায়িত্ব ছিলো সুনীতিকুমার ও তাঁর দু'জন সহপাঠীর উপর। তাঁদের উদ্ভাবিত রীতি-পদ্ধতি নাট্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সমাদৃতও হয়। সে যাই হোক, উভয়ের গভীর বন্ধুত্ব আজীবন বজায় ছিলো। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রবন্ধে সুনীতিকুমার বলেছেন—

> শিশিরকে পেয়েছিলুম মিত্রভাবে, সাহিত্য-বন্ধুভাবে, মানসিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে সতীর্থ আর সমানধর্মা রূপে, আর একজন পরিপূর্ণ বিদগ্ধ রসিকজন রূপে। (শিশিরকুমার ভাদুড়ী ২, মনীষী স্মরণে, পৃ ১৮৭)

সুনীতিকুমারের ছাত্রজীবন কৃতিত্বপূর্ণ। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এফ. এ. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি. এ পড়তে থাকেন। এখানে পার্সিভাল সাহেব ও ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের স্নেহলাভ করেন এবং অধ্যাপক এম. ঘোষের সান্নিধ্যে গ্রীক সভ্যতা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি. এ. পরীক্ষার ইংরেজী সাহিত্যের খাতায় তিনি নাকি ফার্সী কবিতা উদ্ধৃত করে তুলনা করেছিলেন। পরীক্ষক হরেন মুখুজ্জে (পরে রাজ্যপাল) নাকি মৌলবী ডাকিয়ে তার অর্থ জেনে নিয়েছিলেন।[৫] প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকেই ১৯১৩তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ইংরেজীতে এম. এ. হন। তিনি ছিলেন ইংরেজী 'বি' গ্রূপের ছাত্র। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে বৈদিক সংস্কৃতের মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ গবেষণা বৃত্তি আর 'জুবিলি রিসার্চ প্রাইজ' লাভ করেন।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে, তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়ে ভাষাবিজ্ঞানে গবেষণার জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে Prof. Daniel Jones ও তাঁর সহকারীদের কাছে ধ্বনিবিজ্ঞান, Dr. F. W. Thomas এর কাছে ইন্দো-ইউরোপীয়

৪। পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ১৭৭।

৫। মানুষ সুনীতিকুমার, অধ্যাপক রজীন হালদার, কথাসাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯, পৃ. ১১৯৩।

ভাষাবিজ্ঞান, Dr. L. D. Barnett এর কাছে প্রাকৃত ও ইন্দো-আর্যভাষা, Sir E. Denison Ross-এর কাছে পারসী, Prof. Robin Flower-এর কাছে প্রাচীন আইরিশ এবং ইউনিভার্সিটি কলেজের Prof. Chambers ও Grattan-এর কাছে প্রাচীন ইংরেজী ও গথিক ভাষায় পাঠ 'নেন। ১৯৩০তে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধ্বনিবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা আর ৯২১-এ ডি. লিট ডিগ্রী পান। 'ইন্দো-আর্য ভাষাবিজ্ঞান —বাঙলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ' ছিলো তাঁর গবেষণার বিষয়। এই গবেষণার পিছনে রয়েছে একটি ছোট্ট ইতিহাস। সুনীতিকুমার নিজেই জানিয়েছেন সে ইতিহাস 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলা ভাষা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

> কলেজে প'ড়্তে প'ড়তে সাহিত্যের চাইতে ভাষাতত্ত্বের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করি।…নিছক সাহিত্যের চেয়ে, জটিল আধুনিক সাহিত্যের চেয়ে সহজবোধ্য প্রাচীন সাহিত্য আর ভাষা-তত্ত্বের কচ্চায়ন এই দু'টির দিকেই একটু ঝোঁক আসে, এবং কখন অজ্ঞাতসারে ভাষার আলোচনাতেই একটা রস পেতে থাকি। সেইজন্যে ইংরিজিতে এম্-এ পড়্বার কালে আমি প্রাচীন আর মধ্যযুগের ইংরিজি সাহিত্য আর ইংরিজি ভাষার নাড়ীনক্ষত্রের কথা খুব আগ্রহ ক'রে স্বীকার ক'রে নিই। দু'বছর এম্-এ পড়বার সময়ে, ইংরিজি ভাষাতত্ত্বের খুঁটিনাটি আমাকে ভাল ক'রেই আয়ত্ত ক'র্তে হয়। এবং সেই সময়ে একটি জিনিস দেখে মনে আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে—ইউরোপের লোকেরা নিজেদের ভাষা, যেমন ইংরিজি, জার্মান, ফরাসি, কী নিষ্ঠার সঙ্গে কেমন গভীরভাবে আলোচনা ক'রেছে আর তার নষ্টকোষ্ঠী কত কত কষ্ট ক'রে বার ক'রেছে, তাদের মধ্যে যা-কিছু অজানা ছিল তার সব-ই তারা যেন প্রকাশ ক'রে দিতে পেরেছে। আমার মনে এই দেখে একটা হিংসের ভাবও জাগ্‌ত, আর একটা প্রবল ইচ্ছাও হ'ত, এইভাবে আমার মাতৃভাষার ইতিহাসের উদ্ধার হয় না! আমাদের ভাষার প্রকৃতি আর বিকৃতি, আর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে তার গতিশীল ধারার ইতিহাস আমরা তো কিছুই জানি না! মনে একটা উৎকট আগ্রহ হ'ত, আমরা আমাদের ভাষার নানা ব্যাসকূটের সমাধান ক'র্তে কবে পার্‌বো! তখন থেকেই মনে এই ইচ্ছা যেন পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠ্‌ছিল, ইংরিজিতে এম্-এ পরীক্ষায় পাস ক'রেই মাতৃভাষা বাঙলার ভিতরকার কথা খুঁজে বা'র ক'র্‌তে হবে। (মনীষী স্মরণে, পৃ. ৫২-৫৩)

সেই ইচ্ছার ফসল হল এই গবেষণা।

এরপর প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় বছর খানেক (১৯২১-১৯১২) অধ্যয়ন করেন। Sorbonne-র Collége de France এবং Ecole des Langues Vivantes

Orientales-এ Prof. Jules Bloch, Prof. Antoine Meillet, Pro. Jean Przyluski, Prof. Paul Pelliot-এর কাছে ইন্দো-আর্য, স্লাভ ও ইন্দো-ইউরোপীয় ধ্বনিবিজ্ঞান, অস্ট্রো-এশীয় ধ্বনিবিজ্ঞান, সোগাডীয়, প্রাচীন খোটানি, গ্রীক ও ল্যাটিন ইতিহাসের পাঠ নেন। অধ্যয়ন ও গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ফ্রান্সের কোনো কোনো অংশ, ইটালী, গ্রীস ও জার্মানী ঘুরে দেখেন।

এক অর্থে এখানেই সুনীতিকুমারের ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি বলা চলে না। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ছাত্র। ছিলেন চিরন্তন জিজ্ঞাসু।

বিবাহ ও সন্তানাদি

বিহারের গয়া জেলার বিষ্ণুশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও বনলতা দেবীর প্রথম সন্তান কমলা দেবীর (১৯০০—১৯৬৪) সঙ্গে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল সুনীতিকুমারের বিয়ে হয়। বিয়েতে বন্ধুদের কাছে পাঠানো নিমন্ত্রণপত্রখানি নিজেই সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচনা করেছিলেন তিনি—

> স্বস্তি শ্বয়ে পরিণয়বিধাবুৎসবম সংবিধাতুম্
> সম্পূর্ণাঙ্গং সকলসুহৃদাম্ স্বাগতৈঃ প্রেমধাম্নাম্।
> প্রীতিস্নিগ্ধাম্ প্রমুদিতমনাযচ্ছতীমাম্ লিপিংতে
> জায়াম্ নামাঙ্কৃতকমলামাপ্তুকামঃ সুনীতি।[৬]

প্রাচীন অভিজাত বংশের কন্যা কমলা দেবী ছিলেন আদর্শ গৃহিণী। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

> এই বহুগুণসম্পন্না মহিলা যদি গৃহকর্মে নিপুণা না হইতেন, সমগ্র সংসারের ভার বহনের শক্তি না রাখিতেন, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিবার জন্য প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টি না রাখিতে পারিতেন, বুদ্ধিমত্তা ও হৃদয়বত্তার দিক হইতে স্বামী-গৌরবের অংশভাগিনী হইবার স্পৃহা তাঁহার না থাকিত, তাহা হইলে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনের এই বিরাট সাফল্য সুসম্পূর্ণ হইত কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়। (সুহৃদ্বর শ্রীসুনীতিকুমার, কথাসাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯, পৃ ১০৭৭)

সুনীতিকুমার ও কমলা দেবীর একপুত্র ও পাঁচ কন্যা। এঁরা হলেন—সুমন (১৯২৭), রুচি (১৯২৯), রমা (১৯৩১), নীলা (১৯৩২), সতী (১৯৩৪) ও শুচি (১৯৩৬)।

৬। শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য 'সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়' প্রবন্ধে এই পত্রখানির উল্লেখ করেছেন। দ্রঃ কথাসাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯, পৃ. ১১৮৪।

চাকরি জীবন

চাকরি জীবনের প্রথম থেকেই সুনীতিকুমার অধ্যাপক। প্রথম অধ্যাপনা কলকাতার মেট্রোপলিটন (একালের বিদ্যাসাগর) কলেজে (১৯১৩)। এখানে তিনি ইংরেজী সাহিত্য পড়াতেন। একবছর পরে (১৯১৪) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য প্রতিষ্ঠিত স্নাতকোত্তর ইংরেজী বিভাগে সহকারী অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভাষা-বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার আগে পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি। ১৯২২এ দেশে ফিরে এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞান ও ধ্বনিবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপকপদে যোগ দেন। ১৯৫২ পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ঐ বিভাগে অধ্যাপনা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত, আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ, ফরাসী, ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিভাগেও ক্লাস নিতেন তিনি। অধ্যাপক সুনীতিকুমারের একটি বিশেষত্বের উল্লেখ করেছেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন—

> বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া বেতন লইয়াছেন, কিন্তু গৃহাগত ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াইয়া কোনদিন সুনীতিকুমারকে কিছু লইতে দেখি নাই। বরং উল্টা ব্যাপার দেখিয়াছি। ছাত্র-ছাত্রী বাড়িতে আসিলে কেহ কিঞ্চিৎ মুখে না দিয়া ফিরিতে পারিত না। সুরাবর্দীর ডিরেক্ট অ্যাকশনের দুর্যোগের দিনে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন ছাত্রী হিন্দুস্থান পার্কের চাটুজ্জে বাড়িতে তিন-চার দিন থাকিয়া খাইয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্রসান্নিধ্যে

ছাত্রাবস্থাতেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুরাগী হয়ে ওঠেন সুনীতিকুমার। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। ক্রমশঃ তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ও শ্যামদেশ (থাই-ভূমি) ভ্রমণে যান তখন সুনীতিকুমার তাঁর অন্যতম ভ্রমণ-সঙ্গী হন। সুনীতিকুমার এই ভ্রমণের কথা তাঁর 'দ্বীপময় ভারত' (১৯৪০) গ্রন্থে (১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' নামে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত) অনবদ্য ভঙ্গিতে লিখে রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই ভ্রমণসঙ্গী সম্বন্ধে একটি পত্রে লিখেছেন—

> আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত ব'লেই জানতুম্। অর্থাৎ আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন

ব'লে আমার বিশ্বাস ছিলো। কিন্তু এবার দেখ্‌লুম, বিশ্ব ব'ল্‌তে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় ক'রে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তালভঙ্গ না ক'রে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধ'রতে পারেন, আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে—বিশ্ব-ব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। (জাভা-যাত্রীর পত্র, রবীন্দ্র-রচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ, দশম খণ্ড, পৃ. ৬১৬)

আর একটি পত্রে বলেছেন—

সুনীতির যেমন দর্শন-শক্তি তেমনি ধারণা-শক্তি। যতো বড়ো তাঁর আগ্রহ, ততো বড়োই তাঁর সংগ্রহ। যা-কিছু তাঁর চোখে পড়ে, সমস্তই তাঁর মনে জমা হয়। কণামাত্র নষ্ট হয় না। নষ্ট যে হয় না—সে দুদিক থেকেই—রক্ষণে এবং দানে। তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে। (তদেব, পৃ. ৬২৬)

রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুনীতিকুমারের শ্রদ্ধা ছিলো অন্তহীন। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও ও বাণী তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সুনীতিকুমারের গবেষণা-সহায়ক শ্রীযুক্ত অনিলকুমার কাঞ্জিলালের মন্তব্য-বিশেষ প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য—

.........রবীন্দ্রনাথ-ই সুনীতিকুমারের ভাবলোকে একচ্ছত্র সম্রাটের মতো বিরাজ ক'রেছেন।...সুনীতিকুমারের রবীন্দ্রানুগত্য তাঁর সন্ধানে আবিষ্কৃত আত্মপরিচয়। (পাদটীকা, 'জীবন-কথা' শারদীয় যুগান্তর, পৃ. ১১)

'শেষের কবিতা'য় (১৯২৯) অমিত রায়ের মাধ্যমে তরুণ ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতি-কুমারকে অমর করে রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। আর 'বাংলা ভাষা পরিচয়' (১৯৩৮) গ্রন্থটি উৎসর্গ করে তাঁকে 'ভাষাচার্য' বিশেষণে ভূষিত করেছেন। অন্যদিকে রবীন্দ্র-সান্নিধ্যধন্য সুনীতিকুমার তাঁর প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন—

রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য, সেটা জীবনে এক অপূর্ব সৌভাগ্যরূপে আমি পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে কথা কওয়াটাই ছিল এক শ্রেষ্ঠ মানসিক রসায়ন। তাঁর স্নেহ পেয়েও ধন্য হ'য়েছি। (রবীন্দ্রনাথ, মনীষী স্মরণে, পৃ. ৭২-৭৩)

'ব্যাকরণিয়া রবীন্দ্রনাথ', 'বাক্‌পতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলা ভাষা', 'ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ', 'মেক্সিকোতে রবীন্দ্র-সাহিত্য', 'ভারতীয় সংগীত ও রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা' প্রভৃতি প্রবন্ধ সেই শ্রদ্ধার নিদর্শন। আর রবীন্দ্রনাথের 'পুণ্যস্মৃতি'র উদ্দেশে 'তৎপাদানুধ্যাত সদাপ্রণত সুনীতিকুমার' তাঁর 'A shortened Arya Hindu Vedic Initiation-Ritual' (1976) এবং 'রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-ভারতী-কে' 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস' (১৯৭৬) উৎসর্গ করেছেন।

অসাধারণ মনীষা

বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সুনীতিকুমার। অসাধারণ তাঁর জ্ঞানের পরিধি। ভাষাশাস্ত্রের অনেক গোপন রহস্য ভেদ করেছিলেন তিনি। ভারতবর্ষে ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আধুনিক রীতি-পদ্ধতির অন্যতম প্রবর্তয়িতা তিনি। কিন্তু শুধু ভাষাশাস্ত্রই নয়, নানা বিষয়ে, এক কথায় সমগ্র মানব-সভ্যতা সম্বন্ধেই তাঁর কৌতুহল। এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর কথায়—

> সুনীতিবাবুর পাণ্ডিত্য তাঁর গায়ের জামা-জোড়া নয়। সে তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল। এ পরিমণ্ডলের ক্ষেত্রমধ্যে যিনি এসেছেন তিনি নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন কেমন সহজে তাঁর পাণ্ডিত্যের রশ্মি বিকীর্ণ হয়। বস্তুত, সুনীতিবাবু যেন একটি ব্যক্তি নন, একটি ইনস্টিটিউশন, একটি আসর। সে শুধু বিদ্যার ও জ্ঞানের রঙ্গভূমি নয়, সেখানে নানা দেশের নানা অভিজ্ঞতার ও জ্ঞাতব্যের পরিচিত অপরিচিত অনেক কিছুর পরিচয় পাই। (শিষ্যের চোখে গুরু, কথাসাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯, পৃ. ১২১১)

প্রচুর লিখেছেন। বাঙলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরেজী এবং অন্যান্য বিদেশী ভাষায় লেখার পরিমাণ কম নয়। কলকাতার 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশন থেকে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Suniti Kumar Chatterji : The Scholar and the man নামক গ্রন্থে যে নির্বাচিত রচনাপঞ্জী প্রদত্ত হয়েছে তাতে দেখা যায় বাঙলা ভাষায় ১৫ খানির মতো গ্রন্থ লিখেছেন তিনি। এর মধ্যে কয়েকটি ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ। যেমন— বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (১৯২৯), ভাষা-প্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ (১৯৩৯) ভারতের ভাষা ও ভাষা-সমস্যা (১৯৪৪), সংক্ষিপ্ত ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ (১৯৪৫), সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ (১৯৫৬) প্রভৃতি। লিখেছেন ভ্রমণ বৃত্তান্ত—পশ্চিমের যাত্রী (১৯৩৮), দ্বীপময় ভারত (১৯৪০)। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ 'রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ', (১৯৬৪), ইউরোপ (১৯৩৮)। বাঙলার ভ্রমণ-সাহিত্য তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। ভ্রমণ-বৃত্তান্তকে যুগপৎ সরস ও তথ্যবহুল করে তুলেছেন তিনি। সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ-সংকলন গ্রন্থ হলো—জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য (১৯৩৮), ভারত-সংস্কৃতি (১৯৪৪), সাংস্কৃতিকী (১ম-১৯৬২, ২য়-১৯৬৫)। 'পথ চলতি' দুটি খণ্ড (১৯৬২, ১৯৬৪) মনোরম স্মৃতিকথার সংকলন। 'বৈদেশিকী' (১৯৪৩) বিদেশী উপাখ্যানের সংকলন। ঐ তালিকা রচনার পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে আরো ৩টি গ্রন্থ—মনীষী স্মরণে (১৯৭২) বাঙলাভাষা প্রসঙ্গে (১৯৭৫) ও সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস (১৯৭৬)। ১৯৭৬-এর ২রা জানুয়ারি লিখতে শুরু করেন 'জীবন-কথা'।' মাত্র কয়েক পাতা লিখেছিলেন, শেষ হয় নি।

'জিজ্ঞাসা' প্রকাশিত পূর্বোক্ত তালিকায় ১৬২টি বাঙলা প্রবন্ধের উল্লেখ লভ্য।

এগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত। এর মধ্যে কোনো কোনোটি তাঁর ইংরেজী প্রবন্ধের অপরকৃত অনুবাদ। অনেকগুলিই কোনো না কোনো গ্রন্থভুক্ত। বিষয়-বৈচিত্র্যের নিদর্শন হিসেবে কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করছি—

ইতিহাসের ধারা, আরবী ও ফারসী নামের বাঙলা অনুলিখন, আর্য অনার্য, প্রাম্বানান্ শৈব-মন্দিরে প্রস্তর-খোদিত রামায়ণী চিত্রাবলী, চীন ও জাপানের বৌদ্ধধর্ম, পরিচ্ছদের ইতিহাস আলোচনা, নগর-শোভা ভাস্কর্য ও কলিকাতার কতকগুলি ভাস্কর্য, কাশী, জগতের শ্রেষ্ঠ পুস্তক, আফ্রিকার নিগ্রো শিল্প, "কলিকাতা" নামের ব্যুৎপত্তি, আধুনিক ইউরোপে সংস্কৃতি ও শিল্প, 'মজ্‌মু 'উল্-বহ্‌রৈন্, গুস্তাফ্ ভিগেলাণ্ড, নাজী জারমানির ধর্ম ও সংস্কৃতি, বড়ো জাতি, ভারত ও বিশ্ব, বৌদ্ধোত্তর ঈশ্বরবাদ, হিন্দুজাতির সংকট, ভারতীয় চিন্তাধারা ও আধুনিক জগৎ, ভারতবাসীর আহার, কোন্ তিকিঃ পলিনেসিয় জাতি ও আমেরিকা, ভাষা-বিভ্রাট ও আদিবাসীদের সমস্যা, বাঙলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, আফ্রো-এশীয় সাহিত্যের সমস্যা, গৌড়-বঙ্গ প্রভৃতি।

ঐ তালিকার বিবিধ পর্যায়ে পাই ১২০টি রচনার নাম। বহু বিচিত্র বিষয়বস্তু এগুলির অবলম্বন। এ ছাড়া বহু গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন[৭] তিনি, বহু গ্রন্থের আলোচনা (Review) করেছেন,[৮] অন্যের সঙ্গে সম্পাদিত গ্রন্থও রয়েছে।[৯]

'জিজ্ঞাসা' প্রকাশিত তালিকায় হিন্দী পুস্তক পুস্তিকার সংখ্যা ৭ ('রাজস্থানী ভাষা', 'ভারতীয় আর্য ভাষা ঔর হিন্দী', 'ভারত মেঁ আর্য ঔর অনার্য' প্রভৃতি); প্রবন্ধের সংখ্যা ৪২ ('হিন্দী কী উৎপত্তি', 'কলকত্তে কী বাজারী হিন্দুস্তানী', 'ভারতীয় সংস্কৃতি কা সূত্রপাত', 'বংগাল মেঁ হিন্দী,' 'দ্রাবিড়', 'সিংহল কী ভাষা', 'তুলসীদাস ঔর হিন্দু সংস্কৃতি', 'পন্‌চশীল', 'হিন্দী কা উত্তরাধিকার', 'প্রবোধকুমার সান্যাল', 'বৃহত্তর ভারত মেঁ শিব', 'রাষ্ট্রভাষা কা প্রশ্ন' প্রভৃতি)। এছাড়া ভূমিকা লিখেছেন ১২টি গ্রন্থের।

উক্ত তালিকায় সংস্কৃত রচনার সংখ্যা ২৯ ('সংস্কৃত দিগ্‌বিজয়ঃ', 'ঋষি-পঞ্চমী-শ্লোক পঞ্চদশী', 'সংস্কৃত-সাহিত্যম্', 'তুলনাত্মক-ভাষা বিজ্ঞানস্য প্রাদুর্ভাবঃ' প্রভৃতি)। সংস্কৃতে অনেকগুলি শ্লোক ও রচনা করেছেন তিনি।

তালিকাটিতে রয়েছে ২১টি ইংরেজী গ্রন্থের নাম। তার মধ্যে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'খণ্ডে প্রকাশিত The Origin and Development of the Bengali Language তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এছাড়া রয়েছে

৭। পূর্বোক্ত তালিকায় মাত্র ৩৮টি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

৮। পূর্বোক্ত তালিকায় ২৮টি গ্রন্থের নাম রয়েছে।

৯। পূর্বোক্ত তালিকায় ৭টি গ্রন্থের নাম রয়েছে।

Bengali Self Taught (1927), Indo-Aryan and Hindi (1942), Kirāta-Jana Kṛti (1951), Scientific and Technical Terms in Modern Indian Languages (1953), The Place of Assam in the History and Civilisation of India (1955), Africanism : the African Personality (1960), The People, Language and Culture of Orissa (1966), Guru Gobind Singh (1967), Balts and Aryans : in their Indo-European Background (1968), India and Ethiopia : from the 7th Century B.C. (1968), World Literature and Tagore (1971)। ১৯৭৬ এ প্রকাশিত হয়েছে A Shortened Arya-Hindu Vedic Wedding and Initiatian Ritual. রামায়ণ সম্পর্কে ইংরেজীতে একটি গ্রন্থ লিখছিলেন, মৃত্যু হেতু যা অসম্পূর্ণ থেকে গেল।

ইংরেজী প্রবন্ধের সংখ্যা ২১০—The Study of Kol, The foundations of Civilisation in India, Some more Austric words in Indo-Aryan, The Pala Art of Gauda and Magadha, Some Problems in the origin of Art and Culture in India, A Phonetic Transcription from Toda, Two New Indo Aryan Etymologies. Polyglotism in Indo-Aryan, The Pronunciation of Sanskrit, 2000 years Ago-Life in an Indian City, Art in Coins, Khāravela, Sanskrit in Perso-Arabic Script, Andhra Art, Itihāsa, Purāṇa and Jāṭaka, Polonia and India, Sir William Jones: 1746-1794, Islamic Mysticism : Iran and India, An early Arabic Version of the Mahabharaṭa story, One World One Culture, Al Bīrunī and Sanskrit, Old Tamil, Ancient Tamil and Primitive Dravidian, The Culture Crisis among the People of West Africa, Sanskrit and Russian —a comparison—প্রভৃতি তার কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত। এছাড়াও ইংরেজীতে রয়েছে বিবিধ ধরনের ১২৮টি রচনা। অন্যের সঙ্গে সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা—৩। পুস্তক পর্যালোচনার সংখ্যা ১২৪। আর ভূমিকা লিখে দিয়েছেন অন্তত ২৭টি গ্রন্থের।[১০]

বলা বাহুল্য, সুনীতিকুমার যা জানতেন, তার ভগ্নাংশ মাত্র লেখার মধ্যে রেখে গেছেন।

বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে

প্রবাদপ্রতিম তাঁর পাণ্ডিত্য। জীবৎকালেই কিংবদন্তীতে

১০। তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন শ্রীযুক্ত অনিলকুমার কাঞ্জিলাল।

পরিণত। স্বদেশে-বিদেশে সর্বত্র পেয়েছেন বিপুল সমাদর। বিশ্বের সারস্বত-সমাজ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের পরে আর কোনো ভারতীয় মনীষী সমগ্র বিশ্বে তাঁর মতো সমাদৃত হন নি। ঐ দুই মনীষীর অবর্তমানে বিশ্ব সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ভারত-সংস্কৃতির প্রচারে যথার্থ দূতের ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। দূরকে নিকট, পরকে ভাই করার দুর্লভ ক্ষমতা ছিলো তাঁর। এখানে দেশে-বিদেশে তাঁর স্বীকৃতির তথা গৌরবময় কার্যকলাপের একটি নির্বাচিত তালিকা দেওয়া হলো।[১১]

দেশে

১৯৩৬ : বাঙলার (রয়াল) এসিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত।

১৯৩৮ : কুমিল্লায় (অধুনা বাঙলা দেশ) নিখিলবঙ্গ বাঙলা সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি।

১৯৪০ : গুজরাট সাহিত্য সংস্থার (অধুনা গুজরাট বিদ্যাসভা) আমন্ত্রণে বক্তৃতা প্রদান।

১৯৪৬ : করাচীতে (অধুনা-পাকিস্তান) ৩৪ তম নিখিল ভারত হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে জাতীয় ভাষা শাখার সভাপতি।

১৯৪৭ : আসাম সরকারের আমন্ত্রণে প্রতিভা দেবী বক্তৃতা প্রদান।

১৯৪৮ : এলাহাবাদের হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন প্রদত্ত 'সাহিত্য বাচস্পতি' উপাধি লাভ।

১৯৫২ : সুদীর্ঘ ৩৮ বছরব্যাপী অধ্যাপনার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'এমেরিটাস প্রফেসর' পদে নিয়োগ। পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৫৩ : কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত। আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত ১৭শ নিখিল ভারত প্রাচ্য সম্মেলনের সভাপতি।

১৯৫৪ : গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে বাণীকান্ত কাকতি স্মৃতি বক্তৃতা প্রদান। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা।

১৯৫৫ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত ও চারুকলা বিভাগের ডীন নির্বাচিত। রাষ্ট্রীয় মর্যাদা 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ। পুনার গ্রীষ্ম-কালীন ভাষাবিজ্ঞান স্কুলে বক্তৃতা (পরবর্তী বছরগুলিতে আন্না-মালাইনগর, মহীশূর, কোয়েম্বাটুর, সাগর ও মাদুরাই-এ বক্তৃতা)।

১১। তথ্য উৎস : Sunitikumar Chatterji—A chronicle of his Life, compiled by Pranabkumar Banerji (Sunitikumar Chatterji : The Scholar and the Man. P.17—28)

১৯৫৫-১৯৫৬ : ভারতীয় ভাষা কমিশনের সদস্য। পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত।

১৯৫৬-১৯৫৭ : ভারত সরকার কর্তৃক সংস্কৃত কমিশনের সভাপতি পদে নিয়োগ।

১৯৬১ : কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৬২ : পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভাপতিপদে পুনর্নির্বাচিত।

১৯৬৩ : রাষ্ট্রীয় মর্যাদা 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি লাভ। আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান। কাঁচড়াপাড়ায় বাঙলা সাহিত্য সম্মেলনে বক্তৃতা। কলকাতার তামিলচর্চা কেন্দ্রের সভাপতির পদ লাভ। হায়দ্রাবাদের গ্রীষ্মকালীন ভাষাবিজ্ঞান স্কুলে বক্তৃতা। ঔরঙ্গাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বক্তৃতা।

১৯৬৪ : দিল্লীতে ২৬তম আন্তর্জাতিক প্রাচ্য ভাষাবিদ্ সম্মেলনে যোগদান। ভারতের জাতীয় অধ্যাপক-পদ লাভ। কটকে নিখিল ভারত বাঙলা সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি। ভুবনেশ্বর ও কটকে উড়িষ্যার সংস্কৃতি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান।

১৯৬৫ : ইম্ফল ও মণিপুরে পণ্ডিতরাজ অটমবাপু শর্মা স্মৃতি বক্তৃতা প্রদান। সিমলার ইনষ্টিট্যুট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজে ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধি লাভ। বার্ষিক সমাবর্তনে ভাষণ দান।

১৯৬৬ : মহীশূরে ভারত সরকারের চীন-চর্চা কেন্দ্র পরিদর্শন। দক্ষিণ ভারতের কুর্গে বক্তৃতা প্রদান। সিমলার ইনষ্টিট্যুট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজে 'ভারতীয় সাহিত্যে আধুনিকতা' শীর্ষক আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ এবং ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে ৬টি বক্তৃতা প্রদান। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি লাভ।

১৯৬৭ : দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ সমিতির সদস্যপদ লাভ। সিমলার ইনস্টিট্যুট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজে 'ভাষা ও সমাজ' সম্পর্কিত আলোচনাচক্রে যোগদান ও উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান।

১৯৬৮ : মাদ্রাজে তামিলচর্চার দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে যোগদান, বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধি লাভ। সাহিত্য একাডেমীর সহ-সভাপতি নির্বাচিত। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-বক্তৃতা প্রদান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দান। হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধিলাভ। আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার জন্য প্রদত্ত

জওহরলাল নেহেরু পুরস্কার সমিতির অন্যতম বিচারক পদে মনোনীত।

১৯৬৯ : কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে রবীন্দ্র-স্মৃতি-ফলক লাভ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধি লাভ। মাদুরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন ভাষাবিজ্ঞান স্কুলে 'ভারতের ভাষাবিজ্ঞান' সম্বন্ধে বক্তৃতা। মাদুরাইয়ে ভারতীয় তামিল অধ্যাপক সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দান। সাহিত্য একাডেমীর সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৭০ : সাহিত্য একাডেমী আয়োজিত মাদ্রাজের গুরু নানক পঞ্চশতবার্ষিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ও সভাপতি। দ্বিতীয় দফায় কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত।

বিদেশে

১৯২৭ : রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিন মাসের জন্য মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বলি ও শ্যামদেশ ভ্রমণকালে ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও তাঁর স্থাপিত বিদ্যালয় সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান। বাটাভিয়ায় প্রবন্ধ পাঠ।

১৯৩৫ : লণ্ডনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞান সম্মেলনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে যোগদান। সম্মেলনে ভারতীয় শাখার সভাপতি। অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, চেথোস্লোভাকিয়া, জার্মানী ও ফ্রান্স ভ্রমণ। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল ইনস্টিট্যুটে বক্তৃতা প্রদান।

১৯৩৬-১৯৩৭ : রেঙ্গুনে নিখিল বর্মা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি। বর্মা ভ্রমণ।

১৯৩৮ : ইউরোপ ভ্রমণ। ঘেণ্টে তৃতীয় আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞান সম্মেলনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে যোগদান। কোপেনহেগেনে আন্তর্জাতিক নৃতাত্ত্বিক সম্মেলনে যোগদান। ব্রুসেলসে আন্তর্জাতিক প্রাচ্যভাষাবিদ্ সম্মেলনে যোগদান। প্যারিসের Comité International Permanent de Linguistcs-এর সদস্যপদ লাভ। নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, জার্মানী, বেলজিয়াম ও ইটালী ভ্রমণ। পোল্যাণ্ডের (ওয়ারশ) ওরিয়েন্টাল ইনস্টিট্যুটের সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত।

১৯৪৬ : প্যারিসের Société Asiatique-এর সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত।

১৯৪৭ : আমেরিকার নিউ হ্যাভেনের আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটির সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত।

১৯৪৮ : প্যারিসে আন্তর্জাতিক ভাষাবিদ্ ও প্রাচ্যভাষাবিদ্ সম্মেলনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে যোগদান। ব্রুসেলস আন্তর্জাতিক নৃতাত্ত্বিক সম্মেলনে যোগদান। ইজিপ্ট সফর।

১৯৪৯ : হ্যানয়, ভিয়েতনামের École Francaise de Extreme-Orient-এর সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত। প্যারিসে ইউনেসকো আহূত অন্ধদের লিপি সংস্কার কমিটিতে যোগদান।

১৯৫০ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষা সংক্রান্ত অনুসন্ধানের দায়িত্ব নিয়ে ইটালী, ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও ইস্তাম্বুল সফর। প্যারিসে ইউনেসকোর অন্ধদের লিপি সংস্কার সম্মেলনে যোগদান। হল্যাণ্ডের Provincial Utrechts Genootschap Van Kunsten en Weten Chappen-এর সদস্য নির্বাচিত।

১৯৫১ : বেইরুটে ইউনেসকোর আরবী পারসী ব্রেইল সম্মেলনে যোগদান।

১৯৫১-১৯৫২ : আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এসিয়া স্টাডিজে পরিদর্শক অধ্যাপক রূপে যোগদান। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, য়েল বিশ্ববিদ্যালয় ও ওয়াশিংটনে বক্তৃতা দান।

১৯৫২ : নিউইয়র্কের রকফেলার ফাউনডেশনের আনুকূল্যে মেক্সিকো ভ্রমণ। মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বক্তৃতা। মেক্সিকোর পুরাতত্ত্ববিদ্, সমাজবিজ্ঞানী ও শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। প্যারিসে ইউনেসকোর ব্রেইল সম্মেলনে যোগদান।

১৯৫৪ : অসলোর (নরওয়ে) নরওয়েজিয়ান একাডেমী অব সায়েন্সেস-এর সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত। ইণ্ডিয়ান কাউনসিল ফর কালচারাল রিলেসনস্-এর ব্যবস্থাপনায় পশ্চিম আফ্রিকা ভ্রমণ। কেম্ব্রিজে ২৩তম আন্তর্জাতিক প্রাচ্যভাষাবিদ্ সম্মেলনে যোগদান। ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে উত্তর সুমাত্রার মেডানে ইন্দোনেশীয় ভাষা সম্মেলনে যোগদান। ব্যাংকক পরিদর্শন।

১৯৫৫ : পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় ও লোকতান্ত্রিক চীনের আমন্ত্রণে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সদস্যরূপে চীন ভ্রমণ।

১৯৫৭ : ব্যাংককের সিয়ম সোসাইটির সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত।

১৯৫৮ : সোভিয়েট একাডেমী অব সায়েন্সেস-এর অতিথিরূপে রাশিয়া পরিদর্শন। মস্কোয় ৪র্থ আন্তর্জাতিক স্লাভিস্টস্ সম্মেলনে প্রবন্ধপাঠ। মস্কো ও লেলিনগ্রাদে বক্তৃতা। তাসকেণ্টে এসিয়া ও আফ্রিকার লেখক সম্মেলনে যোগদান। চীন-ভারত মৈত্রী সংস্থার অতিথিরূপে চীন পরিদর্শন। নিউইয়র্কের লিঙ্গুইস্টিক সোসাইটি অব আমেরিকার সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত।

১৯৫৯ : ভারতের প্রতিনিধিরূপে অষ্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় কমনওয়েলথ পার্লিয়ামেণ্টারী সম্মেলনে অংশ গ্রহণ। ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা ও থাইল্যাণ্ডের ব্যাংকক পরিদর্শন।

১৯৬০ : ভারত সরকারের আনুকূল্যে বক্তৃতাদানের জন্য সস্ত্রীক কাইরো, রোম, প্রাগ, বন, প্যারিস, লণ্ডন ও আমস্টারডাম সফর। মস্কোয় ২৫তম আন্তর্জাতিক প্রাচ্যভাষাবিদ্ সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দান ও প্রবন্ধ পাঠ। বহির্মঙ্গোলিয়া ভ্রমণ।

১৯৬১ : রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে রোম গমন। সম্মানসূচক 'ডক্টরেট অব লেটারস্' উপাধি লাভ। তেহেরান পরিদর্শন। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবন্ধ পাঠ। রোমের ইটালীয়ান ইনস্টিট্যুট ফর দি নিয়ার অ্যাণ্ড ফার ইস্ট-এর সম্মানিত সদস্যপদ লাভ। হেলসিঙ্কির (ফিনল্যাণ্ড) পার্মানেণ্ট ইণ্টার ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ফোনেটিক সায়েন্সেস-এর সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত।

১৯৬২ : ডাবলিন, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, জাপান ও ফিলিপাইনে বক্তৃতা দান। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিট্যুট অব টেকনোলজি ও অন্যান্য সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত ৯ম আন্তর্জাতিক ভাষাবিদ্ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ। ফিলাডেলফিয়া, সান ফ্রান্সিসকো, বার্কলে প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা। জাপানের ওসাকা, কিয়োটো ও টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা। ফিলিপাইনস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা ও আলোচনাচক্রে যোগদান।

১৯৬৩ : সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিঙ্গুইস্টিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্যপদ লাভ। নেপালরাজের আমন্ত্রণে নেপাল পরিদর্শন। 'নেপাল ও ভারতবর্ষ' প্রবন্ধ পাঠ।

১৯৬৪ : রাশিয়া পরিদর্শন। শেভচেঙ্কোর ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে যোগদান। লিথুয়ানিয়া ও ল্যাটাভিয়া ভ্রমণ। মস্কোয় এশিয়া-আফ্রিকার লেখক সম্মেলনে উপস্থিতি। ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে জামাইকা সফর। আফ্রিকার বুডু ধর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য হাইতি ভ্রমণ।

১৯৬৫ : সিকিমের চোগিয়ালের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদান।

১৯৬৬ : ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের আনুকূল্যে সংস্কৃতি বিনিময় সূচী অনুযায়ী কায়রো, আদ্দিস আবাবা, এথেন্স, বুখারেস্ট, প্যারিস, লণ্ডন, প্রাগ, পূর্ব বার্লিন, মস্কো প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন ও বক্তৃতা প্রদান। ইরান সরকারের আমন্ত্রণে তেহেরানে বিশ্ব সম্মেলনে উপস্থিতি ও প্রবন্ধ পাঠ, ইস্পাহান, শিরাজ, পার্সেপলিস প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন। জর্জিয়ার জাতীয় কবি শোথা রুসথাভেলির ৮ম জন্মশতবার্ষিকী

অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন গমন ও প্রবন্ধ পাঠ।

১৯৬৭ : ভারত-চেখোস্লোভাকিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন ও ব্যক্তিগত গুণের জন্য চেকোশ্লোভাকিয়ার মৈত্রী সংস্থার কাছ থেকে স্বর্ণপদক লাভ। আমেরিকার অ্যান আরবোরে (মিচিগান) ২৭ তম আন্তর্জাতিক প্রাচ্যভাষাবিদ্ সম্মেলনে যোগদান। রুমানিয়ার বুখারেস্ট-এ ১০ম আন্তর্জাতিক ভাষাবিদ্ সম্মেলনে যোগদান। এথেন্স, আঙ্কারা, ইস্তাম্বুল ও তেহেরান ভ্রমণ।

১৯৬৯ : লণ্ডনের ইণ্টারন্যাশনাল ফোনেটিক এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত।

চরিত্রের নানাদিক

মস্তবড়ো পণ্ডিত তিনি, অথচ সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার। ঈর্ষামুক্ত আর গুণগ্রাহী। অত্যন্ত মিশুকে। ছোটোবড়ো সকলের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিশতেন।

তাঁর চরিত্রে বিদ্যার সঙ্গে বিনয়ের সমন্বয় ঘটেছিলো। চালিয়াতি একদম পছন্দ করতেন না। সাধারণ মানুষের মতোই সাদাসিধে জীবনযাত্রা ছিলো তাঁর। 'অকৃত্রিমতা ছিল তাঁর স্বভাবে, তাঁর আচরণে ব্যবহারে। এমনকি, তাঁর ব্যক্তিত্বও রাশভারি ছিল না যে দূরত্ব সৃষ্টি করবে, পাণ্ডিত্যের অভিমানও ছিল না যে কেউ সংকুচিত হবে।' (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—স্মৃতিচিত্র, গোপাল হালদার, পরিচয়, ১৩৮৪, পৃ. ২০৬)

ছবি আঁকতেন। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর ভক্ত ছিলেন। গ্রীক আর্ট আর নিগ্রো আর্টের হাড়-হদ্দ জানতেন। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিলো নানাদেশের চিত্র ও মূর্তি।

অদ্বিতীয় কথক ছিলেন। কথোপকথন যে একটা আর্ট তা তাঁর সান্নিধ্যে এলে বোঝা যেতো। অত্যন্ত মজলিসী মানুষ ছিলেন। অল্প সময়েই যে কোনো আড্ডা বা আসরে মধ্যমণি হয়ে উঠতেন। তাঁর চলিত ভাষার লেখাগুলিতে ঐ কথকতার ভঙ্গিটি লভ্য।

অধ্যাপক রঞ্জিন হালদার লিখেছেন—

> তাঁকে কখনও অবসাদগ্রস্ত দেখিনি ; এর কারণ তাঁর অসাধারণ sense of humour। এমন বলিষ্ঠ চরিত্র এমন প্রাণের প্রাচুর্য, এমন dynamic personality কমই দেখেছি। (মানুষ সুনীতিকুমার, কথাসাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯, পৃ. ১১৯৯)

যেমন অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, তেমনি অসাধারণ ভোজনবিলাসী।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন তাঁর দানশীলতার কথা—

> পঞ্চাশের মন্বন্তরের দুঃসময়েও আমি সুধর্মায় উপস্থিত ছিলাম। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় রাত্রে সকল সময়ের জন্যই তিনি কিছু না কিছু খাবার প্রস্তুত রাখিতেন। রোজ চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের খিচুড়ি তো বাঁধা বরাদ্দই ছিল। সুনীতিকুমার কত পুরানো বন্ধুকে, কত দুঃস্থ ব্যক্তিকে, দরিদ্র ছাত্রকে সাহায্য করিয়াছেন। হিন্দু মিশনের মত কত প্রতিষ্ঠান তাঁহার নিকট কায়িক বাচিক মানসিক ও আর্থিক সহায়তা পাইয়াছে আমি তাহার সাক্ষী। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারের অতি অল্পাংশই আমার দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। (সুহৃদ্বর শ্রীসুনীতিকুমার, কথাসাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯, পৃ. ১০৭৭-৭৮)।

প্রতিদিন সকালে জপ-উপাসনা করতেন তিনি। তাও ছিলো বিশেষত্বপূর্ণ। হিন্দু মতে, ইসলাম মতে এবং কৃশ্চান মতে চলতো এই জপ-উপাসনা।[১২]

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী সুনীতিকুমার চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যটি নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে—

> পাণ্ডিত্য তাঁর অগাধ ও বিচিত্র পথগামী; এক্ষেত্রে তিনি প্রায় তুলনারহিত। কিন্তু তার চেয়েও বড় তাঁর সদাজাগ্রত মনের অসীম কৌতূহল ও জীবন সম্পর্কিত ভূয়োদর্শন। নানা দেশ ঘুরে নানারকম লোক ও সমাজ দেখে মানুষ সম্বন্ধে একটি নিরাসক্ত জ্ঞান তিনি অর্জন করেছেন। তাঁর মতো বিচক্ষণ Humanist বর্তমানে অল্পই আছে। অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে অনেক মনীষীর মধ্যে এই শ্রেণীর মনশ্চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়। লর্ড চেষ্টারফিল্ড, ইংলণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ওয়ালপোলের পুত্র সাহিত্যিক ওয়ালপোল কিম্বা ফ্রান্সে যাঁরা Encyclopaedist নামে পরিচিত তাঁদের সঙ্গে সুনীতিকুমারের এ বিষয়ে সমতা। (একটি ব্যক্তিত্বের বিকাশ, কথাসাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯, পৃ. ১১২৫)

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার ঠিকই বলেছেন—'প্রতিভার বহুমুখী দীপ্তিতে যে ব্যক্তিত্ব ছিল প্রদীপ্ত উজ্জ্বল, জীবনরসের অনুভূতিতে সেই ব্যক্তিত্বই ছিল কৌতুক-স্নিগ্ধ ও আনন্দঘন।[১৩]

মহাপ্রয়াণ

১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে, অপরাহ্ণ। মৃত্যু হানা দিলো তাঁর জীবনে। মনে মনে অবশ্য বেশ কিছুদিন আগে থেকেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। অসমাপ্ত

১২। দ্রষ্টব্য—দুর্লভ মানুষ সুনীতিকুমার, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কথাসাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯, পৃ. ১১৫৯।

১৩। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—স্মৃতিচিত্র, শারদীয় পরিচয়, পৃ. ১৮৩

'জীবন-কথা'য় সেই প্রস্তুতির ঘোষণা রয়েছে। তাঁর গবেষণাসহায়ক শ্রীযুক্ত অনিলকুমার কাঞ্জিলাল জানিয়েছেন—

> কর্মব্যস্ত সুনীতিকুমারকে কখনো কখনো আপন মনে সকৌতুকে আবৃত্তি ক'রতে শুনেছি :
>
> 'তুমি কারে করিয়ো না দৃকপাত
> আমি নিজে লব তব শরণ
> যদি গৌরবে মোরে ল'য়ে যাও
> ওগো মরণ, হে মোর মরণ।'[১৪]

মৃত্যু তো চিরন্তন সত্য। মৃত্যুকে তিনি তাই প্রসন্ন মনেই বরণ করতে চেয়েছেন। অবশ্য জীবন-সায়াহ্নে একটি প্রশ্ন তাঁর মনে অহরহ জেগেছে। তা হলো—

> জীবনের অন্তরালে কি আছে? কেন জগতে আমার এবং আমার মতন কোটি কোটি মানুষের আগমন হ'ল, হ'চ্ছে, হবে—জীবন তো আমি কাটিয়ে দিলুম প্রায়, কিন্তু এর উদ্দেশ্য কি? সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে কত কিছু দেখে গেলুম, ক'রে গেলুম,—রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই প্রশ্ন আসে—'কিন্তু কেন?'[১৫]—এই প্রশ্নের উত্তর তো এল না। (জীবন-কথা, পৃ. ৮)

সুনীতিকুমার লিখেছেন—

> এখন এই ৮০ বছরের পরে যে সমাধান পেয়েছি, সেটা হ'চ্ছে যে—আমরা কিছুই জানি না, আর গভীরতম অন্তর থেকে এটাও ধ্বনিত হ'চ্ছে, এ জীবনে কিছু জানা যায় না। (জীবন কথা, পৃ. ৮)

১৪। 'জীবন-কথা' প্রসঙ্গে, শারদীয় যুগান্তর, পৃ. ৪৭।
১৫। 'কেন', নবজাতক।

বাঙ্‌লা ছন্দ, সুনীতিকুমার ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ

ক্ষুদিরাম দাস

আচার্য সুনীতিকুমার তাঁর ODBL গ্রন্থে বাঙ্‌লা ভাষার উপর শ্বাসাঘাত ধর্মের কার্যকারিতার বিবরণ দিতে গিয়ে অনিবার্যভাবে বাঙ্‌লা ছন্দের প্রসঙ্গে এসেছেন। কারণ, ছন্দ ভাষার প্রাণধর্মের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধে আবদ্ধ। বিভিন্ন ভাষার প্রকৃতি অনুসারে সেই সেই ভাষার ছন্দের প্রকৃতিও বিভিন্ন হয়ে পড়ে। আমাদের ভাষায় সেই প্রকৃতির অনুসন্ধানে সুনীতিকুমার দেখেছেন, আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে পূর্ব-মাগধী শাখা এবং বিশেষভাবে বাঙ্‌লা, শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণে শ্বাসাঘাত (Stress, ঝোঁক, বল) নীতি আশ্রয় করেছে। বাঙ্‌লা ভাষার আদিযুগের পর থেকে উচ্চারণে এই ঝোঁকের প্রবণতা প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই ব্যাপারে ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বাঙ্‌লার আংশিক সাদৃশ্যও লক্ষণীয় হয়েছে। পার্থক্য এই যে, বাঙ্‌লায় ঝোঁক নিয়মিতভাবে শব্দের প্রথম অক্ষরে (অক্ষর = Syllable), ইংরেজিতে তা নয়, তা ছাড়া ঝোঁকের প্রকৃতিতেও কিছু পার্থক্য ধরা যেতে পারে। আচার্য পুনশ্চ দেখেছেন, বাঙ্‌লা বাক্যের উচ্চারণরীতি হল কয়েকটি শব্দের মিলিত এক একটি গুচ্ছ নিয়ে বিরামযুক্ত উচ্চারণের একটি প্রবাহ। স্বাভাবিক এই বিরামকে যতি (pause, breath-pause) বলা যায়। এক, দুই, তিন, এমনকি চারটি শব্দের এক-একটি গুচ্ছের পর ঐ বিরাম আসে। সেক্ষেত্রে মূল ঝোঁক পড়ে শব্দগুচ্ছের প্রথম শব্দটির প্রথমে। গুচ্ছমধ্যবর্তী অন্যান্য শব্দের আদ্যক্ষরে ঝোঁক থাকলেও তা তেমন প্রবল হয় না। তা ছাড়া এও বলা যায় যে গদ্য-উচ্চারণে বা সাধারণ কথাবার্তায় ঐ বিরাম প্রায়শ অর্থানুসারে, স্বল্প-অর্থসমাপ্তির (Sense-pause) সঙ্গে মিলিয়েই ফেলা হয়। এই যতি, যা গদ্যের উচ্চারণকে অর্থের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ন্ত্রিত করছে, তা কিন্তু পদ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সুরধর্মের (Rhythm) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, প্রয়োজনে অর্থধর্মকে উল্লঙ্ঘন করতে কবিতার যতির বিন্দুমাত্র দ্বিধা ঘটে না। পরবর্তিকালে সুনীতিকুমার যখন ব্যাকরণ রচনা করেন তখনও তিনি গদ্য ও পদ্যের Sense-pauseকে ছেদ এবং breath-pauseকে যতিরূপে বর্ণনা করেছেন। বলা বাহুল্য, সুনীতিকুমারের এই ভাষা-পর্যবেক্ষণ বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবাশ্রিত (descriptive)। তাঁর পূর্বে পশ্চিমা পণ্ডিতদের বাঙ্‌লা ভাষা আলোচনায় এবিষয়ে স্থিরনিশ্চয় ঘটেনি, মতদ্বৈধ ছিল, এদেশীয় বৈয়াকরণ ও ছান্দসিকদের আলোচনায় স্ববিরোধ ছিল যথেষ্ট, তবে ঐসব ক্ষেত্রে অনুসন্ধিৎসা ও পরস্পরবিরোধ তাঁকে সুসমঞ্জস একটি ধারণায় উপনীত হতে প্রেরণা দিয়েছিল নিশ্চয়ই। ODBL যখন লেখেন তখনকার তরুণ ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের আলোচনা থেকে তিনি উৎসাহিত হয়েছিলেন ব'লে উল্লেখ

করেছেন এবং অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত এই তিনটি আখ্যা এবং কিছু উদাহরণও তাঁর গ্রন্থ থেকে সমাহরণ করেছিলেন। বেশ কিছুকাল পরে যখন ব্যাকরণ লেখেন তখন অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্‌লা ছন্দের বৈজ্ঞানিক মূলসূত্র নির্ণয়ের ব্যাপারে আচার্য নিজকৃত ব্যাখ্যানের প্রতিরূপ অনুভব ক'রে তাঁর দেওয়া নামকরণ তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান, শ্বাসাঘাত-প্রধান বিকল্পে তাঁর ব্যাকরণ-পুস্তকে সন্নিবেশিত করেন এবং আরও লক্ষণীয় এই যে, তানপ্রধান ও ধ্বনিপ্রধান (অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত) ছন্দের চতুর্মাত্রিক পর্বগণনা থেকে তিনি বিরত হন। রবীন্দ্রনাথ ও প্রবোধচন্দ্র তখন ঐ দুই বিষয়ে চতুর্মাত্রিক যতি ও পর্বের পক্ষপাতী ছিলেন। অমূল্যধনের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ও স্বরধর্মগত নামকরণ গ্রহণ ক'রে, ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে পূর্বে তিনি যা আন্দাজ করেছিলেন তারই বিস্তারিত সিদ্ধি অন্যের হাত দিয়ে ফিরে গ্রহণ করলেন, এটি বেশ কৌতুকজনকই বটে। অবশ্য কী ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থে, কী ব্যাকরণে তিনি মৌলনীতি প্রদর্শনেই তাঁর আলোচনা সীমিত রেখেছিলেন, কবিদের তাবৎ রচনায় যেসব বিস্তৃত বৈচিত্র্য এবং আপাত-বিরোধ দেখা যায় তার সামঞ্জস্য নির্ণয়কল্পে শ্রম নিয়োগ ক'রে ছন্দ-বিষয়ে পৃথক্ গ্রন্থ রচনার সময় ও মনোযোগ দিতে পারেন নি।

বাঙ্‌লা ছন্দের ক্রমবিকাশকে ইতিহাস-অনুগত ভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রথমে বুঝ্‌তে হবে বাঙ্‌লা অন্যান্য আধুনিক ভাষার মতই জীবন্ত সচল অগ্রগামী। এর উচ্চারণরীতি একশ' দুশ' বছর ধ'রে পরিবর্তিত হতে হতেই চলেছে এবং ভবিষ্যতেও কত পরিবর্তন হবে। বাল্যকালে আমার পাঠশালার এক বৃদ্ধ গুরুমশায়কে বলতে শুনতাম—সরিষা, আঁকুশী, আলিপনা, আঙটী, পানিফল, রাজতন্ত্র, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি। আমরা উচ্চারণ করতাম—সর্‌ষা, আঁকুশি, আঙ্‌টি, আল্‌পনা পা'ন্‌ফল, রাজ্‌তন্ত্র প্রভৃতি। বর্তমান পূর্ববঙ্গ উচ্চারণ আইজ, কাইল, চাইর, কইর‍্যা, আষ্ট, ডাকাইত, প্রভৃতি চারশ' বছর আগে সারা বাঙ্‌লারই ছিল। আরও আগে তদ্ভব শব্দের (তৎসম তো বটেই) শেষের অ, ই, উ স্পষ্ট উচ্চারিত হ'ত, যেমন পাত (অ), কাম (অ), আজি, আজু, আঁখি, বহু (=বধূ), তীন (অ)=তিন্, আমার (অ), কানাইর (অ) প্রভৃতি। মধ্যযুগে ক্রমাগত স্বরমধ্য ব্যঞ্জন লোপ করার প্রবণতার ফলে যে-সব স্থানে অই, অউ, আই, আউ উচ্চারণ ঘটেছিল, সে-সব স্থানে প্রথম-প্রথম উক্ত দুইস্বর উচ্চারণে পৃথক্‌মূল্যের ছিল, পরে সেগুলি দ্বিস্বরে অর্থাৎ মিলিত একটি দীর্ঘস্বরে রূপান্তরিত হয়। এই সব পরিবর্তিত উচ্চারণ কবিদের ছন্দোরীতিতেও মাত্রামূল্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বর্তমানে ঐসবের অনেক বদলে গেছে ঠিকই, কিন্তু রক্ষণশীলতার বশে কিছু থেকেও গেছে আবার। একটা দৃষ্টান্ত দি'। ছন্দোনির্ণয়ে এ দৃষ্টান্তটি গুরুত্বপূর্ণ। আজকের মৌখিক ভাষায় আমরা বলি—মেঘ্, জল্ চোখ্ দেশ্ (বি)ষাদ্ (আ)মার্ (ভার)তের্। নিজেকে পরীক্ষা করুন, দেখবেন ঐ ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর (Syllable) গুলি উচ্চারণে মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরের সমমূল্যই পাচ্ছে উচ্চারণকালের দিক থেকে। অর্থাৎ 'আ' বলতে যে পরিমাণ সময়, কাশ্ বলতেও সেই পরিমাণ

সময়, আকাশ্ দু'মাত্রায় দুটি অক্ষর। মধ্যযুগে ঠিক তা ছিল না। ঐগুলির স্বরান্ত উচ্চারণ লোপ পাওয়ার পর পূর্বেকার দু'অক্ষরের দু'মাত্রা মূল্য টান দিয়ে পূরণ করা হতে লাগ্ল, অন্ততঃ ছন্দের ক্ষেত্রে। দু'অক্ষর এক হয়ে পড়্ল. কিন্তু টান দিয়ে মাত্রামূল্য দুই-ই রেখে দেওয়া হ'ল। উচ্চারণে যে ক্ষতি হ'ল টান দিয়ে তা পূরণ করার চেষ্টা করলাম। আজও তাই চলছে। অন্ততঃ অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তে। আর শ্বসিত রীতির ছন্দে প্রায়শই ওগুলির মাত্রা এক, কচিৎ দুই হতেও পারে। আসলে মৌখিক ভাষা গতিশীল হয়েছে, ছন্দোবোধ থেকেছে রক্ষণশীল। একটু ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে বলা যায়, আজ থেকে একশ' দেড়শ' বছর পরে ঐটুকু রক্ষণশীলতার বালাইও ঘুচে যাবে। বাঙ্লার স্বাভাবিক উচ্চারণের সঙ্গে যে ছন্দের বেশি মিল, সেই ছড়ার ছন্দ বা শ্বসিত ছন্দই থাকবে, মাত্রাবৃত্ত রীতিটাই অতিকৃত্রিম ও প্রত্ন হয়ে পড়বে, আর পয়ার-জাতীয়ের স্থান নেবে গদ্যছন্দ, এখনই যার অধিকারের প্রবল প্রতাপ দেখা যাচ্ছে।

ছন্দের পর্বগত (পর্ব—Bar, দুই যতির মধ্যবর্তী অক্ষরসমষ্টি) অক্ষরগুলির মাত্রামূল্য উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে ভাষার পরিবর্তনের এই সব রীতি বুঝতে হবে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দের মূলপাঠ নির্ণয় করার সময় আমরা দেখেছি, হইল (হৈল), লইয়া (লৈয়া, লয়্যা), কৈল এবং করিল—প্রভৃতি শব্দকে তিনি ছন্দের প্রয়োজনে কখনও দু'মাত্রার কখনও তিনমাত্রার মূল্যে স্থান দিয়েছেন। দু'মাত্রার বেলায় কৈল, বৈল, কিন্তু তিনমাত্রা পূরণের প্রয়োজনে করিল, বলিল। তা ছাড়া অক্ষরমাত্রিক (তানপ্রধান) রীতিতেই মুখ্যতঃ ছন্দনির্মাণ করে গেলেও তিনি যৌগিক অক্ষরকে (অন্ পুন্ সন্ বক্ চক্ প্রভৃতি) ছন্দের প্রয়োজনে কখনও একমাত্রার মূল্য দিয়েছেন, কখনও দু'মাত্রার। এর দৃষ্টান্ত এত প্রচুর যে ব্যাপারটিকে ব্যতিক্রম বলা যায় না। হয়ত মুখের কথাতেও তখন ঐ দুমাত্রা রীতি সমর্থনের অন্ততঃ একটা আভাস বিদ্যমান ছিল। বৈষ্ণব পদাবলীতেও ঠিক তাই। এমন কি যৌগিকের যে দ্বিমাত্রিকতা মাত্রাবৃত্তরীতির আজ অবশ্য-করণীয় নিয়ম, ব্রজবুলি পদাবলীতে তাও অমান্য করা হয়েছে, অবশ্য খুব বেশি ক্ষেত্রে নয়। রবীন্দ্রনাথ দিক্‌প্রান্ত, দিক্‌সীমা, ঐ (ওই) প্রভৃতি শব্দের গ্রহনে অক্ষর-মাত্রিকেও যৌগিক অক্ষরগুলিকে কদাচিৎ এক, কদাচিৎ দুই মাত্রা ব'লে গ্রহণ করেছেন এবং আরও নানান্ আপাত-ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন, কিন্তু ছন্দের সুরধর্মে ঠিক চলে গেছে, শ্রুতিকটু হয়নি। দিক্ শব্দ সমাসবদ্ধ হলেও তার স্বাধীনসত্তাও পাঠককে শ্রোতাকে ভুলতে দেয় না। বৈজ্ঞানিক বোধের অভাবে ঐরকম দুর্বিপাক আধুনিক কবিতায় ছন্দ-চর্চায় ঘটেছে। 'অনেকদিন খিদিরপুর ডকের অঞ্চলে' এই পঙ্‌ক্তির নেক্ ও দির্ এ দুই সিলেব্‌ল্‌কে আধুনিক কবি একমাত্রা ধ'রে পয়ার (১৪ মাত্রার) মেলাতে চেয়েছেন, অথচ সে চেষ্টা দুরূহই হয়েছে, কারণ লেখায় দৃশ্যত অনেক ও দিন, খিদির ও পুর একীকৃত হলেও উচ্চারণস্মৃতিতে অনেক ও খিদির স্বাধীন শব্দ। সুতরাং 'নেক' ও 'দির' শব্দান্তও যৌগিক হিসেবে দু'মাত্রার মূল্য পাবে। "অনেক দিন খিদির পুর ডকের অঞ্চলে। কাব্যকে খুঁজেছি প্রায় গোরুখোঁজা

ক'রে।" এ দুই চরণের প্রথমটি পরিস্ফুট ধ্বনিমাত্রিকতার, দ্বিতীয়টি অক্ষর-মাত্রিকতার। ছন্দোময় বাক্ কিছু কৃত্রিম অথচ মনোহর। তবে এতে স্বাভাবিক উচ্চারণের অল্পস্বল্প ব্যতিক্রম ঘটানো যেতে পারে, এবং তা সুন্দরও লাগে, কিন্তু পরিচিত ও অভ্যস্ত কথনের রীতিকে কখনো একেবারে উল্টে পাল্টে দেওয়া যায় না।

সুনীতিকুমারের প্রাথমিক আলোচনার পূর্বেই বাঙ্‌লায় তিন রীতির ছন্দ লক্ষ্য-গোচর হয়েছিল এবং তিনি প্রবোধচন্দ্র সেনের আলোচনা ও নামকরণের দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ছন্দের আলোচনায় সুনীতিকুমার দেখেছিলেন যে বাঙ্‌লায় এবং সেই সঙ্গে অসমীয়া ওড়িয়ায় শ্বসিত উচ্চারণরীতি প্রাকৃত-অপভ্রংশের মাত্রামূলক রীতি থেকে সমমাত্রিক (যতিসহ গোটা স্বরধর্ম ধ'রে ১৬) অক্ষরমূলক রীতির নব্যপদ্ধতির জন্ম দিয়েছে। নব্যরীতির এই ছন্দের মূল ব্যাপারটি তিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে ধরিয়ে দিলেন। এই রীতির উচ্চারণ কেবল যে শব্দের আদিতে ঝোঁকের সৃষ্টি করেছে তা-ই নয়। যতির বিরামকে আরও দীর্ঘ ও স্পষ্ট করেছে এবং শ্বাসাঘাত ও যতির মাঝখানে শব্দগুচ্ছের এক একটি পর্বেরও সৃষ্টি করেছে। প্রাকৃত এবং অপভ্রংশেও যতির স্থান ছিল, কিন্তু তার মূল্য ছিল নগণ্য। যতি প্রায় না দিয়েও মাত্র স্বল্প টান রেখে একটি সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ চরণ উচ্চারণ করা চল্‌ত। কিন্তু বাঙ্‌লায় তা সম্ভব নয়। প্রথমের দিকে, যখন শব্দের শেষের স্বর বিলুপ্ত হয়নি তখনই পয়ারে প্রথম-আট এবং পরের ছয়ের শেষে পূর্ণযতি সুনির্দিষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। সুনীতিকুমারের উপলব্ধিতে অপভ্রংশ পাদাকুলকের ষোলমাত্রা চাল পয়ারেও একহিসেবে ছিল ও আছে, যতির দু'টি বিরামের মধ্যে ঐ দুটি মাত্রা-সময় সুপ্তভাবে থাকে, সুরসহ (Rhythmic quality) যাঁরা পয়ার আবৃত্তি করেন তাঁদের কণ্ঠ মনোযোগ সহকারে শুনলেই তা ধরা পড়বে। মাত্রা-নিয়ন্ত্রিত পাদাকুলক ছন্দোবন্ধ থেকে ঝোঁক-প্রযুক্ত পয়ারের পর্ব যখন ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এমন সময় পূর্ব-চলিত পূর্ণ ধ্বনিমাত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতির একটা বিমিশ্রণ ঘটেছিল। পরে ধীরে ধীরে অক্ষরমাত্রিকতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটেছে কবিকঙ্কণ রায়গুণাকরে এসে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন খুলে দেখুন—

> নীল জলদসম কুন্তলভারা।
> বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা॥
> সীমন্ত শোভয়ে তোর কামসিন্দুর।
> প্রভাত সময়ে যেহ্ উয়ি গেলা সুর॥ ইত্যাদি।

এর প্রথম দুই ছত্র লক্ষ্য করুন। প্রথম ছত্রের 'নী' এই মৌলিক অক্ষর এবং কুন্ এই যৌগিক অক্ষর এবং দ্বিতীয় ছত্রের চম্ অক্ষরকে দু'মাত্রা করে ধরলে তবেই ৮+৬ (অথবা ৮+৮) এর চাল সম্পূর্ণ হয়। অর্থাৎ ঐ দুই ছত্রে ধ্বনিমাত্রিকের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে। কবিতাটির পরের ছত্রগুলিতে অবশ্য ঐরকম ব্যতিক্রম আর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু অন্যত্র বহু পদে ১২।১৩ অক্ষরের (Syllable) চরণ দেখা যায়,

সেগুলিতেও কোথাও কোথাও প্রাচীন দীর্ঘমাত্রকতার আশ্রয় নিলে তবেই ৮+৬ এর সমাধান ঘটে। যেমন,—এহা দেখি রসন্ত মন কর দূরে, গা(হি)ল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ, আতিবড় দুষ্ট হৃদয় বনমালী। ত্রিপদীর (অর্থাৎ ত্রিপর্বিক ৮+৮+৮+২) ক্ষেত্রে যেমন—সর্বাঙ্গ সুন্দরী তোএ দেব মুরারী মোএঁ, হংস রএ সরোবরে শুআহো পাঞ্জরে কুয়িলী সে নন্দন বনে। অর্থাৎ আ, ঈ, উ প্রভৃতির এবং ব্যঞ্জনান্ত যৌগিকের দু'মাত্রার সংস্কার তখনও মন থেকে মুছে যায় নি। কবিকঙ্কণের সময়েও যায় নি, তার প্রমাণ, তিনি অক্ষরমাত্রিক রীতিতে কাব্য লিখলেও যৌগিক ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরকে প্রয়োজনে দু'মাত্রার মূল্যও দিয়েছেন। যেমন, শূন্যে করিয়া স্থিতি চিন্তিলান মহামতি ; নিরুপম পরকাশ মন্দ মধুর হাস ; মধুর সংগীত কবিকঙ্কণে ভণে ইত্যাদি। সুনীতিকুমার দেখেছিলেন যে কৃষ্ণকীর্তনের পয়ারে আই আউ প্রভৃতি যেখানে আছে সেখানে গণনায় চরণ ১৪র বেশি অক্ষরের পাওয়া গেলেও বস্তুত উচ্চারণে ও শ্রবণে তা ১৪ই হবে, কারণ, পাশাপাশি অবস্থিত ঐ স্বরগুলির দ্বিতীয়টি তখনই উচ্চারণে ক্ষীণ হয়ে দ্বিস্বরতার প্রায় সৃষ্টি করেছে, ফলে দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১৪ অক্ষরই। লক্ষণীয় হ'ল সেই সর্বগ্রাসী সুরধর্ম, যার প্রভাবে অল্পস্বল্প এদিক ওদিক সমান হয়ে যাচ্ছে, কুঁদের মুখে বাঁক থাকছে না।

তাঁর অধ্যয়নে আরও একটি ব্যাপার ধরা পড়েছে। এটি কৃষ্ণকীর্তন পরবর্তী মধ্যযুগের। ঐ সময় উচ্চারণে শ্বাসাঘাত-বিস্তারের বশে মধ্য ও অন্ত্যস্বরের বিলোপ জন্য এক অভিনব পরিস্থিতির অভ্যুদয় হয়েছিল। লিখনে চোদ্দ অক্ষরের বেশি, ১৭-১৮ পর্যন্ত, অথচ উচ্চারিত মাত্রা ১৪ই, কারণ স্বরলোপজন্ত হস্ ব্যঞ্জনগুলির কোনো মূল্যই তখন দেওয়া হচ্ছিল না। যেমন, রাবণ্ রাজার্ সানা টোপর্ বাণের্ তেজে কাটে (দৃশ্যত ১৮), কৃষ্ণের্ নন্দন্ বীর্ রুষিল যেহেন প্রচণ্ড (দৃশ্যত ১৭)—এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত। সুনীতিকুমারের এই অধ্যয়ন যথাযথ, তবে, একটা কথা বলার আছে। আমরা সবক্ষেত্রে পালা গায়ক ও পুঁথি লেখকদের রচনাই পেয়ে থাকি। কবিরা ঠিক কী করেছিলেন তা অন্তত কিছু পরিমাণে আমাদের অজ্ঞাতই থেকে গেছে। তথাপি পালা গায়েনরা যেহেতু বাঙ্লা ভাষা-ভাষীই, তাঁদের আবৃত্তি থেকেও পরিস্থিতির হদীস নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যায়। আর এক কথা। শেষ স্বরলোপের ফলে ক্ষয়পূরণ না হয়ে অর্থাৎ দীর্ঘ না হয়ে হ্রস্ব যে হচ্ছে তার কারণ নিশ্চয়ই ষোড়শ শতাব্দী থেকে ছড়ার ছন্দের বিস্তার। পয়ারের উচ্চারণের সঙ্গে ছড়ার ছন্দের উচ্চারণ মিশ্রিত হয়ে কিছুকাল বেশ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল। একমাত্র শ্বসিত উচ্চারণেই আশ্রিত স্বরবর্ণের বিলোপ এবং হলন্ত যৌগিক অক্ষরের এক মাত্রার উচ্চারণের দিকে প্রবণতা সৃষ্টি। এই রীতিতে অক্ষরের সংকোচন-প্রসারণ রূপ স্থিতিস্থাপকতা গুণের প্রসারও লক্ষণীয় ব্যাপার। দরকার হ'লে চলিত ভাষার ছন্দে এই যে প্রসারণ (নাই নাই না-ই) এর প্রকৃতি অবশ্য মাত্রাবৃত্ত ঢঙ্ থেকে স্বতন্ত্র। যাই হোক, কৃত্তিবাসের অনুরূপ বহু ছত্রের দু'টি দেখা যাক—

অন্ধ কথা কইতে রাজার মুখে বাইরায় রাম।
নয়ন মুদিলে দেখে দূর্বাদলশ্যাম॥

এর প্রথমটিতে ছড়ার ছন্দের আভাস এবং দ্বিতীয়টিতে পয়ারের ১৪র বাঁধন স্পষ্ট। অবশ্য দ্বিতীয়টিও যে ছড়ার ছন্দে না পড়া যায় এমন নয়। ছড়ার রীতির সঙ্গে পয়ার রীতির মিশ্রণের বিষয়টি ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্রও লক্ষ্য করেছেন দেখছি। আচার্য তাঁর OBDLএ অক্ষরমাত্রিক ছন্দে তৃতীয় পরিবর্তন স্তরের উল্লেখ করেছেন। এটি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর। পয়ারকে অতিরিক্ত হস্‌যুক্ত ও স্বরময় কথ্যভাষার ভঙ্গি থেকে মুক্ত করে যুক্তাক্ষরযুক্ত, স্বরান্ত সাধুভাষায় রূপান্তরিত করার প্রয়াস চলেছিল এ সময়। হরফ্‌ গুণে পয়ারকে দৃশ্যত সাধুভাষার ছন্দ হিসেবে দেখা ও প্রচলিত করার দিকে কবিদের ঝোঁক দেখা যায়। এইভাবে পয়ার-জাতীয় ছন্দ অনেকটা সাধুভাষার ছন্দ হিসেবে স্থান লাভ করেছে। আর এই সাধুরীতি বেশ কিছুকাল ছড়ার ছন্দের প্রসার রোধ করেছিল এমনও অনুভব করেছেন ভাষাবিজ্ঞানী।

সুনীতিকুমার বাঙ্‌লায় ছন্দোনির্মিতির নিয়ন্ত্রী শক্তিরূপে বিশেষ সুরধর্ম (Rhythmic quality) লক্ষ্য করেছেন। OBDLএ তিনি লিখছেন—'The tune made an adjustment of irregularities in the shape of absence of or excess over the requisite number of syllables.' অথবা 'rhythmic adjustment of the line' অথবা 'The rhythm requires the lengthening of দে-শ and বিষা-দ্‌ to make up for the loss of final (অ) which counted as a syllable.' বাঙ্‌লায় Syllable এর অতিনির্দিষ্ট মাত্রা নেই, তা সুরপ্রবাহের বশগামী, অথবা আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয় যৌগিক স্বরান্ত হলন্ত এমন কি কদাচিৎ মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরও কখন হ্রস্ব উচ্চারিত হবে কখন দীর্ঘ, তা নির্ভর করবে এবং পর্ববিন্যাসও নিয়ন্ত্রিত হবে বিশেষ বিশেষ সুরধর্মের দ্বারা, তবে ঐ সুরধর্ম কথনরীতিকে উৎকটভাবে লঙ্ঘন ক'রে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করবে না, এই যা। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, হৃৎপদ্ম, মৃৎপাত্র, দিক্‌প্রান্ত এই ধরণের শব্দে হৃৎ, মৃৎ, দিক্‌ কোনো ক্ষেত্রে দীর্ঘ হবে, কিন্তু দীর্ঘ করা হলে পরবর্তী যৌগিক পদ্‌ পাত্‌ প্রান্‌ আর দীর্ঘ হবে না, কারণ পরপর দু'টি দীর্ঘ আমাদের উচ্চারণে ও কানে স্বাভাবিক নয়। অবশ্য শ্বসিত ঢঙের ছন্দে এও যে একেবারে অচল এমনও নয়। এইদিক্‌ থেকে বলা যায়, আধুনিক বাঙ্‌লা যৌগিক স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরগুলির স্থিতিস্থাপকতা গুণ রয়েছে। কেন রয়েছে, কেন কথ্য থেকে ছন্দের উচ্চারণে হৃৎ, মৃৎ, দিক্‌ এবং ঐরকম অন্‌ পুন্‌ সন্‌, রক্‌, ঐ, থৈ, দৈ, নাই প্রভৃতি অক্ষর কোথাও দীর্ঘ হবে, তার মূল নিহিত রয়েছে ঐ সুরধর্মের মধ্যে। এই বিষয় লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথও পুনঃপুনঃ এই ধরনের মন্তব্য করেছেন :

"ছন্দের কোনো অকাট্য নিয়ম নেই (অক্ষরের মাত্রা গণনা বিষয়ে—লেখক)

এ কথাটা মনে রাখা দরকার......কিঙ্কিণীতে ঘুন্টি কিভাবে ও কত সংখ্যায় সাজানো সে কথাটা গৌণ, তার ঝংকারের লয়টাই আসল কথা।"

"ইংরেজির ছন্দে এ্যাক্‌সেন্ট এর প্রভাব; সংস্কৃত ছন্দে দীর্ঘস্বরের সুনির্দিষ্ট ভাগ। বাঙ্‌লায় তা নেই, এইজন্য লয়ের দাবিরক্ষা ছাড়া বাঙ্‌লা ছন্দে মাত্রা বাড়িয়ে-কমিয়ে চলার আর কোনো বাধা নেই" ইত্যাদি।

একদা বিশেষ বিশেষ স্বরধর্ম ধরেই ছান্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বাঙ্‌লা ছন্দের তিনটি পৃথক্ উচ্চারণ পদ্ধতি বা ঢঙ্ নির্ণয় করেছিলেন এবং তদনুযায়ী পর্বের প্রকৃতি এবং পর্বানুগত আক্ষরিক ধ্বনিরও মূল্যায়ন করেছিলেন। সুষম পর্বের অর্থাৎ যতি বিভক্ত অংশের ভাগে ভাগে উচ্চারণ এটি ত্রিবিধ বাঙ্‌লা ছন্দের সামান্য প্রকৃতি। এরই মধ্যে প্রচলিত অক্ষরবৃত্তে শ্বাসাঘাতের প্রাবল্য ও অক্ষরসমূহের পৃথক্ পৃথক্ স্পষ্ট ধ্বনিমূল্য আত্মসমর্পণ করেছে তানময় স্বরধর্মের কাছে। মাত্রাবৃত্তের ক্ষেত্রে তিনি দেখেছেন পর্বমধ্য কথাগুলির বিচিত্র অক্ষরবিন্যাস কতকটা পূর্বেকার প্রাকৃত-অপভ্রংশ ধ্বনিমাত্রামূলক পদ্ধতির অধীন, তা অক্ষরস্থ ধ্বনিগুলির বিশেষ মূল্য দিয়ে মন্থরগতিতে চলতে চায়। আর চটুল নৃত্যের ভঙ্গিতে অগ্রসর হতে চায় এমন ছড়ার ছন্দের স্বর-ধর্মের সঙ্গে প্রবলভাবে শ্বসিত উচ্চারণের সামঞ্জস্য তিনি লক্ষ্য করেছেন। পরবর্তী কালে ব্যাকরণ রচনার সময় সুনীতিকুমার ছান্দসিক অমূল্যধনের বিবরণযুক্ত ত্রিবিধ নামকরণকে ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে যৌক্তিক ব'লে গ্রহণ করেছেন দেখতে পাই। অবশ্য ঐ নামকরণের সঙ্গে পুরাতন অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত নামও বিকল্পে রেখে দিয়েছেন যাতে শিক্ষার্থিদের পক্ষে বোঝার বিভ্রাট না হয়। এর পর নামকরণ প্রভৃতি বিষয়ে নোতুনতর কোনো ধারণার পক্ষপাতী তিনি হতে পারেন নি। কেবল মনে পড়ে, আমাকে তিনি একসময় প্রশ্ন করেছিলেন—"পয়ারের Chantingএ মুসলিম কোনো কোনো গায়ক চার মাত্রার পর যতিবিন্যাস ক'রে এক একটা চরণকে চার ভাগে ভাগ ক'রে পড়েন শুনেছি। পারলে একটু পরীক্ষা ক'রে দেখবেন তো।" আমার যতদুর জানা ছিল তাতে এরকম দেখা যেত না, এবং আবাল্য রামায়ণ, মনসার ভাসান এবং পটুয়াদের সুরে আবৃত্তির সঙ্গে পরিচিত হয়েও কি-হিন্দু কি-মুসলমান কোনো গায়ককেই পয়ার-আবৃত্তিতে চারের পর পূর্ণ যতি দিতে শুনিনি। কারণ, তা দিলে শ্বসিত ছড়ার ভঙ্গিমা এসে যায়। সেই কথা বললাম এবং ভালো ক'রে লক্ষ্য করব এও জানালাম। আসল কথা বোধ হয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ ও ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র কি পয়ারজাতীয় কি আট-এর মাত্রাবৃত্তে চারমাত্রায় যতি-নির্দেশের পক্ষপাতী ছিলেন (অধুনা প্রবোধচন্দ্র অবশ্য ঐ স্থানে লঘুযতি ধরছেন) এবং সেই অনুসারে ভাষাবিজ্ঞানীর মনে একটা খটকা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে আরও পরে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র যখন Syllabic, Moric এবং Accented ছন্দঃ-পদ্ধতিত্রয়ের নোতুন নামকরণ করলেন (মিশ্রকলামাত্রিক, কলামাত্রিক ও দলমাত্রিক) তখন সুনীতিকুমার তা গ্রহণ করেন নি, অন্ততঃ উদাসীন রইলেন। তাঁর OBDLএর

সম্প্রতি যে পরিশিষ্ট তিনি যোজনা করেছিলেন তাতে কেবল বলেছেন যে বাঙ্‌লা ছন্দের মৌলিক ব্যাপারগুলি এখন পরিষ্কার ভাবেই বোঝা গেছে, শুধু নামকরণ ও খুচরো কয়েকটি বিষয়ে পারস্পরিক মতভেদ রয়েছে। তাঁর অভিপ্রায়ের অনুসরণে বলা যায়, তানময় স্বরধর্ম ও তদনুযায়ী পর্ব ; প্রায়-প্রাচীনরীতির অক্ষর-ধ্বনি মাত্রা ; শ্বাসাঘাত-মিশ্রিত স্বরধর্ম ও তদনুযায়ী মাত্রা-শৈথিল্য—এই তিনটিই মৌল ব্যাপার। তা ছাড়া Rhythmic Qualityর দ্বারা সংরক্ষিত ও পরিবেষ্টিত থাকে বলেই মৌলিক যৌগিক সব অক্ষরই বাঙ্‌লায় কৃত্রিমতা-মনোহর স্বরধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চারণের স্বাভাবিক মুল্য উল্লঙ্ঘন ক'রে দীর্ঘায়িত হয়, কোথাও কম, কোথাও একটু বেশি। বর্তমানে আমরা তাঁর দ্বারা স্পষ্টভাবে কথিত না হলেও, তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে অন্য দু'একটি বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি।

খাঁটি পয়ারের চাল আটে-ছয়ে (অথবা আটে-আটে, যতি দু'টি সহ)। এর মধ্যে অর্ধযতি বা লঘুযতি পাঠের স্বাভাবিকতাবশে কোথায় পড়বে ? অমূল্যধন বলছেন শব্দভিত্তিক হবে। প্রবোধচন্দ্র বলছেন লঘুযতি চারে চারেই পড়বে, কিন্তু যেখানে ঐ চার শব্দের মাঝখানে শেষ হচ্ছে সে সব ক্ষেত্রে যতিবিলোপ হবে। যেমন—/'কাননে কু/সুম কলি' অথবা 'পড়েছে তো/মার পরে প্রদীপ্ত বা/সনা/অর্ধেক মা/নবী তুমি অর্ধেক ক/ল্পনা' প্রভৃতি ক্ষেত্রে। এ বিষয়ে আমাদের প্রশ্ন, তাহলে আর ছন্দের ছন্দত্ব থাকে কোথায়, আর প্রয়োজনই বা কী ? শব্দার্থ একপথে চলে, ছন্দ, স্বর, তাল চলে অন্যপথে, নিজের পথে। ছন্দের তাল অর্থের বেতালকে মানতে যাবে কীজন্য ? যেখানে ছন্দের যতির সঙ্গে শব্দার্থের মিল ঘটছে সেখানে সোনায় সোহাগা। কিন্তু যেখানে তা হচ্ছে না সেখানে ছন্দের প্রাগ্‌-অধিকার না মানলেই নয়। আমাদের গুরুমশায় তো পড়তেন— পার কর বলিয়া ডা কিলা পাটনীরে'। অথবা, 'কিবা শোভা নদীতে ফু টিল কোকনদ।' কই, অর্থবিভ্রাট হচ্ছে ব'লে আমরা তো খেদোক্তি করিনি। রামায়ণাদির আবৃত্তিতেও তো এই রীতিই দেখি। কবির চিত্তে যে ভাব ও কল্পনার লীলা তার সঙ্গে তাল রাখতে পারে এমন ভাষা মানুষের আজও গড়ে উঠেছে কি ? কাব্যের ক্ষেত্রে ছন্দ বা স্বরধর্মকেই প্রধান ব'লে মান্য করতে হবে, স্পষ্টার্থবহতাকে নয়। অতএব যতিলোপ নয়, শব্দভিত্তিক পর্বাঙ্গও নয়, যতি ও অর্ধযতি নিজ খুশীতেই পড়ছে, পড়বে। বলা বাহুল্য মাত্রাবৃত্তের ক্ষেত্রেও অনুরূপ-ভাবে পড়তে হবে – 'সপ্ত হপরে। সাতশ তপ্রাণ' অথবা, 'বনচূড়া রঞ্জিল ॥ স্বর্ণরে খায়। পূর্বদি গন্তের। প্রান্তরে খায়।' এর অন্যথা সমীচীন হবে না। কবিরা ইচ্ছে ক'রে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার জন্য এরকম করেন, মাঝে মাঝে তালের খণ্ডন ঘটলে একঘেয়েমি কেটে যাবে, প্রবোধচন্দ্রের এধরণের মন্তব্যও শ্রোতব্য ব'লে বিবেচনা করা যায় না। অবশ্য যে-ক্ষেত্রে ছন্দের উপর শব্দার্থ আধিপত্য বিস্তার করুক এমনতর মনোভাব নিয়েই লেখা হচ্ছে, যেমন অমিত্রাক্ষর অথবা গদ্যছন্দে, সেখানে যতি বা অর্ধযতি শব্দানুসারেই বিহিত করতে হবে। সুনীতিকুমার অর্থনিরপেক্ষভাবেই তিন

রীতির ছন্দে (অমিত্রাক্ষর বাদ দিয়ে) অর্ধযতি বিন্যাসের পক্ষপাতী ছিলেন, যদিচ ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণে তা দেখান নি, মতভেদের ব্যাপার রয়েছে ব'লে।

তিনরীতির স্বরধর্ম-মিশ্র ছন্দের নামকরণ বিষয়ে সুনীতিকুমার অমূল্যধনের অভিমতই মেনে নিয়েছেন, দলমাত্রিক কলামাত্রিক প্রভৃতি লক্ষ্য ক'রেও অবহিত হন নি, নইলে নবযোজিত পরিশিষ্টে অথবা ব্যাকরণে তার উল্লেখ করতেন। বস্তুতঃ একটি ঢঙের নাম হবে Syllable (দল) এর উল্লেখ ক'রে, একটির নাম হবে mora (কলা)র উল্লেখ ক'রে, অন্যটির নাম অনর্থবহ 'মিশ্রকলা' দিয়ে—এ খুবই অসামঞ্জস্যের ব্যাপার দাঁড়ায়। যদি Syllable বোঝাতে 'দল' শব্দই বাঞ্ছনীয় হয়, তাহ'লে ঐ শব্দেই কিছু যোগ-বিয়োগ ক'রে অন্যগুলিও বোঝাতে হয়, নতুবা 'কলামাত্রিক' তো ধ্বনি মাত্রিকেই গিয়ে দাঁড়ায়, আর 'মিশ্র' বলতে ঐ দল-কলারই মিশ্রণ বোঝায়। তাছাড়া 'দলমাত্রিক' শব্দ বরং পয়ার ঢঙের পক্ষেই অধিকতর প্রযোজ্য হয়ে পড়ে। কারণ, এতেই তো একদল—একমাত্রা (শব্দশেষের নিয়মিত যৌগিক ব্যঞ্জনান্ত দল ছাড়া) অক্ষরবৃত্তেই তো সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়। আরও দেখি, দল-মাত্রাই কি শ্বসিত ছন্দের প্রধান লক্ষণ? প্রধান লক্ষণ তো ঐ শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত বা 'প্রস্বর' যার বলে মাত্রামূল্য অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ে। সবচেয়ে বিভ্রাটের সৃষ্টি করেছে 'মিশ্রকলা' নাম। মনে হচ্ছে এ ছন্দ অর্ধেক মাত্রাবৃত্তের ধর্ম রক্ষা করে, অর্ধেক অক্ষরবৃত্তের, তাই 'মিশ্র'। কথা হ'ল এই যে, উক্ত পয়ার ঢঙের ছন্দে মাঝের সিলেব্‌ল্ এর দীর্ঘতা অতিকচিৎ, এক সিলেব্‌ল্—একমাত্রা এর হেরফের হয় না বলেই চলে (হলে বলব, এটি ভুল হ'ল) অথবা শব্দশেষে ব্যঞ্জনান্ত যৌগিক থাকলে সেখানে দু'মাত্রা। এটি যে নিয়মিত ভাবে কেন হয় তার বৈজ্ঞানিক কারণ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এই যে অতিনিশ্চিত সুনিয়মিত একটি ব্যাপার এরই জন্যে ব্যাপক 'মিশ্র' বিশেষণ লাগাতে হবে? আর পুরাতন-স্মৃতির মাত্রাবৃত্ত ঢঙ্ বা স্বধর্মের বিশেষত্ব ধ'রে সুবর্ণিত ধ্বনি-প্রধান যদি অব্যাপ্তি-অতিব্যাপ্তি-দোষহীন আখ্যা না হয়, তাহ'লে এর যে আধুনিক স্থির-লক্ষণ (মধ্যযুগে যে ব্যতিক্রমই থাক্ না কেন), যৌগিকের অবশ্য-দ্বিমাত্রিকতা—সেই লক্ষণ ধ'রেই তো ত্রুটিহীন নামকরণ করা যেতে পারে।

এইবার আলোচনার শেষের দিকে আসছি। ছন্দের প্রকৃতি-বিশেষে পর্ব (Bar) কত কত মাত্রার হবে? পর্বে পর্বে যতিই বা কতক্ষণ থাকবে? ছান্দসিকেরা এর যে জবাব দিচ্ছেন তাতেও দেখা যায় ঐ অন্তর্লীন বিশেষ বিশেষ স্বরধর্মই মাত্রাসমঞ্জস পর্ববিভাগের নিয়ন্তা। এবিষয়ে তাঁরা একমত যে শ্বসিত বা ছড়া-জাতীয় ছন্দের পর্ব সর্বত্র চারমাত্রা ওজনের। প্রয়োজনমত বাড়িয়ে-কমিয়ে চারমাত্রার মাপ ঠিক রাখতে হবে। মাত্রাবৃত্ত বা যৌগিক-দ্বিমাত্রিকে সুনীতিকুমার ও অমূল্যধনের মতে ৫, ৬, ৭, ৮, আর রবীন্দ্রনাথ ও প্রবোধচন্দ্রের মতে ঐ সঙ্গে চারও। রবীন্দ্রনাথ গানের সুরতালের দিক লক্ষ্য রেখে তিনের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, মাত্রা-বৃত্তের মূলে তিনের বাঁধন, অন্য দুই রীতির মূলে দুয়ের বাঁধন। মাত্রাবৃত্তের পাঁচ—

৩+২, ক্বচিৎ ২+৩; ছয়ের পর্বের ক্ষেত্রে ৩+৩; আটের বেলায় ৩+৩+২, সাতের বেলায় ৩+৩+১। রবীন্দ্রনাথের মতে ৯ মাত্রার পর্ব চলে, অমূল্যধনের মতে চলে না, ৬+৩ এ ভেঙে নিতে হয়। বস্তুতই আধুনিকে নয়ের পর্ব অচল, কিন্তু মধ্যযুগে পয়ার-ঢঙেও তা ছিল। কবিকঙ্কণ তাঁর ত্রিপদীবন্ধে ৭+৭+৯ এর বিষম চালে একচরণ অন্তত ছ'টি ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন। কবিকঙ্কণের মূল পাঠ আমরা ধ'রে ফেলায় এটিও ধরা পড়েছে। প্রাকৃত পৈঙ্গলে মাত্রামূলক ৭+৭+৯ এর ত্রিপদীর পরিচয় রয়েছে। এরই অনুসরণে ব্রজবুলির কবি গোবিন্দদাস বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ৭+৯ এর গ্রন্থন করেছেন। ৮+৮ হিসাবেই ওগুলি আমাদের কানে ভালো শোনায় বটে, কিন্তু যখন দেখা যায় যে ৮+৮ করতে গেলে প্রায়শই 'চঞ্চল চরণক মলতলে ঝংকরু' এরকম শব্দাগ্রেই ভেঙে নিতে হচ্ছে, তখনই সংশয় জাগে এবং ৭+৯ এর (প্রাঃ পৈঙ্গলের নাগেন্দ্র কি মহেন্দ্র মনে পড়ছে না) মধ্যেই স্থির হতে হয়। যাই হোক, আমাদের পর্ব-ধারণা-শক্তি আগের থেকে হ্রাস পেয়েছে একথা মানতেই হবে (কারণটা ঐ 'বল' বা ঝোঁক যা লঘুতর পর্বের দিকে নিয়ে আসে), মাত্রানির্ভর ঢিমে-তেতালা আর ধাতে সইছে না। 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' প্রভৃতি অপভ্রংশের দশমাত্রিক পর্বের ছন্দ, বাঙ্‌লায় পাঁচে-পাঁচে ভাঙলে তবেই উচ্চারণ সুখাবহ হবে।

পরিশেষে ছন্দের যতির সঙ্গে গানের তালের সম্বন্ধ। সুনীতিকুমার সুরধর্ম বা সাংগীতিকতা লক্ষ্য করেছেন। বিশ্লেষণ ক'রে এ বিষয়টি বোঝান নি। অমূল্যধনের মতে অনেক ক্ষেত্রেই তালের পদক্ষেপের সঙ্গে কবিতার যতির মিল. পাওয়া যায়। প্রবোধচন্দ্রের মতে না পাওয়াই স্বাভাবিক কারণ, "বাক্‌বিন্যাস স্বভাবতই নির্ভর করে ভাষাগত ভাবের উপর। সংগীতের পক্ষে তা অলঙ্ঘনীয় নয়।" মনে সন্দেহ হয় যথাযথ কথা শুনছি কিনা, কারণ কথার ভাবের সঙ্গে সুরের সংগতিবিধানই তো রবীন্দ্রনাথের সংগীতশিল্পের প্রণিধানযোগ্য বিষয়। তা ছাড়া কাব্যাঙ্গ সংগীতেও তাই, কাওয়ালি, একতালা ঝাঁপতাল প্রভৃতি দেখুন, পূর্বেকার গান-কবিতার যতির সঙ্গে মেলে কি না। প্রবোধচন্দ্র উদাহরণ দিয়েছেন—ঐ আসে / ঐ অতি / ভৈরব/ হরষে। আমাদের ধারণায় এটি জোর ক'রে ব্যতিক্রম সংঘটন। নৃত্যে প্রয়োগ করার জন্যই ঐধরণের তাল পর্ব গঠনের প্রয়োজন হয়েছিল। নতুবা সাধারণভাবে কবিতাটি—ঐ আসে ঐ/অতি ভৈরব/হরষে প্রভৃতি পর্বেও অনায়াসে দাদ্‌রা তালে গীত হওয়ার যোগ্য ছিল। এরকম স্বেচ্ছাকৃত বিভ্রাট তিনি অন্য দু'একটি ক্ষেত্রেও করেছেন। কবিতার উচ্চারণে মাত্রামূল্য গাণিতিক নয়, গানে গাণিতিক, এরকম কথা (প্রবোধচন্দ্র) কোনো পার্থক্যের নির্দেশক নয়, কবিতাতেই বা মাত্রাপাঠ গাণিতিক হবে না কেন? কে ঠিক আবৃত্তি করছে, কে করছে না এ কবিতার সমঝদার বেশ ধ'রে ফেলবেন, ১ মাত্রার জায়গায় ১½ অথবা দু'মাত্রার জায়গায় ১½ তাঁর কানে লাগা উচিত। অবশ্য ঐ নিয়ে মারামারি করা হয় না, বা সমঝদার মেলে না, সে ভিন্ন

ভাষাতত্ত্ববিদ্যা ও সুনীতিকুমার

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ভাষাতত্ত্ববিস্তার একচ্ছত্র অধিপতি। প্রথম প্রকাশেই তিনি এই গৌরবান্বিত আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং জীবনাবসান পর্যন্ত পূর্ণ গরিমায় পূর্ণ মহিমায় এই আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আজ অস্তমিত,—সে আসন শূন্য আজি—।

তাঁর কীর্তিস্তম্ভ 'Origin and Development of the Bengali Language' দুটি বিরাট খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছিল ১৯২৬ সালে। তখন তাঁর বয়স ৩৬ বৎসর। তাঁর লেখা থেকে পাই, এর ১২।১৩ বছর আগে অর্থাৎ ২৩।২৪ বছর বয়স থেকে ইংরাজী ভাষা ও জর্মনিক ভাষাতত্ত্ব পড়তে পড়তে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিজের মাতৃভাষার ইতিহাস অনুসন্ধান করার বাসনা তাঁর মনে দানা বাঁধে। ইংরাজী ভাষার তত্ত্বকথা জানার জন্য যে সব আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার তিনি দেখেছিলেন, সেগুলি তাঁর বিস্ময় ও উৎসাহ জাগিয়ে তুলেছিল। তখন থেকেই পড়তে লাগলেন ইংরাজী ভাষাতাত্ত্বিকদের রচনা ও তার সঙ্গে ভারতীয় আর্যভাষার অনুসন্ধানী পণ্ডিতদের লেখা,—Uhlenbeck, Wackernagel, Whitney, Pischel, Beames, Bhandarkar, Hoernle, Grierson প্রভৃতি। আর জোগাড় করতে লাগলেন বই থেকে ও মুখের কথা থেকে সব মালমশলা যা ছড়িয়ে আছে চারদিকে। তিনি ইংরাজী 'বি' গ্রুপে এম্‌-এ পাস করেন। ৩।৪ বছর এলোমেলো সংগ্রহের পর ১৯১৬ সালে তিনি P.R S. এর জন্য তিন বছরের গবেষণা সূচী খাড়া করলেন, নাম দিলেন "An Essay Towards an Historical and Comparative Grammar of the Bengali Language"। নিদর্শন হিসাবে হাজির করলেন বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক একটি প্রবন্ধ "The Sounds of Modern Bengali"। ১৯১৯ সালে শিক্ষার্থে ইউরোপ যাত্রায় বহু ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতের কাছে তাঁর প্রারব্ধ কাজের প্রচুর উন্নতি করার সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রথমে Phonetics এ ডিপ্লোমা, পরে ১৯২১ সালে Indo-Aryan Philology নামে thesis দিয়ে D.Litt. ডিগ্রী লাভ করেন। এর পরেও আবার, বিশেষ করে ফ্রান্সে কয়েকজন ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতের এবং জর্মনী ও গ্রীসে কয়েকজন পণ্ডিতের কাছে নানাভাষার বিদ্যা সংগ্রহ করেন। ইংলণ্ডে জর্জ গ্রীয়ার্স‍ন বিশেষ করে তাঁর গবেষণার বিষয়ে আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ও ফরাসী পণ্ডিত ঝু-ল ব্লখের পাণ্ডিত্যের সংস্পর্শে এসে তিনি অশেষ লাভবান্ হয়েছিলেন। এঁদের কথা তিনি কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করেছেন। (ODBL, Preface)

দেশে ফিরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক হলেন ভারতীয় ভাষা-তত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বে, এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, ১৯২২ সালে। বাংলা ভাষার তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে তাঁর নিজস্ব সংগ্রহ ক্রমাগত বিদেশের বিশেষজ্ঞদের কাছে শিক্ষা ও সমালোচনায় পরিশীলিত হয়ে ODBL. যখন অপূর্ব পাণ্ডিত্যের নিদর্শনরূপে প্রকাশিত হল বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয় থেকে,—ভাষাশিক্ষার্থীরা যে তা অপরিসীম শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তার মধ্যে নিঃসংশয়ে ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, যিনি বহু দিন থেকে বাংলা ভাষার তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবেশ করেছিলেন ;—১৯০৯ সালে তাঁর "শব্দতত্ত্ব" গ্রন্থের প্রকাশ। পাশ্চাত্ত্য ভাষাতাত্ত্বিকদের আলোচনা যে তিনি খুঁটিয়ে পড়তেন, সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে তাঁর রচনা। ১৯২৭ সালে কবিগুরুর দ্বীপময় ভারত পরিভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন সুনীতিকুমার। কবির বিচক্ষণ দৃষ্টি চিনতে ভুল করেনি তাঁকে। "জাভাযাত্রীর পত্রে" (প্রকাশ, ১৯২৯) তাঁর সম্বন্ধে কবির মন্তব্য কবিসুলভ অতিরঞ্জন-যুক্ত নয় মোটেই। এতে তিনি লিখেছিলেন :

> "আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিষকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুম বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায় যা ভিড় করে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না তাকে তিনি তালভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন আর কাগজে কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্বব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ বলে কিছুই নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটা স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণত একথা বলা চলে যে শব্দতত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে গেছে, শব্দচিত্র তাদের এলেকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটা একেবারে উপরের তলায়। কিন্তু সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারে নি, এই বড়ো অপূর্ব। সুনীতির নীরন্ধ্র চিঠিগুলি তোমরা যথাসময়ে পড়তে পাবে,—দেখবে এগুলো একেবারে বাদশাই চিঠি। এতে চিঠির ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্, বর্ণনাসাম্রাজ্য সর্বগ্রাহী, ছোট বড়ো কিছুই তার থেকে বাদ পড়ে নি।"

সুনীতিবাবুর 'দ্বীপময় ভারত', 'বৈদেশিকী' প্রভৃতি গ্রন্থে এর পরিচয় সুস্পষ্ট। প্রসারিত দৃষ্টিতে তিনি সব জিনিস দেখেছেন, মনে রেখেছেন সব খুঁটিনাটি। তাঁর ধীশক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল দুটি দুর্লভ গুণের উপর। একটি হল দুরন্ত জ্ঞানপিপাসা—কোন কিছু বাদ না দিয়ে সব কিছু জানার আগ্রহ। দ্বিতীয়টি হল তাঁর অসাধারণ ধারণ-শক্তি,

স্মরণের মধুচক্রে সব কিছু সঞ্চিত রাখার অপরূপ ক্ষমতা। মহারথ কর্ণের সহজাত কবচ কুণ্ডলের মত মনে হয় এই গুণ দুটি তাঁর আজন্ম সম্পদ ছিল। এই গুণের পরিচয় বহুক্ষেত্রে দেখে আমি শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়েছি। প্রথম গুণটির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল তাঁর চিরযৌবনোদ্দীপ্ত উচ্ছল প্রাণশক্তি। এর জন্য তিনি ৮০ বছর বয়সেও বলতেন "I am a young man of eighty"—আমি আশি বছরের যুবক। ১৯৫৩ সালে আমেদাবাদে সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মিলনের তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন মূল সভাপতি। সেখানে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছে তাঁর যৌবন-চঞ্চল কর্মশক্তিমান্ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। এখানে কিছুক্ষণ বক্তৃতা দিলেন, ঘুরে এলেন অন্য একটি বিভাগে, কিছু শুনলেন, কিছু বললেন, ক্লান্তিহীন অচঞ্চল। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায়। তারই সঙ্গে চলেছে তাঁর অনবদ্য table talk—খুঁটিনাটি নানা ব্যাপারের আলোকময় ফুলঝুরি। একটি চিঠিতে (১৯৬১ সালের ৬ ডিসেম্বর) পরিচয় পাই কী কর্মচঞ্চল জীবনযাত্রা ছিল তাঁর ইউরোপে শিক্ষার্থীরূপে—

"My Dear Dwijen Babu,

I was really glad to read that you have at last been established at Edinburgh. Your real *tapasya* now has begun and you ought to make the best use of every moment available. The competence you will acquire now will carry you through life in intellectual studies··· But you must acquire some competence in Greek while you are there, and also in Latin, Gothic. Besides, since you are in Edinburgh where there is some study (of) Celtic, if you can manage to add a little Old Irish, it will not come amiss.

I would advise you to do what I did when I was in Great Britain. Go to some Gaelic church or chapel in Edinburgh some Sunday and attend a Gaelic Service to listen to the swing of the language. Take a little bus drive round about Edinburgh and you can go as far as Glasgow. Then finally, you must make a tour of the Highlands. Go by train from Edinburgh to Inverness, stay there for a day, and come down by steamer along the Caledonian canal spending a day at Fort Augustus, as we did, to Oban. Stay there for one night, and then take a bus drive through the magnificent Trossach Hills

back to Brig of Ayr, and then from there by train to Edinburgh. I did this little journey in 1921, and I still after 40 years vividly remember each scene…"

অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে ব্যক্তিগত চিঠি থেকে শুধু প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতিই দিলুম যাতে অনুমান করতে পারি জ্ঞান আহরণের কি দুর্বার ও প্রচণ্ড আগ্রহে কর্মব্যস্ত ছিলেন তিনি ওদেশে ছাত্রাবস্থায়। অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন তিনি। তার মধ্যে একটি, "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ"—ছাত্রদের (শিক্ষকরাও চিরকালের ছাত্র) জ্ঞান আহরণই হল তপঃ; তাই হল ধর্ম। শিক্ষকতা শুরু করার সময়ে তাঁর উপদেশ ছিল…"ছাত্রদের কাছে উজাড় করে দিতে হবে, যা কিছু জানি, আর পরিষ্কার বলতে হবে, যা জানি না।" এইসব উপদেশের মধ্যে পাওয়া যায় তাঁর শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব।

ODBL এর কথায় ফিরে আসি,…এতে কি কি আলোচিত হয়েছে, কোথায় তাঁর নিজস্ব দান, কি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এই গ্রন্থে, যা তাঁকে এককালে সুদুর্লভ অতুলনীয় পণ্ডিতের মর্যাদা দিয়েছে। প্রধানত বাংলাভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় হলেও তাঁর দৃষ্টির স্বভাবসুলভ ব্যাপকত্বের ফলে, যার কারণ আগেই বিশ্লেষণ করেছি এবং পূর্ব-পরিকল্পিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে দেশবিদেশের থেকে নানা সংগ্রহের ফল যুক্ত হওয়ার ফলে এই গ্রন্থে বহু বিষয় পরিবেশিত হয়েছে যাকে অনেকে বলবেন অপ্রাসঙ্গিক।

প্রথম সর্বভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিকদের সম্মেলনে (পুনা, ১৯৭০) সুনীতিবাবু ছিলেন সভাপতি। তাঁর ভাষণে তিনি বলেছেন:

> "ভাষাতত্ত্ব পাঠ সুরু করার সময়ে দেখেছি বিষয়টি কারও ঠিকমত জানা ছিল না বললেই হয়, আর জনপ্রিয়তা ছিলই না। এই বিষয়কে ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকেরা অবজ্ঞার চোখে দেখতেন এমন কি সন্দেহের চোখেও এবং কার্যত নিষিদ্ধ করে রেখেছিলেন। আমি যখন ১৯০৭ সালে কলেজে পড়া আরম্ভ করি, তখন ভাষাকে তুলনা করে পড়ার ব্যবস্থা ছিল না। প্রাচীন ব্যাকরণের পদ্ধতিতে বর্ণনামূলকই ছিল।……আমি বলেছি ইংরাজীতে B. A. Honours ও M. A. পড়তে পড়তে ইণ্ডো-ইউরোপীয় ও ভারতীয় আর্য ভাষার ভাষাতত্ত্বের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। ইউরোপে গিয়ে আমি খুব সুবিধা পেয়েছিলুম। সেখানে Daniel Jones প্রভৃতি মনীষীদের কাছে বিশেষত দুবছর ধরে ধ্বনিতত্ত্বে নিয়মিত চর্চা করে জেনেছিলুম ভাষার বর্ণনামূলক, ইতিবৃত্তমূলক ও তুলনামূলক শিক্ষায় ধ্বনিতত্ত্বের গুরুত্ব কতখানি।" (অনুবাদ আমার)

এই ধ্বনিতত্ত্বে শিক্ষার পরিচয় ODBL-এ আগাগোড়া ছড়ানো রয়েছে। বিভিন্ন

ভাষার বিভিন্ন রকমের Transliteration বা অনুলিখন পদ্ধতি দিয়ে ODBL.-এর আরম্ভ। এতে বাংলাধ্বনি এবং সংস্কৃত, প্রাকৃত, ফারসী, আরবী ও অন্যান্য ভাষার ধ্বনি সম্বন্ধে তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান প্রকাশ পেল। তারপরে Phonetic transcription যা তাঁরই ভারতে প্রথম দান বলা চলে, তার বিস্তৃত তালিকা অবশ্যই বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। প্রায় দেড়শ' পৃষ্ঠাব্যাপী Introduction এবং তার পরে আবার প্রায় শ'খানেক পাতার Appendix পাঁচটি। তারপর ৪২০ পৃষ্ঠাব্যাপী Phonology এবং ৪০০ পৃষ্ঠাব্যাপী Morphology—এই বিস্তৃত পাণ্ডিত্যের নিদর্শন ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। প্রায় সর্বত্র তিনি বাংলা শব্দ না হলে রোমান অক্ষরে এবং যেখানে উচ্চারণ বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য সেখানে Phonetic transcript দেখিয়েছেন।

Phonology অংশে প্রথমে সমগ্রভাবে ভারতীয় আর্য ভাষার ধ্বনির ইতিহাস বলেছেন। সংস্কৃত, মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা ও বাংলা ভাষার বিভিন্ন স্তরের ধ্বনির ক্রমবিকাশ দেখিয়ে পারস্পরিক তুলনা করেছেন। তারপর বাংলার ধ্বনির দুটি প্রধান বিভাগ করে (স্বদেশী ও বিদেশী উপাদান) ধ্বনি বিবর্তনের আলোচনা করেছেন। বাংলার স্বরাঘাত পদ্ধতির ক্রমবিকাশ ও ছন্দের বিকাশের সঙ্গে তার সম্বন্ধ একটি বিশেষ অধ্যায়ে আলোচনা করে তারপর প্রথমে প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় ধ্বনিগুলির বিবর্তনধারা দেখিয়ে বাংলা ভাষার ধ্বনির ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ক্রমে ক্রমে দেখিয়েছেন। বাংলায় অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতির ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য বাংলাভাষাতত্ত্বে এক বিশেষ দান। 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' গ্রন্থেও তিনি এর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বিদেশী উপাদানের আলোচনাও তাঁর বেশ বিস্তৃত। আরবী, ফারসী, পোর্তুগীস ও ইংরাজী ভাষা থেকে বাংলায় যে সব শব্দ এসেছে তাদের ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন তিনি সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি এতই খুঁটিয়ে কাজ করেছেন যে প্রাচীন বাংলা, মধ্য বাংলার সঙ্গে আধুনিক বাংলার উদাহরণগুলি তুলনা ত করেছেনই, তাছাড়া অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী ভাষা থেকে এবং বাংলার বিভিন্ন উপভাষার তুলনামূলক আলোচনা কোন কিছুই তিনি বাকি রাখেন নি। এর থেকে অংশ নিয়ে নিয়ে নানা গবেষণা নিবন্ধ তৈরি হতে পারত। ধ্বনিতাত্ত্বিক বিবর্তন দেখাতে গিয়ে অনেক সময়ে ক্রমপর্যায়ে বহু শব্দ লিখিত নিদর্শন থেকে উদ্ধার করা সম্ভব যেখানে হয় নি সেখানে তিনি আনুমানিক শব্দ গঠন করে নিয়েছেন ধ্বনিসূত্র অনুযায়ী। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। এ বিষয়ে যাঁদের দক্ষতা নেই তাঁরা এ চেষ্টায় অকৃতকার্য হবেন—ভ্রান্ত নিরুক্তি বা লোকনিরুক্তির জালে কখন জড়িয়ে পড়বেন, তাঁরা জানবেন না। বস্তুতঃ ধ্বনিতত্ত্বের বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞান না থাকলে শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা বিফল হতে বাধ্য।

Morphology অংশে প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় করতে তিনি ভাষার ইতিহাসের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেন নি। বিশেষ্যের শব্দরূপ অংশে লিঙ্গ, বচন, কারক ও অনুসর্গ আলোচনা করেছেন। Syntax নামে কোনও অংশ না করায় তিনি এই Morpho-

logy অংশেই কিছু কিছু Syntax-এর প্রসঙ্গ এনে ফেলেছেন যেমন বিভিন্ন কারক বোঝাতে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার, যদিও তেমন আলাদা করে তিনি দেখান নি। পদাশ্রিত নির্দেশক বা সংখ্যা বাচক শব্দাংশ আলোচনা করে সংখ্যাবাচক বাংলা শব্দগুলির ঐতিহাসিক বিবর্তনের আলোচনা করেছেন। সর্বনামের ও ক্রিয়াপদের বিস্তৃত বিবর্তন বিবরণ বিশেষ উল্লেখ্য কৃতিত্ব তাঁর।

সাধারণ ব্যাকরণে Morphology-রই আলোচনা সমধিক। 'ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ' নামে ১৯৩৯ সালে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ODBL.-এ যা আছে তারই সার সংক্ষেপ তিনি করেন নি এই গ্রন্থে। অনেক বিষয় নূতন করে আলোচিত হয়েছে এখানে। তা ছাড়া ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা এত বিস্তৃতভাবে ইতিপূর্বে কোনও ব্যাকরণে করা হয় নি। তার কারণ ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনার যোগ্যতা ইতিপূর্বে কারও ছিল না এদেশে। বাংলা ব্যাকরণের প্রয়োজন সম্বন্ধে এ দেশের মনীষীরা অবহিত ছিলেন। ১৩০৮ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ও বঙ্গদর্শনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও রবীন্দ্রনাথ লিখলেন যথার্থ বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করার প্রয়োজন রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—

> "বাংলায় জল হইতে জোলো,……জ্যাঠা হইতে জ্যাঠাম প্রভৃতি চলিত কথাগুলি হইতে উয়া, তা, আম প্রভৃতি প্রত্যয় সংকলন করিয়া ভাবী ব্যাকরণকারের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলাম। ব্যাকরণ তাঁহারাই করিবেন। আমার কেবল মজুরিই সার।"

রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর "বাংলা ব্যাকরণ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করেছিলেন,—

> "আমরা যতদূর বুঝিয়াছি রবিবাবু (বাংলা ব্যাকরণ শাস্ত্রে) সেই মশলা সংগ্রহের জন্ম সকলকে আহ্বান করিয়াছেন মাত্র এবং এই মজুরের কার্যে যদি কেহ অপমানবোধ করেন, এই কর্ম্মকে হেয় কার্য্য জ্ঞান করেন, সেই জন্ত স্বয়ং মজুর বৃত্তি গ্রহণ করিয়া অন্তের অনুকরণীয় হইয়াছেন মাত্র। তজ্জন্ত তিনি ধন্য; তজ্জন্য তিনি কৃতজ্ঞতার ভাজন; তজ্জন্ত সাহিত্যসমাজ তাঁহার নিকট ঋণবদ্ধ। তিনি পাণিনি স্থলাভিষিক্ত হইবার স্পর্দ্ধা করেন নাই। তবে ভবিষ্যতের পাণিনি যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবেন তাহার কোন ক্ষুদ্র অংশের নক্সায় আঁচড় ফেলিবার চেষ্টা করিয়া যদি সফল হন বা কোন ক্ষুদ্র অংশের ভিত্তি স্থাপনে সমর্থ হন তাহা হইলেই তাঁহার কৃতিত্ব প্রশংসার্হ হইবে।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যাকরণকারদের কেবল মালমশলার জোগানদারই ছিলেন না। সুনীতিবাবু ODBL.-এর মুখবন্ধে তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন যে তিনিই প্রথম ভাষার সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করেছিলেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে। তাঁর মতে কবি ছিলেন—

"a keen philologist as well, distinguished alike by an assiduous enquiry into the facts of the language and by a scholarly appreciation of the methods and findings of the modern western philologist."

কবির ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং বাংলা বিশেষ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সব প্রবন্ধ ইতিপূর্বে লিখেছিলেন তার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

"These papers may be said to have shown to the Bengali enquiring into the problems of his language the proper lines of approaching them."

রবীন্দ্রনাথের ঐ সব রচনা "শব্দতত্ত্ব" গ্রন্থে প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। তারপর যখন তাঁর ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থ "বাংলা ভাষা পরিচয়" প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে তখন সুনীতিবাবু প্রতিষ্ঠিত ভাষাতত্ত্ব-যুগন্ধর। তাই রবীন্দ্রনাথ "ভাষাচার্য" উপাধি দিয়ে তাঁকে এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করলেন। এই গ্রন্থের গোড়ায় কবি লিখেছেন—

"ভাষাতত্ত্বে প্রবীণ সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার তফাৎ এই—তিনি যেন ভাষা সম্বন্ধে ভূগোল বিজ্ঞানী, আর আমি যেন পায়ে চলা পথের ভ্রমণকারী। নানা দেশের শব্দমহলের এমন কি তার প্রেতলোকের হাটহদ্দ জানেন তিনি, প্রমাণে অনুমানে মিলিয়ে তার খবর দিতে পারেন সুসম্বদ্ধ প্রণালীতে।"

পরে আবার লিখেছেন—

"যে প্রাচীন প্রাকৃতের সঙ্গে বাংলা প্রাকৃতের নিকট সম্বন্ধ তার রঙ্গভূমিতে আমাদের স্বরবর্ণগুলি জন্মান্তরে কী রকম লীলা করে এসেছে তার অনুসরণ করে এলে অপভ্রংশের কতকগুলি বাঁধারীতি হয়ত পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে পথের পথিক আমি নই। খবর নিতে হলে যেতে হবে সুনীতিকুমারের দ্বারে।"

ভাষা-বিচক্ষণ কবি রবীন্দ্রনাথের এই সব মন্তব্যে ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমারের নিঃসন্দিগ্ধ শ্রেষ্ঠত্ব অতি সুন্দর প্রকাশিত হয়েছে।

ODBL গ্রন্থের Foreword লিখেছিলেন স্যর জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন, যাঁর "ভারতীয় ভাষার সমীক্ষা" (একাধিক খণ্ডাংশ সমন্বিত এগারোটি বৃহৎ গ্রন্থে বিধৃত) ভাষাতত্ত্বে এক বিরাট দান। সুনীতিবাবু তাঁর ভারতীয় আর্যভাষার বহির্বর্গ বিভাগের সম্যক্‌ভাবে খণ্ডন করেছেন যুক্তি উদাহরণ দিয়ে। এই গ্রীয়ার্সন লিখলেন—

"Endowed with a thorough familiarity with Bengali,—his native tongue,—he has been able to bring together an amount of material which no European could ever have hoped to collect; and he has had the

further advantage of pursuing his theoretical studies under the guidance of some of the greatest European authorities on Indian philology. This work is accordingly the result of a happy combination of proficiency in facts and of familiarity with theory and exhibits a mastery of detail controlled and ordered by the sobriety of true scholarship."

এর চেয়ে সুষ্ঠু সমালোচনা আর হয় না। সুনীতিবাবু যদিও স্বীকার করেছেন যে ঝু.ল ব্লখের "মারাঠী ভাষার গঠন" তাঁর গ্রন্থের কাঠামো ঠিক করে দিয়েছিল এবং স্বভাবসিদ্ধ গুরুপ্রশংসায় তিনি ব্লখের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত, তবু গ্রীয়ার্সনের তীক্ষ্ণ বিচার অনুযায়ী তিনি ব্লখের চেয়ে অনেক বেশি যোগ্যতা দেখিয়েছেন—সিন্ধী ব্যাকরণের প্রণেতা Trumpp, হিন্দী ব্যাকরণ প্রণেতা Kellogg, বা হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ প্রণেতা C. J. Lyall-এর চেয়েও।

তিনি বলেছেন, "আমার কাজ, এই ক্ষেত্রে ভারতে প্রথম বলে স্বাভাবিকভাবেই চিহ্নিতত্ত্বের সুবিধা পেয়েছিল, যা থেকে বহু পরবর্তী গবেষক নীতি, পদ্ধতি ও ধারার অনুসরণ করার সুযোগ পেয়েছেন।" (সভাপতির ভাষণ ১৯৭০) তিনি একটি ভাষাতত্ত্বের চর্চার নিজস্ব ধারার (School) সৃষ্টি করেছেন ভারতীয়দের জন্যে, যা হিন্দী, উর্দু, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কন্নড, বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলী, অসমীয়া, কাশ্মীরী, পঞ্জাবী, সিন্ধী, ভোজপুরী প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আলোচনায় গবেষকেরা স্বচ্ছন্দে অনুগমন করে কৃতবিদ্য হয়েছেন।

তাঁর "ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণের" প্রসঙ্গ আরও একটু তুলে বলতে চাই, ODBL সাধারণের কাছে গম্ভীর ও প্রকাণ্ড বিস্ময় বলে দূরে সরানো ছিল, কিন্তু ব্যাকরণ হিসাবে এই গ্রন্থকে এড়ানো গেল না, পঠনীয় বলে বিবেচিত করতে ভাষাশিক্ষকদের ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। কারণ, এই ধরনের পাঠ্য ছাত্রদের কাছে পরিবেশনের যোগ্যতা অর্জন করাও শিক্ষকদের কাছে সুকঠিন ছিল। তাঁর ব্যাকরণ আরও এক সম্প্রদায়কে অসন্তুষ্ট করেছিল, যাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের সাজে বাংলা ব্যাকরণকে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। এঁরা তাঁর ধ্বনিসূত্রানুমোদিত শব্দের ব্যুৎপত্তি বুঝতে না পেরে অনেক সময় ভ্রান্ত-নিরুক্তি দিয়ে তাঁর বিকৃত অনুসরণ করতে গিয়েছেন।

ODBL-এর অনেক কথা তাঁর "বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা" এবং "Languages and Literatures of Modern India" প্রভৃতি গ্রন্থে পুনরুল্লিখিত হয়েছে। এর কারণ তাঁর গবেষণা দৃষ্টির একটা নিজস্বতা ছিল। গবেষণা সম্বন্ধে তিনি বলতেন—"খণ্ডন আর মণ্ডন"। শুধু পূর্বসূরীদের মতামত খণ্ডন করাই নয়, ইতিপূর্বে পণ্ডিতদের যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা যদি ত্রুটিহীন হয় তবে

সেগুলিকে নিজস্ব বক্তব্যের অনুকূল করে সাজিয়ে গুছিয়ে বা মণ্ডন করে উপস্থিত করাকেও গবেষণা বলা চলে, এই কথা বলতেন তিনি। তাই নিজের যে সব বক্তব্য সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত ও প্রমাণিত বলে জানতেন, তাদের পুনরুল্লেখ করায় দোষ দেখতেন না।

আরও একটি আপাতদৃষ্টিতে ত্রুটির কথা বলতে হয়। তা হল বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে সোজাসুজি সম্পর্কহীন অনেক কথা তিনি বলেছেন ODBL এ। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজেরও বোধ ছিল। তিনি লিখেছেন (Preface ,xiv)

> "But in my own book, as I find, I had to discuss many points, some of them side-issues, especially in the *Introduction*, which should be but merely touched upon in a work of a professedly linguistic character, not being immediately *a propos* for history of language, and perhaps, I had to be fuller in detail, and at times, repetition became unavoidable."

তাঁর মতে ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনের সঙ্গে জাতি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পিছনে না রেখে বিচার করা চলে না। F. W. Thomas এর কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতা তিনি বহুবার স্বীকার করেছেন। সংস্কৃতি সভ্যতার দিকে Thomas এর দৃষ্টি সব সময়েই থাকত। তা ছাড়া সুনীতিবাবুর Philology একটা নিজস্ব ধারায় গড়ে উঠেছে। ভাষাকে তিনি সভ্যতা সংস্কৃতি সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখেই আলোচনা করেছেন। তাঁর এ বিষয়ে অভিমত উদ্ধার করে বলাই ভালো।

> "Language is after all a living phenomenon, and it is perpetually on the move—it is like a life-giving stream or river.........In our linguistic studies, this imaginative aspect of language we should never lose sight of, and this aspect of it is on a mundane plane—but it brings an awareness of the power and beauty, as well as the romance and mystery of man's speech."
>
> (সভাপতির ভাষণ, পুনা ১৯৭০)

ভ্রমণপ্রিয় ছিলেন তিনি। দেশেবিদেশে তিনি স্বচক্ষে দেখতে ভালবাসতেন তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, সভ্যতা, স্বকর্ণে শুনতে ভালোবাসতেন নিজস্ব ভাষা ও সঙ্গীত। তাঁর এই বহুবিধ মানবিক বিদ্যার দিকে আকর্ষণ থাকার জন্যই ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর দর্শন ছিল বিশিষ্টতামণ্ডিত। Philology র যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় "কোনও একটি বিশেষ অঞ্চলে সমভাষী জনসম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ও ভাবধারার লিখিত নিদর্শনের ভাষাবিষয়ক আলোচনা" তা তাঁর ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিই সার্থকতা দিয়েছে। নানা ধ্বনিতত্ত্ব

সম্মেলন, ভাষাতত্ত্ব সম্মেলন বা সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে তিনি যখনই যেখানে যেতেন, সেই দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি-ভাষা বিষয়ক একটি রচনা প্রণয়ন করতেন। সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি রেখে দেশবিদেশের নিজস্ব "ইজ্‌ম্" আবিষ্কার করেছেন তিনি। Africanism, Indianism প্রভৃতির সন্ধানে তিনি জীবনের শেষ দিক অতিবাহিত করেছেন। Balts and Aryans নামে এ জাতীয় গ্রন্থ বোধ হয় তাঁর সর্বশেষ রচনা। তাঁকে ভারতের মানবিকী বিদ্যায় জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করা সার্থক হয়েছিল।

আরও একটি কথা না বললে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। একথা অনেকেই জানেন আধুনিক ভাষাতত্ত্ব নামে ভাষাতত্ত্বের এক নবীন দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গেছে, যা সুনীতিবাবুর ভাষাতত্ত্বের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। এই নবীন ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব কেমন ছিল তার স্পষ্ট ছবি তুলে দেওয়া দরকার। আশী বছর বয়সে তিনি বলছেন "ভাষা ও সাহিত্য চর্চা আমি আজও করে যাচ্ছি—এই ৫৬ বছর ধরে আমি ভারতে ভাষাতত্ত্বের গতি প্রগতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছি।" এই নবীন ভাষাতত্ত্বকে তিনি দু তিন কথায় অভিযুক্ত করেছেন। একটি হল, গণিতের দিকে বা অন্যান্য তাত্ত্বিক বিষয়ের দিকে এর নির্ভরতা। দ্বিতীয়, নূতন নূতন পরিভাষার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক এবং সর্বোপরি ভাষার প্রাচীন ইতিহাসকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা। তা ছাড়া যে সব নব নব শব্দসংক্ষেপ (Abbreviation) ও তাই দিয়ে formula বা সূত্র রচনার প্রবণতা যা সাধারণ পাঠকের কাছে বিষয়বস্তুকে দুর্বোধ্য করে তোলে। তাঁর একটি প্রবন্ধ ছিল ভাষাতাত্ত্বিকদের নবম আন্তর্জাতিক সম্মিলনে, নাম ছিল "The Levels of Linguistic Analysis"—এতে তিনি তাঁর স্বাভাবিক উদারতায় প্রাচীন ও নবীন দুই পন্থার ত্রুটি সংশোধন করে মিলিত করে ভাষাচর্চার পদ্ধতি নিরূপণ করতে চেয়েছেন এবং অধিকাংশ নবীন ভাষাতাত্ত্বিক যে প্রাচীন পদ্ধতিকে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন সেজন্য তিনি ব্যথিত। তিনি অনেক সময় আমাদের বলেছেন—এই আধুনিক বিদ্যা এখনও আকাশে বিচরণ করছে, মাটিতে এর পা পড়ে নি। আর প্রাচীন ভাষাতত্ত্ব বিদ্যা সম্বন্ধে গ্যালিলিও তাঁর প্রাণদণ্ড গ্রহণের পূর্বে মাটির উপর পদাঘাত করে যে বলেছিলেন—"তবুও এটা ঘুরছে"—সেই কথাটিও অনেক সময় বলতেন।

তাঁর পাণ্ডিত্য তাঁকে এমনই বিরাটত্ব দিয়েছিল যে তিনি যদি তাঁর সমুন্নত মস্তক নিচু করে সকলের সঙ্গে না মিশতেন, তাহলে তাঁর জীবন ভরে এত মাধুর্য তিনি উপভোগও করতে পারতেন না, পরিবেশনও করতে পারতেন না। হৃদয়ের মহানুভবতা ও ছাত্রবৎসলতা তিনি ছদ্ম সুদূর ব্যবধানের অন্তরালে সুগূহিত করে রেখেছিলেন।

এক বিরাট আদর্শ রেখে গেছেন তিনি তাঁর ছাত্রদের জন্য। তাঁর বিষয়ে চিরকালের শিক্ষার্থীদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর অমূল্য কর্মকৃতিত্ব যার জন্য তিনি হয়ে থাকবেন "সহস্রায়ু"।

সুনীতিকুমার ও নব্য ভাষাবিজ্ঞানী

পরেশচন্দ্র মজুমদার

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ভাষাবিদ্যার এক স্বর্ণময় যুগের অবসান ঘটলো। এক মহান্ মৃত্যুর আকস্মিক যবনিকা পতনে শোকের নিঃসীম স্তব্ধতা নেমে এলো। বাস্তবিক পক্ষে এ আমাদের জাতীয় শোক। জাতীয় ঐতিহ্যের কী উত্তরাধিকার, কী সঞ্চিত ফসল "জাতীয় অধ্যাপক" আমাদের জন্য রেখে গেলেন, তা বিচার করবে আগামী দিনের মানুষ, কিন্তু প্রতিভাদীপ্ত এই মহামানবের সমকালীন সান্নিধ্য পেয়েছে যে পরিচিত গুণীজন—তাঁরা পরিচিতির গৌরব ও তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়ের বিয়োগ-ব্যথাও অনুভব করবেন—এইটিই স্বাভাবিক। কিন্তু শোককৃত্যের শ্রাদ্ধবাসরে যদি কোন অর্বাচীন মৃতের জমা-খরচের খাতার শূন্য পাতাটি বারবার শোকাহতদের দিকে তুলে ধরতে থাকেন, তবে সন্দেহ জাগে, তিনি হয়তো মৃতের সম্পত্তির কোন দাবীদার হয়ে বসতে চাইছেন। দুঃখের কথা, সম্প্রতি অনুরূপ ঘটনাই ঘটে গেছে।

কোন এক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রে জানা গেল, জনৈক গুণীব্যক্তি এই জাতীয় "অশৌচ" পর্বে স্বর্গত সুনীতিবাবুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন; তাঁর রচনায় যতটা না শোক অনুভূত হয়েছে, তার চেয়ে বেশি শ্রুত হয়েছে ৺সুনীতিবাবুর কৃতকর্মের প্রতি আশ্বাস-বাণী। শোকাহত ব্যক্তি মৃতজনের উজ্জ্বল মুহূর্তের, তাঁর সফলতার পূর্ণতার স্মৃতি দিয়ে ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে চায়, কিন্তু এই গুণীব্যক্তি মনে করেন: "তাঁর (সুনীতিবাবুর) ব্যর্থতা ও অপূর্ণতা ত্বরান্বিত করুক আজকের বাঙালীর পূর্ণতা ও সফলতার সাধনা।"

এমন উক্তিতে কেউ চমকিত না হয়ে পারেন না, কিন্তু চকিতে মনে হয়, এমন সহজেই "জাতীয় অধ্যাপকে"র অবদান যিনি বিশ্লেষণ করতে পারেন, তিনি নিশ্চয় মোহিতলালের ভাষায় "দুইদিকে উদ্গত-পক্ষ কোন অধ্যাপক-পতঙ্গ" এবং বিলাতবিহারী কোন উচ্চ পদাভিষিক্ত ইঙ্গবঙ্গীয় 'স্কলার' (পণ্ডিত অভিধাটি একটু সেকেলে!)। অথবা বিদ্যাসাগরীয় তত্ত্বে বিশ্বাসী আমরা একথাও মনে করতে পারি, তিনি হয়তো কোনদিন সুনীতিবাবুর দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন। ভাষাতত্ত্বের আসরে অভিভাবকত্বের আসনটি হঠাৎ দখল করতে চাওয়ায় আমাদের মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে তিনি হয়তো ভাষাতত্ত্বের নতুন প্রজন্মের কোন উদ্যোগী পুরুষ, সার্থক পুরোধা। কিন্তু উষ্মার কথা থাক্। এই নবীন ভাষাবিদের ওজনদার যুক্তির কিছু বিশ্লেষণ করা যাক।

সুনীতিবাবুর ভাষাতাত্ত্বিক অবদান সম্পর্কে এই ভাষাবিদের প্রাথমিক বক্তব্য তাঁর

নিজের ভাষাতেই বলি : "সুনীতিকুমার মূলত ব্লকের (Jules Bloch) পথ অনুসরণ করেছিলেন। ......সেদিক থেকে সুনীতিকুমার কোন মৌলিক পথ দেখান নি...... অর্থাৎ সুনীতিকুমার কোন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবক নন, কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতির একজন নিপুণ প্রযোজক।......আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে সুনীতিকুমার ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে কোন মৌলিক পদ্ধতির বা মৌলিক চিন্তার জনক নন। বিংশ শতাব্দীর কোন শ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিকের সঙ্গে তাঁর তুলনা ক'রে আমরা কোন আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি না।"

ধরে নেওয়া গেল, সুনীতিবাবু বাঙলাভাষা বিশ্লেষণে যে ঐতিহাসিক ও তৌলন পদ্ধতি (Historical and Comparative Method) অবলম্বন করেছিলেন, সে-পদ্ধতি তাঁর গুরু ঝ্যুল ব্লক্ পূর্বেই মারাঠী ভাষার ক্ষেত্রে প্রবর্তন করেছিলেন। সুতরাং এই পদ্ধতির উদ্ভাবক তিনি নন, কেবল অনুবাদক মাত্র। কিন্তু উদ্ভাবক নন বলেই কি তাঁর সমীক্ষা, তাঁর বিশ্লেষণ-পদ্ধতি কালজয়ী হতে পারে না? এই মানদণ্ড গ্রহণ করলে তো ভাষাশাস্ত্রে পাণিনির প্রতিভাকেও অস্বীকার করতে হয়, কারণ পাণিনি তাঁর পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য ও আদর্শ অঙ্গীকার করে নিয়েও নিজের স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে প্রবর্তক ও প্রযোজকের আপেক্ষিক গুরুত্ব একই তৌলদণ্ডে এইভাবে পরিমাপ করা যায় না। অস্বীকার্য নয়, Bloch-এর La Formation de la Langue Marathe (সংক্ষেপে LM, 1920) অনবদ্য গ্রন্থ, কিন্তু তা ব'লে The Origin and Development of Bengali Language (ODBL, 1926) গ্রন্থখানির মৌলিকত্ব নস্যাৎ করা চলে না। ভাষাতত্ত্বের ছাত্রমাত্রেই জানেন, LM এবং ODBL-এর পার্থক্য কোথায় নিহিত।

প্রথমত, ODBL গ্রন্থখানির সুদীর্ঘ ভূমিকাটি তাঁর প্রখর মননশীলতা ও অসামান্য মেধার এক চূড়ান্ত নিদর্শন। এই ভারত উপমহাদেশের বিচিত্র ভাষা ও সাহিত্য, ভাষা-বিবর্তনের ঐতিহাসিক স্তরভেদ ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্য, বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর সংযোগ ও পারস্পরিক প্রভাব ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তিনি গবেষণার যে বিশাল পটভূমি ও বিচিত্র পরিধি অঙ্কিত করে গেছেন, উত্তরকালীন সর্বজাতীয় গবেষকদের কাছে তা কেবল ভারতের ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা রূপে নয়, ভৌগোলিক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক জীবনবোধেরও বেদ ও বিজ্ঞান রূপে প্রতিভাত হয়েছে। বস্তুত, ODBL গ্রন্থখানির সুদীর্ঘ ভূমিকায় 'ভারততত্ত্ব' (Indology) বিষয়ক গবেষণার একটি সুন্দর সংহত আদর্শ গড়ে তোলা হয়েছে বলেই তা সারা পৃথিবীতে এমন সাড়া জাগাতে পেরেছে।

দ্বিতীয়ত, LM-এর তুলনায় ODBL-এ শুধুমাত্র এই নতুন মাত্রাই (Dimension) আরোপিত হয়নি, নতুন সংযোজনেও তা পরিপুষ্ট ও প্রসারিত হয়েছে। বাঙলা ও সংস্কৃত ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics), প্রত্যয়বিচার (Formative Affixes), শব্দভাণ্ডার (Vocabulary) ও আগন্তুক (Borrowed) শব্দাবলীর স্বরূপ ও উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য এবং

বাঙলা ভাষার ঔপভাষিক (Dialectal) বিন্যাস প্রভৃতি ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন বিভাগ এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম সামগ্রিক আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে—যা LM কেন, অন্য কোন পূর্বসূরীদের রচনাতেও প্রাধান্য পায় নি। আবার LM গ্রন্থের আদর্শও তিনি হুবহু গ্রহণ করেন নি, তাই ODBL গ্রন্থে বাক্যরীতি (Syntax) সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পায় নি।

পরিশেষে LM-এর তুলনায় ODBL-এর অভিনবত্ব সম্পর্কে জেনে রাখতে হবে : ODBL, LM গ্রন্থখানির মতো কেবল বাঙলা ভাষার Diachronic বা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ মাত্র নয়, তা Synchronic বা সমকালীন সমীক্ষার এক নিপুণ শিল্পকর্ম। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক ও সমকালীন ব্যাকরণের এমন চূড়ান্ত রূপ ইন্দো-ইউরোপীয় কোন বিশিষ্ট ভাষায় লিখিত হয়েছে ব'লে আমাদের জানা নেই।

অবশ্য বাঙলাভাষার Synchronic সমীক্ষার ক্ষেত্রে তিনি Descriptive বা বিবরণ-মূলক ব্যাকরণের জটিল পরিভাষা-কণ্টকিত পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি। কিন্তু এটি তার চরম অপরাধ না-ও হতে পারে। কারণ, যে-কোন বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ক্ষেত্রে Terminology নয়, Attitude-ই প্রাধান্য পেয়ে থাকে, পরিভাষার প্রবল শাসন-শৃঙ্খলের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে মুক্ত মনের কৌতূহলী জিজ্ঞাসা। ঠিক এই কারণেই নব্য ভাষাবিদ্‌রা পাণিনিকে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ Descriptivist বলে থাকেন। এমনকি বর্তমানে Chomsky-পন্থীরাও পাণিনিকে রূপান্তরী উৎপাদক (Transformational-Generative) পদ্ধতির প্রাচীন প্রবক্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। এইরূপ একজন আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ভাষায়—"...several important directions and features of descriptive linguistics can be traced back immediately to his genius...... The whole descriptive procedure (অর্থাৎ the generation of the word form "abhavat" from the root "bhū") may be compared with the stages by which the transformational-generative grammarians, more than two thousand years later, arrive at an actual form through successive representation of elements combined with each other in accordance with ordered rules" [R. H. Robins : A Short History of Linguistics, 1967, p. 146].

সুতরাং, এই হিসাবে পাণিনি সম্পর্কে যদি আমরা কিছুটা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি, তবে সুনীতিকুমারকে নিয়েও আমাদের আত্মপ্রসাদ লাভ না করার কারণ দেখি না। কারণ, তাঁকেও আমরা বাঙলা ভাষার পাণিনি রূপে চিহ্নিত করতে পারি। পাণিনির মতই তাঁর রচনায় ভাষাতাত্ত্বিক দর্শন নয়, সমকালীন যুগের ভাষিক বিবরণই প্রাধান্য পেয়েছে। ঐতিহাসিক পটভূমিতে উপস্থাপিত হলেও সমকালীন বাঙলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর খুঁটিনাটি অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণে তিনি যে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন তা এখনও অলঙ্ঘনীয় আদর্শ হয়ে আছে। পরবর্তী কালে বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে যা নতুন কিছু

হয়েছে বা হয়েছে ব'লে মনে করা হচ্ছে, তা তাঁর আহৃত উপাদানের বা বিশ্লেষণের ভাষ্য বা টীকামাত্র।

তাছাড়া স্মরণ রাখা দরকার, সুনীতিবাবু ঐতিহাসিক এবং বর্ণনাত্মক ভাষাবিদ্যার যৌথ পরিমণ্ডলে লালিত হয়েছিলেন। তিনি যেমন একদিকে J. Bloch-এর ছাত্র ছিলেন, তেমনি বর্তমান শতকের শ্রেষ্ঠ ধ্বনিবিজ্ঞানী Daniel Jones-এরও ছাত্র ছিলেন। Phonemic Theory-র অন্যতম প্রবক্তা এই গুণীব্যক্তি Phoneme বা ধ্বনিমান সম্পর্কে যে-সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন, সেই Physical View সুনীতিবাবুও স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। Phoneme বা ধ্বনিমান সম্পর্কে সুনীতিবাবুর মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়: "A phoneme is a group of sounds which are related in character and are such that no one of them ever occurs in the same position as any other in connected speech in a particular language." তাই বাঙলার Allophone বা সহধ্বনিগুলি সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন: "n-phoneme, ~-phoneme, l-phoneme and h-phoneme include more than one sound in Bengali." বাঙলা 'ল'ধ্বনি প্রসঙ্গে তাঁর উদাহৃত আল্‌তা/উল্‌টা শব্দদ্বয় তো যে-কোন ছাত্রেরই জ্ঞাত তথ্য। সুনীতিবাবু যে Phoneme-এর Functional View সম্পর্কেও সজাগ ছিলেন, তা তাঁর বাঙলা ধ্বনিবিজ্ঞান-সম্পর্কীয় প্রবন্ধ পড়লেই জানা যাবে। বাঙলা আনুনাসিকতার বৈপরীত্যমূলক (Contrastive) আচরণও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন (যেমন, কাটা : কাঁটা)। এমনকি কোন Allophonic বা সহগ ধ্বনি যে Distinctive feature অর্জন করতে পারে, * তা তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে "আস্তে : আস্‌তে" [aste : a∞te] অথবা "আস্ত : আস্‌তো"—জাতীয় তাঁর প্রদত্ত উদাহরণ স্মর্তব্য। এ ছাড়া বাঙলা ভাষার অভিশ্রুতি বা স্বরসংগতি সম্পর্কীয় আলোচনার ক্ষেত্রে Morphophonemic পদ্ধতির সুন্দর সূত্রপাতও তো করেছেন সুনীতিবাবু। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই, কারণ এমন অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ ODBL-এর সর্বত্রই সুলভ।

এই নব্য ভাষাবিদের দ্বিতীয় অভিযোগ হলো: "......সুনীতিবাবু ভাষাতত্ত্বের এই [নতুন বিরাট] দিক পরিবর্তনের সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন কিন্তু আগ্রহের সঙ্গে এই নতুন রীতি ও চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হতে চান নি। ......বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব বা গঠনভিত্তিক ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর ধারণা অস্পষ্ট এবং অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রান্ত।...... আধুনিক ভাষাতত্ত্বের জগৎ থেকে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছিলেন। আর উনিশ শ' সাতান্ন সালে নোয়াম চম্‌স্কি-র "সিন্‌ট্যাক্‌টিক স্ট্রাকচার" গ্রন্থ যখন প্রকাশিত

---

* যেমন, বাঙলা এ/এ্যা ধ্বনির পরিবর্তন সহগ (allophonic) এবং কোথায়ও কোথায়ও phonemic বা ধ্বনিমানক, তুলনীয়: একটি : এ্যাকটা (সহধ্বনি) কিন্তু বেলা ব্যালা, দেখো : দ্যাখো (ধ্বনিমান)।

হল আর তার ফলে ভাষাতত্ত্বের জগতে আর একবার যে বিরাট বিপ্লব ঘটে গেল তার গুরুত্ব সুনীতিকুমার আদৌ অনুধাবন করতে পারেন নি।"

উপরোক্ত মন্তব্য ক'রে লেখক ঐতিহাসিক/তৌলন (Historical/Comparative), বর্ণনামূলক/সাংগঠনিক (Descriptive/Structural) এবং রূপান্তরী উৎপাদক (Transformational/Generative) পদ্ধতির আপাত-বিরোধকে জীইয়ে তুলতে চেয়েছেন, কিন্তু আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন সদ্য-প্রয়াত সুনীতিবাবুকে, যেন তিনিই একমাত্র ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রতিভূ ও শেষ সাক্ষী। তাত্ত্বিক বিতর্কে না গিয়ে শুধু এইটুকুই বলি: বর্তমানে এমন কোন ভাষাতাত্ত্বিক আছেন কি যিনি ভাষাবিদ্যার এই তিন বিষয়ভূমিকে সমান ভাবে অধিগত করেছেন? শুধু তাই বা কেন, চম্‌স্কির প্রায়-সমসাময়িক যে বিভিন্ন ভাষিক তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছে, কোন নব্য ভাষাবিজ্ঞানীও কি সেগুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার স্পর্ধা রাখেন? শুধুমাত্র বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উদ্ভাবিত Tagmemic Theory, Scale and Category Grammar এবং Stratificational Grammar আলোচনা প্রসঙ্গে একজন বর্তমান ভাষাতাত্ত্বিক কী বলেন দেখা যাক্—"I doubt whether there is any linguist alive capable of giving a detailed account of all three or four, if Generative Grammar be included—and the complex terminology involved is alone a major deterrant to any amateur linguistic investigator." (David Crystal ; Linguistics, p. 216, Penguin edition, 1971).

মনে রাখা দরকার, সুনীতিবাবু ভাষাতত্ত্বের যে পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা-কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন, তাকে হেয় করার অর্থ ভাষাতত্ত্বের এক সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা। অথচ প্রায় দুই শতক ধ'রে এই পর্যবেক্ষণ-রীতি অনুশীলিত হয়ে চলেছে, তার মূল্য এখনও এতটুকু কমে নি। কারণ, এই পদ্ধতি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং প্রযুক্তিগত উপস্থাপনার মধ্যে কখনও বিচ্ছেদ ঘটায় নি। তবে এর অর্থ এই নয় যে ভাষাতত্ত্বের নবীন প্রবণতাকে সদরের বাইরে রাখতে হবে। সুনীতিবাবুরও এই সহিষ্ণুতা ছিল। সর্ববিষয়ে যাঁর 'সজাগ মন' ও গ্রহিষ্ণু হৃদয় উৎসুক কৌতূহলী না হয়ে নিবৃত্ত হতো না, সেই তিনি যে তাঁর নিজস্ব বিষয় ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে অনীহা প্রকাশ করবেন, সে-চিন্তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনি যে ভাষাতত্ত্বের নবীন প্রবণতা সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন, তা তাঁর রচনাতেই স্বপ্রকাশ। উদ্ধৃতি দিয়েই বলি:

"...The second aim [of linguistic study] has various aspects : e.g. (a) to understand language as a phenomenon by itself—the thing as it is, the *Ding an Sich*, in its sounds, its forms, its order of words, its vocabulary and all its connected topics. This can be with reference only to a language as a static thing, its being confined at a definite time to a particular group of people in a given locality.

..... This is Descriptive Linguistics in a broad way..... Descriptive Linguistics from its application to a single language has led to the establishment of what now goes by the name of (b) Structural Linguistics......which seeks to make a *de novo* approach to the basic character of language and even to evolve some general principles embracing a variety of languages, separated from each others by both time and space, and belonging to different families of speech" (Presidential Address, First All India Conference of Linguistics, 1970).

আসল কথা, সুনীতিবাবুর অনুশীলিত পদ্ধতির সঙ্গে নবীন পদ্ধতির সাধর্ম্য না থাকায় তিনি তাতে আগ্রহী হন নি ; নানা রচনায় তিনি বিরূপ মন্তব্যও করেছেন, এমন কি এরূপ আপ্তবাক্যও উদ্ধৃত করেছেন—'নবীনমিত্যেব ন সাধু সর্বম্'। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি ভাষাতাত্ত্বিক স্মরণ মননে তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়েছেন। বস্তুত, তিনি তাঁর কৌলিক ধর্মে একনিষ্ঠ ছিলেন বলেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঐতিহাসিক ভাষাচর্চার প্রগতিশীল গবেষণায় কিছু-না-কিছু বক্তব্য রেখে গেছেন, কোন-না-কোন ভাবশিষ্য গড়ে তুলেছেন আর ভাষাবিস্তার আন্তর্জাতিক আসরে প্রথম সারিতে নিজের স্থান করে নিয়েছেন।

বাস্তবিকই বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিকদের সঙ্গে তুলনা করেও সুনীতিবাবু সম্পর্কে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি যদি তাঁদের গবেষণার স্বীয় ক্ষেত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পেরে থাকি। ঝ্যুল ব্লক্—সুনীতিকুমার—আর. এল. টার্নার, সোস্যুর—ব্লুমফিল্ড—হ্যারিস এবং চমস্কি ও চমস্কি-পন্থীদের ভাষাতাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণার পার্থক্য আকাশ-পাতাল। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে সুনীতিবাবু ছিলেন ঐতিহাসিক এবং বিবর্তনবাদী। উনিশ শতকে Rask, Grimm, Bopp এবং অন্যান্য নব্য বৈয়াকরণ (Jung-grammatiker) ভাষাতত্ত্বের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন, সেই বিদগ্ধ সমাজের উত্তরসাধক হলেন Beames, Hoernle, Grierson, Bloch, Trumpp, Geiger, Turner এবং সুনীতিবাবু প্রমুখ আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিশেষজ্ঞ। এই মতাবলম্বীদের ভাষাদর্শন ব্যাখ্যাত হয়েছে Humboldt এবং Schleicher-এর রচনায়। এঁরা অবশ্যই এককালে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন Darwin এর ক্রমবিবর্তন-তত্ত্বে। Schleicher, এমন কি Darwin-এর প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) তত্ত্বকে হেগেলীয় ঐতিহাসিক দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। মোট কথা, ভাষার প্রবহমানতা বিচার করতে হলে যে তার উত্তরাধিকার ও পরিবেশগত বিচার বর্জন করা চলে না, তা তাঁরা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন ভাষার ধ্বনিগত, ব্যাকরণগত অথবা শব্দার্থগত পরিবর্তনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ক'রে।

অপরপক্ষে Bloomfield—Harris প্রমুখ বিদ্বজ্জন ভাষাবিচারে ছিলেন প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিক। এঁরা ছিলেন প্রধানত Locke, Berkley, Hume প্রমুখ অভিজ্ঞাবাদী (Empiricist) দার্শনিকদের আবহে পুষ্ট আর বিচার-পদ্ধতি ও বিশ্লেষণে Watson, Pavlov প্রমুখ মনোদার্শনিক আচরণ-বাদীদের (Behaviourist) দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাই ভাষাকে এঁরা বিবর্তনশীল জৈব সত্তা হিসাবে বিচার করেন না, বিচার করেন একটি ভৌত ও শারীর (Physical and Physiological) বহিরাচরণের প্রতিচ্ছবিরূপে—যা বাহ্যিক পারিবেশিক সংকেত (Stimulus) এবং ভাষিক সংবেদনের (Response) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অভ্যাস বা সংস্কারে পরিণত হয়, কাজেই এঁদের কাছে ভাষা কোন স্বাশ্রয়ী (a priori) মানসিক সত্তা নয়, তা হলো মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান-প্রসূত অভিজ্ঞতা ; তা কোনো জন্মগত অধিকার নয়, তা হলো পরিবেশ-অর্জিত এক ঘটনা-পরম্পরামাত্র। সুতরাং, শব্দার্থ সেখানে কোনো পূর্বারোপিত চিত্তবৃত্তি নয়, কারণ তা যান্ত্রিক অভ্যাসে নিয়ন্ত্রিত।

কিন্তু Chomsky-পন্থী ভাষ্যে ভাষা হলো মানুষের এক সৃজনশীল বৃত্তি (Creative faculty), একটি প্রত্যয় (concept) অথবা এক স্বয়ংপ্রভ অন্তর্জ্ঞান (Intuition)—যা ভাষিক প্রকাশপদ্ধতি ও প্রতীতির (Percept) আঙ্গিকে পরিবেশিত হলেও স্বতন্ত্র ও মুক্ত। তাই এই সৃজনশীল প্রত্যয়ের যাদুদণ্ড স্পর্শে কোন বক্তা অনন্ত অজস্র বাক্য-বিন্যাস সহজেই সৃষ্টি করে চলেন। কারণ নির্বাচন, সংকল্প ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি ভাষাগত উপাদানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না। কাজেই ভাষাতাত্ত্বিকের কাজ, ভাষার সার্বজনীন (Universal) সত্তার আবিষ্কার এবং এই নির্বিশেষ তত্ত্বকে সবিশেষ কাঠামোয় যুক্তিগ্রাহ্য রূপে তুলে ধরা, অমূর্ত ধারণাকে ভাষিক উপাদান ও অবয়বে রূপান্তরিত করা। সুতরাং Structuralist-রা যেখানে ভাষার বহুমুখী বৈচিত্র্য ও তার নিরঙ্কুশ বৈপরীত্যকে প্রাধান্য দেন, Chomsky-পন্থীরা সেখানে প্রাধান্য দেন ভাষার অন্তর্নিহিত সাধর্ম্যকে। বলাবাহুল্য, এই মানদণ্ডে Chomsky-পন্থীরা হলেন প্রজ্ঞানপন্থী বা Rationalist, প্লেটো থেকে শুরু ক'রে দেকার্তে, স্পিনোজা প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকদের উত্তরসূরী।

মোটকথা ঐতিহাসিক ভাষাবিদ্ ভাষার অবয়বকে দেখে থাকেন এক জৈব সত্তা হিসাবে—যা সমাজ-দেশ-কালগত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে জন্মান্তরলাভ করছে, নিত্য নতুন আকারে বিধৃত হচ্ছে। বিবরণমূলক ব্যাকরণ-ব্যাখ্যানে ভাষা যেন এক স্থির পাঞ্চভৌতিক দেহবিগ্রহ। তাই ভাষার বহিরঙ্গ দেহ বিশ্লেষণ করতে হয় শারীরবিজ্ঞানীর মতো, অথবা নির্মাণ করতে হয় তার সুষম মূর্ত অবয়ব (Structure)। শব্দের আত্মা তার অর্থ—এমন কথা সে-বিচারে বলা চলে না। সেখানে অর্থ বিচার থাকলেও তা শব্দকে অতিক্রম ক'রে নয়, বরং তা শব্দের বহির্মুখ আচরণে প্রকাশিত হতে থাকে, শব্দার্থ সেখানে যেন ব্যবহারিক সংকেত (Signal)। কিন্তু উৎপাদক ব্যাকরণে ভাষাকে দেখা হয় এক সৃজনশীল মুক্ত সংকল্প ও মানস প্রত্যয় হিসেবে—যার নিগূঢ়

অন্তরীণ আত্মিক সম্ভাবনা (Competence) বিভিন্ন রূপাদর্শে (Performance) নিয়ত অনূদিত হয়ে চলেছে। তাই সেই অনুবাদ-কর্ম বিশুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ, পূর্ণ অথবা ভগ্ন, যে-কোন বাচকতায় (Utterance) রূপায়িত হোক না কেন—কোন মাতৃভাষীর কাছে তা অর্থ-ভাস্বর হয়ে ওঠে অতি সহজেই। সুতরাং, ব্যাকরণ-ভাবনা মানুষের পক্ষে আরোপিত অভ্যাস বা অর্জিত সংস্কারে সীমিত নয়, তা হলো স্বনির্ভর যুক্তির আত্মিক বন্ধনে বাঁধা মুক্ত ধারণা।

ভাষাদর্শনের এই পার্থক্যের ফলে ভাষাবিশ্লেষণ রীতিরও পার্থক্য ঘটেছে যথারীতি। বিবর্তনপন্থী ভাষাবিদ্‌রা সম্পর্কিত ভাষার লেখ্য অথবা কথ্য উপাদানের তুলনামূলক পদ্ধতির (Comparative method) ওপর জোর দেন বেশি। কারণ তুলনামূলক সাধর্ম্যের ভিত্তিতেই কোন ভাষার প্রাচীন অবয়ব নির্মাণ করা যেতে পারে, তার বিবর্তন-রেখা চিহ্নিত হতে পারে। দেহবাদী বিবরণমূলক বৈয়াকরণরা কেবল কথ্য ভাষার উপাদানকে আশ্রয় করেই কোন বিশেষ সময়ের ভাষার অবয়ব গঠন করে থাকেন অথবা অপ্রচলিত বা প্রচলিত কোন ভাষার সাংগঠনিক বিধান নির্দেশ করে থাকেন। ভাষার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ এখানে করা হয়ে থাকে উপাদানের বৈপরীত্য (Contrast) বিচার ক'রে। আর চমস্কীয় পদ্ধতিতে ভাষিক প্রত্যয় গ্রথিত করা হয়ে থাকে প্রকাশধর্ম ও অর্থগত বৈচিত্র্যের সমন্বয় (Synthesis) ঘটিয়ে।

এছাড়া পরিভাষা ও সংজ্ঞারও পার্থক্য রয়েছে। প্রথম গোষ্ঠী চিরাচরিত (Traditional) ব্যাকরণ পদ্ধতির উপাদান ও উপকরণ অবলম্বন করেই ভাষার কাঠামো ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয় গোষ্ঠী ব্যাকরণ বিশ্লেষণের নতুন উপকরণ সৃষ্টি করে নিয়েছেন (Phoneme-Morpheme সংজ্ঞা স্মর্তব্য)। আর চমস্কি পুরোনো উপকরণ ও সংজ্ঞার বহুলাংশ অঙ্গীকার করে নিয়েও ব্যাখ্যার নতুন রীতি গড়ে তুলেছেন।

অবশ্য ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে ভাষার অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণে ফাঁক থেকে যায় (যদিও সুনীতিবাবু এই ব্যাপারে আশ্চর্যজনক ভাবে প্রায় ত্রুটিমুক্ত)। বিবরণমূলক বা সাংগঠনিক ব্যাকরণে ধ্বনিমান (Phoneme) বা রূপমান (Morpheme)-ভিত্তিক আলোচনা যথেষ্ট বিস্তৃত হলেও পদবিন্যাস (Syntax) বিশ্লেষণ-রীতি প্রমাদমুক্ত নয়। এই প্রসঙ্গে Immediate Constituent Analysis-এর সীমাবদ্ধতা স্মরণীয়। চমস্কি অবশ্য এই অপূর্ণতা অনেকাংশে দূর করলেন তাঁর Syntactic Structure গ্রন্থে (১৯৫৭), কিন্তু এর অসম্পূর্ণতা তাঁকে ক্রমশ শব্দার্থতত্ত্বে উত্তরিত করলো (Aspects of Theory of Syntax, ১৯৬৫)। ভাষাতত্ত্বে নতুন প্রবণতার যে-সূত্রপাত ঘটেছিল ভাষাবস্তুর Minimal বা ক্ষুদ্রতম একক Phoneme-কে আশ্রয় ক'রে, তার Maximal বা বৃহত্তম একক দাঁড়ালো বাক্য, এমনকি ভাষার সংগঠন-বহির্ভূত (Non-Structural) দেহাতিরিক্ত শব্দার্থতত্ত্ব। তাই চমস্কীয় তত্ত্বে বর্তমানে Phoneme সম্পর্কীয় ধারণাই প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছে—যদিও ভাববাদী

চমস্কির ব্যাখ্যা ভাষাবিশ্লেষণের চরম ব্যাখ্যা কি না, এ নিয়েও যথেষ্ট সংশয় বর্তমানে দেখা দিয়েছে।

উপরোক্ত সরলীকৃত বিবরণ থেকে সুনীতিবাবুর ভাষিক ধ্যানধারণার একটি সুস্পষ্ট পটভূমি আবিষ্কার করা গেল; এই সঙ্গে আরও দেখা গেল, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব-চর্চার সমান্তরাল গতিপ্রকৃতি। শ্রদ্ধেয় সুনীতিবাবু এমন একটি বিদগ্ধ গোষ্ঠীর প্রতিনিধি-স্থানীয়। কিন্তু তথাপি স্মরণ রাখা দরকার, সুনীতিবাবু সোস্যুর বা চমস্কির মতো কোন তাত্ত্বিক ছিলেন না, বরং বলা ভালো, তিনি ছিলেন ভাষাবিদ্যার একটি বিশেষ তত্ত্বের সার্থক প্রযুক্তিবিদ্, একনিষ্ঠ রূপকার; বর্ণনামূলক ব্যাকরণের ক্ষেত্রে হ্যারিস্-এর যে-স্থান এক্ষেত্রে সুনীতিবাবুরও তাই।

আরও একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হওয়া দরকার। সুনীতিবাবুর কাছে ভাষাতত্ত্ব মানবিকী বিদ্যা, তা ব্লুমফিল্ড্-পন্থীদের মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বশাসিত ('Autonomous) ভাষাবিজ্ঞান নয়। তাই তিনি ছিলেন Philologist, নিরঙ্কুশ Linguist নন। ফলে ভাষা ও ভাষাসম্পর্কিত বিচিত্র বিদ্যা, যেমন, শিল্প, ইতিহাস, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি, শিল্পকলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় ছিল তাঁর উপজীব্য। এমনকি তিনি সংস্কৃত কবিতাও রচনা করতেন। এই ব্যাপারে তিনি ছিলেন Humboldt, Sapir, Boas প্রভৃতি সুধীজনের মতাবলম্বী।

অবশ্য এই সৃজনশীল প্রকাশধর্মের পিছনে এক বিজ্ঞান-চেতনা সর্বদাই সক্রিয় ছিল —যা বৈচিত্র্যের সৃষ্টিলীলায় অংশগ্রহণ করেও উৎসুক জিজ্ঞাসু ও কৌতূহলী এক মননশীল দ্রষ্টারূপে তার ব্যাখ্যা করতে চাইতো। এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীতধর্মী উপমা মেলে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত কবি, তাই তিনি অন্তর্মুখী বোধি ও উপলব্ধি দিয়ে সৃষ্টির গভীরে পৌছতে চেয়েছিলেন, আর সুনীতিবাবু সৃষ্টির এই বিচিত্র রহস্য ও ব্যাপ্তি উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছিলেন বুদ্ধির বিজ্ঞানময় যাদুদণ্ড স্পর্শে। তাই ব্যক্তিগত জীবনে অনেকসময়ে তাঁকে অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic) বলে মনে হয়েছে।

মোটকথা, সৃষ্টিরহস্যের তীর্থযাত্রায় এই দুই বিশ্বপথিক বুদ্ধি ও বোধির দুই ভিন্ন পথে একই স্থানে পৌছতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিবাবুর আত্মিক নৈকট্যের কারণও বুঝি তাই। কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মতই আমরা একজন বিশ্বপথিক Philologist পেলাম আমাদেরই পরিচিত গৃহাঙ্গনে, যিনি কাব্যে সাহিত্যে সংগীতে বা বিজ্ঞানে নয়, ভাষাবিদ্যার দুর্গম পথ ধ'রে বিশ্বমানবিকতার সমুচ্চ শিখরে পৌঁছতে পেরেছেন। ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে এমন পরম ইষ্টদর্শন ও পরিপূর্ণ সিদ্ধি খুব অল্প জনেরই ঘটেছে।

সুনীতিবাবুর মতো এমন একজন মনীষী, যিনি বিশ্বদেবতার সন্ধানে সারা বিশ্বের পথে পথে ঘুরেছেন, বিশ্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন তাঁর নিজস্ব পথে, তাঁর কাছ থেকে ভাষাতত্ত্বসম্পর্কীয় রচনার খতিয়ান ও ওজনদর চাইতে যাওয়া

হাস্যকর মনে হয়। অথচ তাই দাবী করেছেন বর্তমান নব্য ভাষাবিজ্ঞানী এই ব'লে: "উনিশ শ ছাব্বিশের পর ভাষাতত্ত্বে তাঁর কোন উল্লেখযোগ্য দান নেই।" তবু জেনে রাখা ভালো, ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব-চর্চার ক্ষেত্রে উনিশ শ' ছাব্বিশের পরও তিনি সৃষ্টিক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন নি। তাই Turner-এর মতো বিশ্ববিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ তাঁর "Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Language" (১৯৬৬) নামক গ্রন্থে সুনীতিবাবুর মৌখিক উপদেশ ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে স্বীকার করেছেন। তাই সম্প্রতি জাপানে অনুষ্ঠিত ভাষাতত্ত্বের আন্তর্জাতিক আসরে তাঁর ইংরাজী প্রবন্ধ "What the so-called 'Linguistic-Phonetics' should be" জাপানী ভাষায় অনূদিত হয়েছে (The Third World Congress of Phoneticians, Tokyo, 1976)। ১৯২৬-এর পরেই তিনি সাম্প্রতিকতম ইন্দো-হিট্টি মতবাদের ওপর প্রবন্ধ লেখেন (Pre-Indo-European, 1942)। এছাড়া কেবল ভাষাতত্ত্বের ওপর লেখা আরও কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে কালানুক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন—

১. Recursives in New Indo-Aryan (1931)।
২. Polyglottism in Indo-Aryan (1933)।
৩. The Pronunciation of Sanskrit (1934)।
৪. ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৩৯)।
৫. মৈথিলীর প্রাচীনতম গ্রন্থ "বর্ণরত্নাকর"-এর ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (১৯৪০)।
৬. Indo-Aryan and Hindi (1942)।
৭. অবধী বা কোশলীর প্রাচীনতম গ্রন্থ "উক্তিব্যক্তিপ্রকরণ"-এর ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (১৯৫৩)।
৮. Sanskrit and Russian (1955)।
৯. Glottal Spirants and Glottal stops in the Aspirates in NIA (1961)।
১০. Languages and Literatures of Modern India (1963), ইটালীয় সংস্করণ ১৯৫৬।
১১. The Correspondence between Sound and Phoneme in the light of modern linguistic Theories (1966) ইত্যাদি।

স্মরণীয়, উপরোক্ত সমস্ত রচনাগুলিই হলো ১৯২৬-এর পরবর্তী ভাষাতাত্ত্বিক সংযোজন। অন্যান্য বহুমুখী রচনার তালিকা পেশ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে। অবশ্য নব্য সমালোচকের মতে, সুনীতিবাবুর এই বহুমুখীনতা তাঁর অধঃপতনের কারণ। তাই তিনি বলেন: "সুনীতিকুমারের শক্তি এবং প্রতিভা সত্ত্বেও এই ব্যর্থতার অনেক কারণের প্রধান কারণ বোধহয় এই যে তিনি শুধু ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন না, তিনি তাঁর প্রতিভাকে নানা পথে চালিত করেছিলেন।"

এই অভিযোগের কোন উত্তর আমাদের জানা নেই, তবে আমাদের জানা আছে : বহুমুখীনতা প্রকৃত প্রতিভার অপচয় নয়, তা অর্জিত সম্পদ। ভাষাতাত্ত্বিকদের কথাই ধরা যাক। Franz Boas এবং Edward Sapir কেবল ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন না, নৃতত্ত্ববিশারদও (Anthropologist) ছিলেন। এছাড়া ভাষাতত্ত্ববিষয়ক মাত্র একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক (Language, 1921) লিখলেও Sapir সাহিত্য সংগীত ও শিল্পকলাবিষয়ক বহু প্রবন্ধ লিখে গেছেন। Grimm-ভ্রাতৃদ্বয়ের ভাষাতত্ত্ববিদ্ ছাড়া অন্য পরিচয়ও যে ছিল, তা সকলের জানা আছে। এমনকি চমস্কি নিজেও ভাষাবিজ্ঞান ছাড়া অঙ্ক ও দর্শনেও পারঙ্গম। তাছাড়া রাজনৈতিক প্রবক্তা এবং ভিয়েৎনাম সম্পর্কে মার্কিন সরকারের কঠোর সমালোচক হিসেবে তাঁর খ্যাতি সারা পশ্চিম দুনিয়ায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর গ্রন্থ American Power and the New Mandarins (1969) স্মরণ রাখার যোগ্য। কাজেই এমন প্রতিভাধর মনীষীদের প্রতি কি এমন সাবধান-বাণী উচ্চারণ করা যায় : "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ।"

নব্য ভাষাতত্ত্ববিদের শেষ অভিযোগ : "তিনি (সুনীতিবাবু) একটি সম্পূর্ণ যুক্তি-নির্ভর সার্থক বাংলা ব্যাকরণ লিখবেন সেখানেও তিনি আমাদের আশা পূর্ণ করেন নি।"—এমন অভিযোগেরও জবাব দেওয়ার প্রয়োজন আছে মনে করি না। কারণ, উক্ত সমালোচক লক্ষ্য করেছেন, বিশ শতকের বাঘা বাঘা ভাষাতাত্ত্বিক ভাষাতত্ত্বের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন ব'লে সুনীতিবাবু নিষ্প্রভ হয়ে গেছেন, তাঁর প্রতিভা অপাংক্তেয় ও অবদান অকিঞ্চিৎকর ব'লে প্রতিভাত হচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্য করছি, বর্তমান বাঙলা ভাষাবিস্তার ক্ষেত্রে এমন একজনও আবির্ভূত হন নি, যিনি একখানা "যুক্তিনির্ভর সার্থক" বাঙলা ব্যাকরণ লিখে বাঙালী জাতিকে কৃতার্থ করেছেন। কাজেই ততদিন, তাঁদের আবির্ভাবের আগেই আমরা "ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ" নামক সামান্য গ্রন্থখানি নিয়েই অসামান্য হাঁকডাক ও হৈ-চৈ করতে থাকি না কেন! এমন কিঞ্চিৎ "আত্মপ্রসাদ" থেকে এই নব্য ভাষাবিদ্রা আমাদের বঞ্চিত করতে নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন না!

বিশ্বমানব সুনীতিকুমার

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

মধ্যযুগের আঁধার পেরিয়ে রেনেশাঁস বা নবজাগরণের আলো প্রথম দেখা দিল ইতালিতে। মধ্যযুগে মানবিক চেতনা ঢাকা ছিল যে আবরণে, তা মায়া-সংস্কার-মোহ আর ছেলেমানুষি ধারণায় বোনা। মানুষ নিজেকে জানত কোনো বিশেষ গোত্র, গোষ্ঠী, জাতি, রাষ্ট্র, সম্প্রদায় দল বা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একজন বলে। এই মোহাবরণ প্রথম ঘুচল ইতালিতে খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকে। ব্যক্তির অভ্যুদয় হল, মানুষ নিজেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় দেখতে শিখল, আপন রাষ্ট্র, গোষ্ঠী, দল, পরিবারের গণ্ডীর বাইরে তাকিয়ে দেখল, আপন নগর বা রাষ্ট্রের বাইরে যে দুনিয়া তার প্রতি উৎসুক দৃষ্টিতে দেখল, তখন ইতালির নাগরিকদের নবজন্ম হল। সম্পূর্ণ মানুষ (কমপ্লিট ম্যান), বিচিত্রমুখী মানুষ (কসমোপলিটান) সর্বতোমুখী মানুষ (অল সাইডেড ম্যান), মানবিকতাবাদী (হিউম্যানিস্ট) দেখা দিল। সেদিন রাজনৈতিক দলাদলি ও পীড়নের ফলে অনেক লোক শহর-ছাড়া হয়ে চলে যেত অন্যত্র। এইসব রাজনৈতিক কারণে উৎখাত হয়ে যাওয়া মানুষরা নির্বাসনে গড়ে তুলত এক নোতুন জীবন—তাদের সদগুণের প্রভাব পড়ত নোতুন শহরগুলিতে। ফেরারা শহরে ফ্লোরেন্সীয় বাস্তহারা এবং ভেনিসে লুচেসীয় বাস্তহারার দল গড়ে তুলেছিল বড় বড় কলোনী। এর ফলে ভেঙে যেতে লাগল সংকীর্ণ গোষ্ঠীতন্ত্র, আলগা হয়ে গেল গোত্র-বেড়াগুলি, অর্গলমুক্ত হল সাম্প্রদায়িক নিষেধের দুয়ারগুলি। দেখা দিল বিচিত্রধর্মী বিচিত্রমুখী মানুষ। নবজাগরণের মুক্তির উল্লাস ভাষা পেয়েছিল ফ্লোরেন্স থেকে বিতাড়িত দান্তের জীবনে ও সাহিত্যকর্মে।

মানুষের এই মুক্তির কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন যাকব বুর্খার্ট :

The cosmopolitanism which grew up in the most gifted circles is in itself a high stage of individualism. Dante finds a new home in the language and culture of Italy, but goes beyond even this in the words, 'My country is the whole world'. And when recall to Florence was offered him on unworthy conditions, he wrote back : 'Can I not everywhere behold the light of the sun and the stars ; everywhere meditate on the noblest truths, without appearing ingloriously and shamefully before the city and the people ? Even my bread will not fail me'. The artists exult no less definitely in

their freedom from the constraints of fixed residence. 'Only he who has learned everything', says Ghiberti, 'is nowhere a stranger ; robbed of his fortune and without friends, he is yet the citizen of every country, and can fearlessly despise the changes of fortune'. In the same strain an exiled humanist writes, 'Wherever a learned man fixes his seat, there is home.'[১]

খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকের ইতালিতে ধীরে ধীরে এই ধরনের গোটা মানুষের (কমপ্লিট ম্যান) সংখ্যা বাড়তে থাকে। কেবল আলিঘেরী দান্তে নয়, লোরেঞ্জো ইল্ ম্যাগনিফিকো, আরিওস্টো, পিওভান্নি পোনটানো, ঘিবার্টি, লি'ও বাতিস্তা অলবের্তি প্রমুখ 'গোটা মানুষ' সেদিনকার ইতালিতে দেখা গেল। এই 'গোটা মানুষ' থেকেই এলো সর্বতোমুখী মানুষ—বিশ্ব মানব (l'uomo universale)। মধ্যযুগের য়োরোপে—দ্বাদশ ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে—পণ্ডিত মানুষের অভাব ছিল না, কিন্তু তাদের পাণ্ডিত্য ছিল সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ। কিন্তু পঞ্চদশ শতকের ইতালিতে দেখা দিলেন বিশ্ব মানব—সর্বতোমুখী বিশ্বকৌতূহলী মানুষ—যাঁরা জ্ঞানের সব ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করলেন, জীবনের সর্ববিষয়ে কৌতূহল দেখালেন। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, রাজনীতি, সমাজবিদ্যা, দর্শনবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, রণশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, সংগীত, সাহিত্য, চিকিৎসাবিদ্যা, নৌবিদ্যা খেলাধুলা—সব কিছুতেই তাঁদের সমান আগ্রহ। এই ধরণের বিশ্ব-মানবের প্রথম উদাহরণ দান্তে। তাঁর 'দিভিনা কম্মেদিয়া' মহাকাব্যে জাগতিক সর্ব বিষয়ের আলোচনা আছে; জীবনের সব ক্ষেত্রে তাঁর অনায়াস পরিক্রমা এবং সেদিন এই মহাকাব্যোক্ত প্রৌঢ়োক্তি বহুমানিত হয়েছিল।

পঞ্চদশ শতকের ইতালিতে দেখা দিয়েছিলেন সর্বতোমুখী মানবিকতাবাদী। ফ্লোরেন্স নগরীর বণিক আর রাজনীতিবিদ্, যুদ্ধব্যবসায়ী আর শাস্ত্রচর্চাকারী কেবল নিজ নিজ বৃত্তির চর্চায় নিরত থাকতেন না, সেই সঙ্গে জাগতিক অন্যান্য বিদ্যারও চর্চা করতেন। আরিস্ততলের নীতিশাস্ত্র ও রাজনীতিশাস্ত্র যেমন পড়তেন, গীত-বাদ্যের চর্চাও তেমন করতেন ; ইতিহাস-ভূগোল-নৌবিদ্যা যেমন পড়তেন, চিত্রকলা-স্থাপত্য-ভাস্কর্যও তেমন জানতেন।

সেদিনকার মানবিকতাবাদীর বিবরণ দিতে গিয়ে বুর্খার্ট লিখেছেন :

The humanist, on his side, was compelled to the most varied attainments, since his philological learning was not limited, as it is now, to the theoretical knowledge of classical antiquity, but had to serve the practical needs of daily life. While studying Pliny, he made collections of natural history ; the geography of the ancients was his guide in treating modern geography, their history was his pattern in

writing contemporary chronicles, even when composed in Italian; he not only translated the comedies of Plautus, but acted as manager when they were put on the stage; every effective form of ancient literature down to the dialogues of Lucian he did his best to imitate; and besides all this, he acted as magistrate, secretary and diplomatist —not always to his own advantage.[২]

বুর্খার্ট এই ধরনের সর্বতোমুখী হিউম্যানিস্টদের মধ্যে দুয়েকজনকে সকলের উপরে মাথা উঁচু করে চলতে দেখেছেন। একটি উদাহরণ তিনি দিয়েছেন। তাঁর নাম লিঁও বাত্তিস্তা অলবের্তি (Leon Battista Alberti, 1404—1472)। বুর্খার্টের পূর্বোক্ত গ্রন্থে অলবের্তির বহুমুখী জীবনের বিচিত্র প্রতিভার বিবরণ পাই। আমাদের পরিচিত দেশ-কাল থেকে এমনি এক বহুমুখীজীবন মানবিকতাবাদীর পরিচয় দিতে পারি। তাঁর নাম সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০—১৯৭৭)। বুর্খার্ট বাত্তিস্তার পরিচয় দিতে যে বিবরণী উপস্থিত করেছেন তা ঈষৎ অদল-বদল করে দেশকালের নব পটভূমিতে আচার্য সুনীতিকুমারের জীবন-বিবরণী বলে উপস্থিত করা যায়।

॥ দুই ॥

আচার্য সুনীতিকুমার জীবনের সাতাশিটি বছর পুরোপুরি উপভোগ করেছেন। তিনি সদর্থে বিশ্ব-মানব l'uomo universale. ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের মার্চের ২৮ তারিখে তাঁকে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্মান সূচক ডক্টরেট অব্ লেটারস পদবীতে ভূষিত করা হয়। সেদিন এই সম্মান গ্রহণ করে তিনি রোমে যে ধন্যবাদমূলক ভাষণ দিয়েছিলেন (সংস্কৃত, গ্রীক ও লাতিন ভাষায়) তা ইংরেজি ও ইতালিয়ান অনুবাদ-সমেত মোট পাঁচ ভাষায় মুদ্রিত হয়েছিল। সেই বিরলদর্শন পুস্তিকা থেকে কয়েকটি ছত্র (ইংরেজি অনুবাদে) উদ্ধার করছি। তা থেকে মানবিকতাবাদী আচার্য সুনীতিকুমারের আত্ম-পরিচয় ও জগৎ-সম্পর্কিত ধারণার পরিচয় পাওয়া যাবে। এত সংক্ষেপে এবং এত নিপুণভাবে আর কোথাও বিশ্ব-মানব সুনীতি-কুমারের পরিচয় লভ্য নয় বলে আমার বিশ্বাস।

Om; Salutation to the Supreme Spirit,/Whose Form is Being, Knowledge and Bliss,/……First, indeed, God our Father,/the Unknown Source of Everything,/holding and moving all that is,/ Who is also Mind (*cit*),/and the Supreme Bliss (*Ānanda*),/I invoke./ Next, the Great Mother,/bearing the two Forms of/Matter (*Prakṛti*) and Energy (*Śakti*),/Who is, through Justice and through Love,/the Saviouress of all creatures that die,/I adore.

এই দেব-বন্দনার পর আত্ম-পরিচয় দান :

Hail, wise Senators, and dear Colleagues/of the University of the Mother-city of Rome : /From India I have come,/I, Lover of Speech and Culture,/the Brahman Suniti of the Kāśyapa Clan,/Professor of Linguistics,/and Head of the House of Elders/in the Parliament of West Bengal,/whom you have called for being honoured.

The friendship and the respect of India/I bring for you ;/and I carry our good wishes for you,/for the Happiness of the People of Italy/and for the Advancement of Knowledge.

তারপর তাঁকে সম্মান-প্রদর্শনের জন্য কৃতজ্ঞতা-নিবেদন করেছেন সংস্কৃতে : 'মহতীম্ এতাম্ সংবর্ধনাম্ শিরো-ভূষণম্ কৃত্বাহম্ আত্মানম্ কৃতার্থম্ মন্যে।'

তারপর নিজস্ব দর্শন-চিন্তা জগৎ-ভাবনা ব্যক্ত করেছেন : "একম্ সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তী' ইতি ভারতীয়া শ্রুতি।"

The Revelation is India says ; 'That Which Is, Is One ; Wise Men speak of It in many ways'

Endless indeed are the Expressions of this One. And at the present age and in the present world, two of these Expressions are note-worthy.

One of these two came into being in the Eastern Lands, the other is of the Lands of the West : so people think. Embracing the two kinds of Mundane Sciences, the Physical ones and the human ones, are these two Expressions, which are established in the Thought and the Behaviour of all men, irrespective of the East and the West.

But there exists no Opposition between these two, A Harmony of the physical and the Human Sciences, which are found both in the East and the West, can be seen in the Supreme Wisdom which is in the Knowledge of the Spirit.

In reality, these two Expressions of the East and the West are but two faces of the One Divine Order, or Truth, or Law.

এরপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতে সত্যের পরিচয়-আবিষ্কারক ঋষি, মনীষী, কবি ও দার্শনিকদের নামোল্লেখ করেছেন। ব্যাস, কৃষ্ণ, যাজ্ঞবল্ক্য, মহাবীর, বুদ্ধ (ভারত), জরথুস্ত্র (ইরাণ), লাও-ৎসু, কুঙ-ফুৎসু (চীন), ইশা, যীশু (জুডা), হোমর, সোক্রাতেস, প্লাতো, আরিস্ততল (গ্রীস) প্রমুখ কবিমনীষী সত্যের মুখ দেখেছেন, একথা তাঁর

ভাষণে বলেছেন। প্রাচীন ও নবীন ভারতে ও য়োরোপে যত চিন্তাবীর সমাজবিদ রাষ্ট্রনেতা জগতে সুবিচার, ভাব-সংযম, বিশ্ব-মৈত্রী, জ্ঞান-সংহতি ও জাতি-গত ঐক্য সংস্থাপনের প্রয়াস করেছেন তাঁদের নামোল্লেখ করে বলেছেন—'অধুনা প্রাচ্য-প্রতীচ্যয়ো তথা চ সমগ্রস্ত বিশ্বস্ত সম-অধ্যাস সর্বেষাম্ অভীপ্সিতঃ।'

জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের একত্ব ও সহৃদয়-ভাব আজ সকলেই মেনে নিয়েছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বহু মনীষী এই সাধনায় রত।

From this, we have the new Concept which is but a re-affirmation of a very old Realisation, namely,/Truth is not in sole possession of any one ;/In this World, standing firm in their own individual dignity, it is possible for all men to attain to the intuitive Perception and Realisation of the Supreme Truth ;/there is no partiality of the Creator for any particular land or people ; as it has been said in the Gitā, in the Mahābhārata, as the Word of God :

'সমোহং সর্বভূতেষু, ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়' 'I am the Same for all beings ; there is no one who is hateful to Me, none specially beloved.'

This, too, is our Resolve as Seekers after Truth, of ourselves the people of Italy and of India, of the West and the East.

বিশ্বমানব সুনীতিকুমারকে আমরা এই প্রতি-ভাষণে চিনে নিতে পারি।

॥ তিন ॥

বিশ্বমৈত্রী ও মানব-ঐক্যবোধের দ্বারা প্রাণিত সুনীতিকুমার তাঁর মানবিকতা-বাদের পরিচয় দিয়েছেন জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সর্বগ কৌতূহল ও আগ্রহে।

আচার্য সুনীতিকুমার মানব সভ্যতাকে এক সামগ্রিক ঐক্যবদ্ধ রূপে দেখেছেন, বিশ্বমানবিকতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল গভীর ও আন্তরিক। আর সে-কারণেই সবরকম জন, জনপদ ও জনকৃতিতে, উচ্চকোটীর সংস্কৃতি ও লোক-সংস্কৃতিতে, ধর্মাচারে ও ধর্মবিশ্বাসে—সর্বপ্রকার মানবিক ক্রিয়াকর্মে তাঁর আগ্রহ ছিল ব্যাপক ও দূর-প্রসারিত। এই উদার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবন-সম্পর্কিত-কৌতূহলের উৎস, তাঁর বিশ্বাসমত, প্রাচীন ভারতীয় বেদান্তে, যা চীনা তাওবাদ, গুহ্য হিব্রু ধর্মমত, ইসলামের সুফীবাদ, প্রাচীন গ্রীক মানবিকতাবাদ ও আধুনিক য়োরোপীয় মানবিকতাবাদের সঙ্গে যুক্ত। সেইকারণে আচার্য সুনীতিকুমারের কোনো বিদ্যাচর্চা স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন ছিল না। তাঁর ভাষাচর্চার সঙ্গে নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল লোকসংস্কৃতি ও নৃতত্ত্বের। 'দি অরিজিন অ্যান্ড ডেভলপমেণ্ট অব দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' (১৯২৬) এবং 'ইন্দো-আরীয়ান অ্যান্ড হিন্দী' (১৯৪২) নামক গ্রন্থদুটিতে তিনি ভারতে আর্যভাষার ক্রমবিকাশের সম্পূর্ণ ইতিহাস

লিপিবদ্ধ করেছেন। ভাষা সম্পর্কিত উচ্চকোটীর গবেষণাত্মক নিবন্ধে তিনি যে স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তা আমাদের অবাক করে। ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের তলায় তলায় প্রবাহিত প্রাগার্য ধারার প্রতি তিনি জোর দিয়েছেন। 'দি স্টাডি অব কোল' (১৯২৩) আর 'দ্রাবিড়িয়ান অরিজিন্স অ্যান্ড দি বিগিনিংস অব ইণ্ডিয়ান সিভিলিজেশ্যনস্' (১৯২৪) পুস্তিকাদুটিতে যে প্রাগার্য উপাদান-সচেতনতা, তা পূর্ণতা পায় 'কিরাত-জন-কৃতি—দি ইন্দো-মঙ্গোলয়েডস: দেয়ার কনট্রিবিউশন টু দি হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অভ ইন্ডিয়া' (১৯৫১) গ্রন্থে। নেপালের নেওয়ার, উত্তর ও পূর্ববঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের বোড়ো, মণিপুরের মেইতেই প্রমুখ জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর আলোচনা উদার মানবিকতার পরিচয়বাহী। 'দ্রাবিড়িয়ান' (১৯৬৪) সুনীতিকুমারের সর্বভারতীয় চেতনার পরিচয়স্থল। ভাষাতত্ত্বের—ধ্বনি ও রূপতত্ত্বের চর্চা তাঁর কাছে অপরাপর বিদ্যা-শাস্ত্র-বিচ্ছিন্ন কোনো গজদন্তমিনারস্থিত শৌখিন বিদ্যাচর্চা ছিল না।

আচার্য সুনীতিকুমার ভারতীয় সাহিত্যচর্চাকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। প্রধান ভারতীয় সাহিত্যগুলির আলোচনা করে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, এগুলির মধ্যে মূলগত ঐক্য আছে। এই ঐক্যবন্ধনের সূত্র হলো তিনটি বিষয় বা ম্যাটার—প্রাচীন ভারতের ম্যাটার (সংস্কৃত সাহিত্যের জগৎ), মধ্যযুগের প্রদেশ, অঞ্চল বা ভাষাক্ষেত্রের ম্যাটার, এবং ইসলামের ম্যাটার (আরব ও পারস্যাগত)। এই তিনে মিলে ভারতীয় সাহিত্যের মৌল কাঠামো গড়ে তুলেছে।

বিশ্বমানব সুনীতিকুমার সমগ্র পৃথিবীকে স্বদেশ বলে মনে করেন, সে-কারণেই বিভিন্ন মহাদেশের সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য শিল্পকৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ। কয়েকটি পুস্তক-পুস্তিকা-ভাষণের নামোল্লেখে এর পরিচয় পাই—

১. আফ্রিকানিজম: দি আফ্রিকান পার্সন্যালিটি (১৯৬০)
২. ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড চায়না—অ্যানসিয়েণ্ট কনট্যাক্টস (১৯৬১)
৩. স্লোভো ও পুলকু ইগোরেভ [প্রাচীন রুষ এপিক] (১৯৬০)
৪. আর্মেনিয়ান হীরো-লীজেণ্ডস্ অ্যানড দি এপিক অব ডেভিড অব সুসান (১৯৬১)
৫. ইরানিয়ানিজম: ইরানিয়ান্ কালচার অ্যানড ইম্প্যাক্ট আপন্ দি ওআর্ল্ড ফ্রম দি অকামেনিয়ান টাইমস্ (১৯৬৬)
৬. ভেফ্খিস-ৎকুওসনি: দি ম্যান ইন দি টাইগার-স্কিন্ [প্রাচীন জর্জীয় কাব্য] (১৯৬৬)
৭. হিন্দুস অ্যাণ্ড টার্কস ফ্রম প্রী-হিস্টরিক টাইমস—ইণ্ডিয়া-সেণ্ট্রাল এশিয়া কনট্যাক্টস অ্যানড লিংকস (১৯৬১)
৮. ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ইথিওপিয়া: ফ্রম দি সেভেন্থ সেঞ্চুরী বি. সি. (১৯৬৯)
৯. বাল্টস অ্যাণ্ড এরিয়ানস, ইন দেয়ার ইন্দো-ইয়োরোপীয়ান ব্যাকগ্রাউণ্ড (১৯৬৮)

১০. অল্-বিরুণী অ্যাণ্ড স্যাংসক্রিট (১৯৫১)
১১. দি ওআর্ল্ড অ্যাবাউট ইগর'স ফোক (১৯৬০)
১২. এ ব্রাহ্মনিক্যাল ভীটি ইন ইন্দো-চায়না অ্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়া (১৯৬০)
১৩. জানিস রেইনীস [লাটভিয়া] (১৯৬৫)
১৪. বেদ-সংহিতা-বাল্টিকা (১৯৬৮)
১৫. স্যাংসক্রীট গোবিন্দ : ওল্ড আইরীশ বোআণ্ড (১৯৭০)
১৬. দি কালচার অ্যাণ্ড রিলিজন অব দি য়োরুবাস অব ওয়েস্ট আফ্রিকা (১৯৪৫)
১৭. ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড পলিনেসিয়া : অস্ট্রিক বেসেস অব ইণ্ডিয়ান সিভিলিজেশন অ্যাণ্ড থট (১৯৪৫)

আচার্য সুনীতিকুমারের বিশ্বমনস্কতা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি একটি বিরল-দৃষ্ট ভাষণে বলেছেন, ভারতীয় মানসিকতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি হ'ল—বিভিন্ন সংস্কৃতি ও মানসিকতার মধ্যে সমন্বয়-সাধন এবং নিজ নিজ সুন্দর উপাসনা-পদ্ধতি-বিশিষ্ট বিভিন্ন-ধর্মের বিকাশ-সাধন।[৪] আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তরালে ক্রিয়াশীল প্রধান আদর্শ নির্দেশ করতে গিয়ে এই ভাষণে তিনি বলেছেন, ভগবদ্গীতার দুটি শব্দে এই আদর্শকে উপস্থিত করা যায়—'যোগ' আর 'ক্ষেম'। তাঁর কথায়, 'যোগ' শব্দের অর্থ 'সংযোজন'—আমাদের জীবনে সংস্কৃতিতে যা নেই অথচ যা চাই এমন মূল্যবিশিষ্ট বস্তু বা বিষয়ের সংযোজন। আর 'ক্ষেম' শব্দের অর্থ—বিশ্রাম, নিরাপত্তা বা সংরক্ষণ—আমাদের জীবনে ও সংস্কৃতিতে স্থায়ী মূল্যবিশিষ্ট বস্তু বা বিষয়ের সংরক্ষণ, যার তাৎপর্য ও গুরুত্ব কেবল আমাদের জীবনেই নয়, বহির্বিশ্বেও যা শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত। এদেশে পর্তুগীজ, ফরাসি ও ইংরেজ ভাষা ও শাসন মারফৎ ভাবজগতের যে-সব নোতুন আদর্শ ও ইহজগতের যে-সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের কাছে এসেছে, তারও সংরক্ষণ প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। বিশেষত ইংরেজি ভাষা মারফৎ যে উদারনৈতিক মনোভাব ('লিবার‍্যাল স্পিরিট') আমাদের দিয়েছে যে মনন ও অধ্যাত্ম সম্পদ, তা আমাদের জীবনে পূর্বে ছিল না। তারও সংরক্ষণ প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য ও চিন্তা নোতুন ধরনের মনন-ক্ষুধা ('ইনটেলেকচুয়ল হাঙ্গার') আমাদের মনে জাগ্রত হয়েছে, তার তৃপ্তি সাধন হতে পারে কেবল য়োরোপীয় জীবন ও সংস্কৃতির চর্চায়, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও মনের শ্রেষ্ঠ সম্পদের চর্চায়। এরও সংরক্ষণ ('যোগ') সবিশেষ প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।[৫]

এই ভাষণে আচার্য সুনীতিকুমার আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেছেন। য়োরোপ কর্তৃক সংস্কৃত ভাষার আবিষ্কার বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে তিনি মনে করেন। পাশ্চাত্ত্য জগতে এই আবিষ্কারের অব্যবহিত ফল—য়োরোপে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা ও চর্চার ক্ষেত্রে মননগত বিপ্লব। তিনি আরো

বলেছেন : Linguistic scholars discovered in Sanskrit an elder sister of their Greek and Latin, and they found out that without the study of Sanskrit their full knowledge of Greek and Latin would not be complete ; just as we now have realised that without a knowledge of Greek and Latin and Gothic and other Old Germanic, and old Celtic, and Old Baltic, and Old Slav, our full knowledge of Sanskrit would not be complete either.[৬]

বিশ্বমনস্ক মানবিকতাবাদী সুনীতিকুমারের সামগ্রিক বিচারদৃষ্টির পরিচয়স্থল এই উক্তি।

এখানে যে পক্ষপাতহীন উদার বিশ্বমনস্কতার পরিচয় পাই তা আরো স্পষ্ট হয়েছে জীবন-সায়াহ্নে দিল্লী ও কলকাতায় প্রদত্ত দুটি ভাষণে। তিনি রামায়ণের চরিত্র, উৎপত্তি, ইতিহাস, বিকাশ ও বিস্তার নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৭] এ দুটি ভাষণে তিনি দেখিয়েছেন, রাম-কাহিনী আদিতে অন্যরূপ ছিল, তার প্রমাণ দশরথ-জাতক ; বাল্মীকি যে কাহিনী লেখেন, তার তিনটি মূল উপাদান আছে ; রাম বিষ্ণু অবতারে পরিণত হলেন খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের কাছাকাছি সময়ে ; সেই সঙ্গে সীতা হলেন শ্রী। পরে এর সঙ্গে নানা উপাখ্যান যুক্ত হ'ল। রামায়ণ বৃহত্তর ভারতে—মধ্য এশিয়ায়, চীন কোরিয়া জাপানে পৌঁছল খ্রীস্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক থেকে। জন-বিরূপতা ও বিরুদ্ধতার ঝুঁকি নিয়েও তিনি এই বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাঁর মুক্ত বুদ্ধি পক্ষপাত-হীন বিজ্ঞানদৃষ্টির পরিচয় এখানে পাই।

সাহিত্যক্ষেত্রে সুনীতিকুমারের বিশ্বমনস্কতার উজ্জ্বল পরিচয়স্থল World Literature and Tagore (1971) গ্রন্থখানি। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিতে বিশ্বসাহিত্য-স্রোতের অঙ্গীভূত রূপে দেখতে চেয়েছেন। বিশ্বসাহিত্যক্ষেত্রে তিনি দশটি সাহিত্য-সংগঠন ('লিটেরারি কমপ্লেক্স') লক্ষ্য করেছেন। এ গ্রন্থে তার বিস্তারিত পরিচয় বিধৃত হয়েছে। সেগুলি হ'ল—(১) ঋক্ ও অন্যান্য বেদের অংশবিশেষ, উপনিষদসমূহ, সংস্কৃত মহাভারত ও রামায়ণ, ও কালিদাসের রচনাবলী ; (২) হোমরের ইলিয়াড-ওডেসি, হেসিয়ডের রচনা, গ্রীক ট্রাজেডিসমূহ ; (৩) হিব্রুতে লিখিত পুরনো বাইবেল ; (৪) পারস্যের শাহ্-নামা ; (৫) আরব্য-রজনী-কাহিনীমালা ; (৬) প্রাচীন ওয়েলস, ব্রেতঁ, প্রাচীন ফরাসি, প্রাচীন ইংরেজি, প্রাচীন জর্মান ও মধ্যযুগীয় লাতিনে রচিত রাজা আর্থারের কাহিনী-চক্র ; (৭) শেকসপীয়রের কাব্য ও নাটকাবলী ; (৮) যোহান উল্ফগ্যাঙ্গ ভন গ্যয়টের রচনাবলী ; (৯) লেভ নিকোলা-ভিয়েচ টলস্টয়ের উপন্যাস গল্প ও অন্যান্য রচনা ; (১০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র কাব্য ও গদ্যরচনা।

আচার্য সুনীতিকুমারের বিশ্বসাহিত্য-প্রদক্ষিণ ও রবি-প্রদক্ষিণের সামান্যতম পরিচয়ও এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কী গভীর ও ব্যাপক অধ্যয়ন, কী অনন্য-

সাধারণ মননক্রিয়া, কী আশ্চর্য রসগ্রাহিতা এখানে ক্রিয়াশীল তা সহজেই অনুমেয়। বলা যেতে পারে, সুনীতিকুমার যথার্থ বিশ্বসাহিত্য-পরিব্রাজক।

॥ চার ॥

এবার বিশ্বমনস্ক মানবিকতাবাদী সুনীতিকুমারের বিচিত্র জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক আগ্রহ ও কৌতূহলের সামান্য পরিচয় নিই।

তিনি হিন্দু বিবাহ ও উপনয়ন-ক্রিয়াপদ্ধতির একটি সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করেছেন। পুস্তিকাটির নাম A Shortened Arya Hindu Vedic Wedding and Initiation Ritual (জুলাই ১৯৭৬)। ভূমিকায় তিনি আর্য-হিন্দু বিবাহ-আচারপদ্ধতিকে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ, সুন্দরতম ও প্রাচীনতম বিবাহ-পদ্ধতি বলেছেন। এই পদ্ধতিকে আধুনিক কালের উপযোগী করে উপস্থিত করার আবশ্যকতা তিনি স্বীকার করেছেন। একজন বৈদিক আর্যের পক্ষে উপনয়ন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় আচার বলে তিনি মেনে নিয়েছেন। তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য—বৈদিক-হিন্দু আধ্যাত্মিক উপলব্ধিক্ষেত্রে গায়ত্রীর গুরুত্ব রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন (জীবনস্মৃতি ১৯১২, 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য আশ্রম' ভাষণ ১৯০২)। সুনীতিকুমার তারি প্রেক্ষাপটে গায়ত্রী-মন্ত্র ও উপনয়ন-পদ্ধতির ইংরেজি অনুবাদ উপস্থিত করেছেন। আর্য-হিন্দুর ধর্মাচারকে আধুনিককালের সামনে উপস্থিত করতে তিনি আগ্রহ বোধ করেছেন।

ইংরেজিতে লেখা তাঁর একটি প্রবন্ধ ভারতীয়দের পোষাক সম্বন্ধে ('Dress in India'; S. K. Chatterji's Select Papers, Vol. I, 1972)। 'আপ রুচি খানা, পর রুচি পহিরনা': পূর্বভারতে প্রচলিত এই হিন্দী প্রবাদের উল্লেখে প্রবন্ধের সূচনা। লেখকের মন্তব্য: এই নির্দেশই সারা দুনিয়ায় নরনারী মান্য করে থাকে। মানুষের পোষাক-নির্বাচনের পিছনে সমকালীন রুচির প্রভাব প্রবল, একথা স্বীকার করেও তিনি বলেছেন দেশকালভেদে পোষাকের অদল-বদলের আরো দুটি কারণ আছে: আবহাওয়া আর অর্থনীতি। তামাম্ হিন্দুস্থানে সর্বদক্ষিণ থেকে সর্বউত্তর, সর্বপশ্চিম থেকে সর্বপূর্ব পর্যন্ত নরনারীর পোষাকের বৈচিত্র্য—রঙে ও জমিনে—অবশ্যস্বীকার্য। লেখক তার বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন, খুঁটিয়ে বিচার করেছেন তার অন্তরালে সক্রিয় সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক আবহাওয়াগত কারণগুলি। মানবজীবনের প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁকে এই সুখপাঠ্য নিবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

অভিনয়, সংগীত ও চিত্রকলার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কথা সর্বজনবিদিত। তিনি নিজে নিপুণ রেখাচিত্রকার ছিলেন। 'ভারতীয় সংগীত ও রবীন্দ্রনাথ', 'যুগন্ধর শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ', 'শিশিরকুমার ভাদুড়ী' নিবন্ধগুলি ['মনীষী-স্মরণে' গ্রন্থভুক্ত] তাঁর শিল্পানুরাগের প্রমাণ। দুনিয়ার তাবৎ দেশের ক্ষুদ্র শিল্পনিদর্শনের সংগ্রহশালা তাঁর বাসভবন। সে বাড়িতে পদার্পণ করলেই তা অনুধাবন করা যায়।[৮] ইউনিভার্সিটি

ইনস্‌টিটিউটে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নেতৃত্বে যে-সব বাংলা নাটক মঞ্চস্থ হয়, সেগুলির প্রাচীন ভারতীয় বাতাবরণ, পোশাক পরিচ্ছদ বাস্তুকৃতি, শিল্পবস্তু যাতে যথাসম্ভব প্রাচীন ভারতের মতো হয়, তা দেখার ও তৈরির দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে বলতেন 'ব্যাশকারী' (দ্র. 'শিশিরকুমার ভাদুড়ী' নিবন্ধ—মনীষী-স্মরণ' পৃ ১৭৯-১৯১)। 'সুনীতিকুমার চিত্রকলা, কারুশিল্প ও ভাস্কর্যের বড়ো সমজদার ছিলেন। তাঁর বাড়িতে ছোট চিত্র (মিনিয়েচর পেন্টিং) ও হস্ত-কারুকলার (হ্যাণ্ডি-ক্র্যাফ্‌ট্‌স) যে সংগ্রহ আছে, তা তিনি জোগাড় করেছিলেন সারা দুনিয়া ঘুরে। তাঁর ছাত্র-ভ্রমণসঙ্গী শ্রীগোপাল হালদার তার বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন একটি নিবন্ধে (দ্র. শারদীয় অমৃত ১৩৮৪, হালদারের প্রবন্ধ)। আরো পরিচয় দিয়েছেন অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় (দ্র. 'আচার্য-তর্পণ', 'বিদ্যামন্দির পত্রিকা' ১৯৭৮, বেলুড়মঠ)।

বিশ্বমানব সুনীতিকুমারের জীবনের সর্ব বিষয়ে ছিল প্রবল আগ্রহ। একথা সর্বজনবিদিত, তিনি ছিলেন ভোজনরসিক, ছিলেন একজন উৎসুক বিশ্বপথিক। দেশ-বিদেশের মানুষ—তাদের ভাষা পরিধান আহার বিহার সংস্কার ধর্মবিশ্বাস কলাসৃষ্টি—সবকিছু সম্পর্কেই তাঁর ছিল ক্লান্তিহীন ঔৎসুক্য। সদর্থে তিনি ছিলেন জীবনরসিক। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে সুনীতিকুমার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মালয় সুমাত্রা বলিদ্বীপ যবদ্বীপ শ্যামদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রমণ-সঙ্গী সম্পর্কে যে-কথা লিখেছিলেন[৯], তার অংশবিশেষ: "বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তাল-ভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন, আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে—বিশ্বব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ।"

বিশ্বব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ—এই এক কথায় বিশ্বমানব সুনীতিকুমারের পরিচয়টি উদঘাটিত হয়েছে। সুনীতিকুমারের এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত[১০] থেকে দুটি অংশ উদ্ধার করে জীবনরসিক, বিশ্বব্যাপারে আগ্রহী, বিশ্বমানব সুনীতি-কুমারের সঙ্গে পরিচয়সাধনের পালা সাঙ্গ করছি।

(১) সিঙ্গাপুর। ২৫ জুলাই ১৯২৭ তারিখের দিনলিপি। সিঙ্গাপুরের চীনা-বৌদ্ধ-বিহারে আহারের বর্ণনা॥

"খেতে বসা গেল। চীনাদের সঙ্গে একত্রে আহার আমাদের পক্ষে এই প্রথম না হলেও, চীনাদের সঙ্গে চীনা রুচির খাদ্য চীনা প্রথায় খাওয়া এই আমাদের প্রথম। একজন পরিবেশক আমাদের তিনটে-চারটে বড়ো-বড়ো বাটি করে তরকারি দিয়ে গেল। আর দিলে, ছোটো-ছোটো-পাঁচটি পিরিচে কিছু চীনাবাদাম ভাজা, খোসা শুদ্ধ, মিয়োনো; আর কিছু খরমুজের বীচি, নুন জল মাখিয়ে ভাজা। আর দিলে, কয়-বাটি ভাত, আর পানের জন্য লেমনেড। কাঁটা-চামচের বদলে এল দুটো করে

উল-বোনার কাঠির মতন লম্বা কাঠি, chop-stick যাকে বলে। তাতে আমাদের অসুবিধা হবে বুঝে, শেষটা আমাদের জন্য একটা করে কাঁটা আর চামচ যোগাড় করে নিয়ে এল। চীনা খাদ্যের তারের সঙ্গে আমার পরিচয় লণ্ডন আর প্যারিসেই বহুবার হয়ে গিয়েছে।...... দা'ল বা ছোলা ভিজিয়ে রেখে দিলে তার লম্বা-লম্বা কোঁড় বা কলি বা'র হয়, তার তরকারি; পানীফলের দু-তিন রকম তরকারি; আলু আর পেঁয়াজের কলির তরকারি; বাঁশের কোঁড়ের তরকারি; আর উদ্ভিজ্জ তেলে দু-একটা সব্‌জি। ধীরেনবাবু আর সুরেনবাবুর এসব জিনিষ বরদাস্ত হল না, কারণ এদের স্বাদ একেবারে আলাদা; ঘী নেই, মশলা নেই, লঙ্কা-হ'লুদ নেই, soya been বলে একরকম কড়াইয়ের তেলে সাঁতলানো তরকারি। আমার কাছে এর স্বাদ অপরিচিত না থাকায়, চীনা বন্ধুদের সঙ্গে আমি বেশ পাল্লা দিয়ে চললুম।"[১১]

(২) বলিদ্বীপ—বাঙ্‌লি। ২৬ আগষ্ট ১৯২৯ তারিখের দিনলিপি। বাঙ্‌লির 'পুঙ্গব'-উপাধিক রাজার খুড়োর আত্মশ্রাদ্ধানুষ্ঠান বা 'মেমুকুর'-এর বর্ণনা॥

"আমরা [শ্রাদ্ধ] মণ্ডপগুলি থেকে নেমে আসছি। কাঁচা বাঁশের মিঠে সোঁধা গন্ধ, কলা তাল আর না'রকল পাতার আর কলার বাসনার গন্ধ, আর তার সঙ্গে ধূপ-ধূনার গন্ধ; এত লোক ভালো কাপড় পরে কিছু কিছু সুগন্ধি মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার সৌরভ; আর লোকেদের মাথায় আর কানের পাশে melati বা মালতী, tjempaka বা চম্পক, গন্ধরাজ প্রভৃতি আমাদের পরিচিত ফুলের সৌরভ—একটু উগ্র বলে মনে হল এই সমস্ত ফুলের সৌরভকে, তার উপর মেয়েরা আর পুরুষেরা মাথায় লম্বা চুলে প্রচুর না'রকেল তেল মেখেছে, তার বাস;—এই সমস্ত মিলে, যুগপৎ নাসাপথকে যেন অভিভূত করে ফেলছে;—চোখের সামনে ভীড়ের লোকেদের নিরাবরণ সৌষ্ঠব আর সৌষম্য-পূর্ণ দেহের পীতাভ, ক্বচিৎ বা শ্যামাভ গৌরবর্ণের রৌদ্র-চিক্কণ ঔজ্জ্বল্য; এদের দেহের ঋজুতা আর তনিমা; বর্ণোজ্জ্বল বস্ত্রে মনোহর গতি-ভঙ্গীতে এদের চলা-ফেরা; আর কানে অনিরুদ্ধ-ভাবে তালে-তালে গামেলান্ বাজনার সুমিষ্ট ধ্বনি; এ সমস্তের উপরে, মিঠে-কড়া রোদ্দুরের প্রভাব পড়ে, এই সৌরভ আর বর্ণসমাবেশকে যেন আরও কড়া আরও তীব্র করে তুলেছে; আর জনতার অপরিহার্য কলরব এই বাদ্যধ্বনির সঙ্গে discord বা বিবাদের সঙ্গে সঙ্গে যেন একটি harmony বা সংবাদিভাবের সৃষ্টি করে তুলেছে। একসঙ্গে দর্শনেন্দ্রিয় ঘ্রাণেন্দ্রিয় আর শ্রবণেন্দ্রিয় আক্রান্ত হয়ে পড়ায়, আর এত অদৃষ্টপূর্ব বস্তুর সমাবেশের মধ্যে পড়ে যাওয়ায়, মনও যেন অভিভূত হয়ে পড়েছে—যেন একটা অবসাদে আমাদের মনকে ঘিরে ফেলেছে, এরকম অবস্থা আমাদের হ'ল। রেখায় রূপে বর্ণে গন্ধে ধ্বনিতে মিলে যে কল্পলোকের সৃষ্টি করে তুলেছিল, তা আমাদের অদৃষ্ট-পূর্ব, অননুভূত-পূর্ব। বলিদ্বীপে নেমে প্রথম দিনেই এতটা সৌন্দর্যের ভাণ্ডার এমনি অনপেক্ষিত পূর্ণভাবে আমাদের সামনে খুলে যাবে, তার কল্পনাও আমরা করতে পারি নি। এই দিনটির স্মৃতি চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে মনে থাকবে।"[১২]

এই দুটি উদ্ধৃতি থেকে পঞ্চেন্দ্রিয়-রসিক জীবন-শিল্পী বিশ্বমানব সুনীতিকুমারকে চিনে নিতে পারি। বিশ্বব্যাপারের প্রতি তাঁর ছিল সজীব মনের আগ্রহ। বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি পুরোপুরি উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। খ্রীস্ট-পূর্ব পঞ্চম শতকের আথনাঈ বা খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকের ফ্লোরেন্স নগরীর জীবনরসিক নাগরিকের সঙ্গে বিংশ শতাব্দের শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তুলনা নিরর্থক নয়। তাঁকে গোটা মানুষ, বিচিত্র-কৌতূহলী উদার বিশ্বমানব, মানবিকতাবাদী বলা যেতে পারে। সুনীতিকুমারের প্রাক্তন সহকর্মী, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, বিশ্বখ্যাত দার্শনিক সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সুনীতিকুমার সম্পর্কে যে-কথা বলেছিলেন তাতে বিশ্বমানব সুনীতিকুমারের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে : 'Sri Suniti Kumar Chatterji is one of the most fertile minds of our times. He has a keen sensibility, a remarkably fine intelligence. He is essentially a humanist... .. believes in the oneness of humanity, despite its varied manifestations.

উল্লেখপঞ্জী :

(১) Jacob Burckhardt : 'The Civilization of the Ranaissance in Italy' Part II. pp. 81-87 (Reprint 1960).

(২) Ibid

(৩) Ringraziamento (in Sanscrito, in Greco ed in Latino, con Traduzioni Inglese ed Italiana)—Per la Cerimonia di Conferimento della Laurea Honoris causa da parte della Facolta di Lettere e' Filosofia dell' Universita di Roma/Roma, 28 Marzo 1961, all' Universita.

(৪) Speech delivered at the Instituto Menezes Braganza (formerly the Instituto Vasco da Gama), Goa on 20th March, 1971 : "Goa has the basic thing in our Indian mentality and culture—a great and a most pleasing harmonizing of different cultures and different mentalities, and different religions each with its own beautiful ritual of worship."

(৫) The main ideology behind the present-day culture of India can be put in two words, which are found in the *Bhagavad-Gita*, viz —*Yoga*, and *Kshema*. *Yoga* means "Addition": addition of things of value, particularly in the domain of the spirit, which we do not have in our culture and in our life, but which we do want, and we are enjoined to receive them with both hands wherever they might come from. And *Kshema* is "Rest, Security, or Conservation", and means also the Preservation of Things of Permanant Value in our own life and culture, which have a meaning and importance not only for us alone but which have received the homage of people outside also. Now in the present age in India, after we came in contact with the Portuguese, then the British, the French and other peoples from the Western World, our Indian culture took a new turn. English became the great solvent for practically the whole of India, while Portuguese was mostly confined to Goa. Both these languages, as well as French to some extent (in Pondicherry in Tamil-Nad and in Chandernagore in Bengal), brought to us a new world of ideas and material advancements. But English particularly with its liberal spirit brought to us something intellectually and spiritually which we did not have before. Through English we got the doors and windows of our mind for accession of air and light from outside. The horizon of our Indian mind was widened by the coming of English. Among the new thing the English language, literature and thought brought to us was a new type of *Intellectual Hunger*, which could only be met by our study of European life and culture, Western Literature and the Western Mind at their highest and best. This brought to us the *Yoga* or "Addition" to our life and experience which we needed so much. [From the Goa Speech].

(৬) Ibid.

(৭) Address of Welcome, International Seminar on the Ramayana, December 8, 1975, 'The Ramayana: Its character, genesis, history, expansion and exodus'—Lecture delivered before the Asiatic Society, Calcutta, January 15, 1976.

(৮) সুনীতিকুমারের অঙ্কন-চর্চা ও শিল্প-নিদর্শন-সংগ্রহের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন

তাঁর কন্যা শ্রীমতী নীলা মুখোপাধ্যায় "আমার বাবার ছবি আঁকা" প্রবন্ধে (শারদীয় বসুমতী ১৩৮৪)।

(৯) জাভাযাত্রীর পত্র, যাত্রী, পৃ ১৯১-৯২, পৃ ২১৪।

(১০) রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ (সেপ্টেম্বর ১৯৬৪। প্রথম সংস্করণ 'দ্বীপময় ভারত' নামে প্রকাশিত, সেপ্টেম্বর ১৯৪০)।

(১১) তদেব, পৃ ১৪০-৪১।

(১২) তদেব, পৃ ৩৫১।

এই নিবন্ধে ব্যবহৃত বিরল-দৃষ্ট মুদ্রিত ভাষণ, পুস্তিকা ও পুস্তকসমূহ অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।

॥ সুনীতিকুমার[1] : লৌকিকজীবন-মনস্কতা ॥

নির্মলেন্দু ভৌমিক

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হলেও, সুনীতিকুমারের স্ব-ক্ষেত্র হল ভাষাতত্ত্ব। ভাষাতাত্ত্বিক বলতে সচরাচর যে শুষ্ক-কঠোর ব্যক্তিত্বকে নির্দেশ করা হয়, সুনীতিকুমার ছিলেন তাঁর মনোরম ব্যতিক্রম। সহজ সদালাপে, চিত্র ও সঙ্গীত রসিকতায়, নাট্যরস আস্বাদনে, ভোজন সচেতনতায়, তিনি, যাকে বলে সম্পূর্ণ একজন মানুষ,— তাই ছিলেন। নিজেকে সমাজ ও লোকজীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে এক কল্পলোকে নির্বাসন দেন নি। এইখানেই অন্য আর দু-পাঁচজন পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। এই জীবনবোধ ছিল বলেই তাঁর প্রতিভাও দিকে দিকে বিকশিত হতে পেরেছিল। একটি বিশেষ জীবনবোধ ও জীবনচর্চা না থাকলে কোনো পণ্ডিতই বিশুদ্ধার্থে পণ্ডিত হয়ে ওঠেন না। সুনীতিকুমারের ভবিষ্যৎ জীবনী-লেখককে একথা স্মরণে রাখতে হবে।

সমাজ ও লৌকিক জীবনপ্রসঙ্গে তাঁর এই সচেতনতার মূলটি কোথায় নিহিত, এতদিন তা ধরা যাচ্ছিল না। সম্প্রতি সুনীতিকুমারের ছাত্র, শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলালের সম্পাদনায় 'শারদীয় যুগান্তরে' (১৩৮৪) প্রকাশিত 'জীবন-কথা' (পৃ. ৮-৪৪) রচনাটি সেই দিকটি নির্দেশ করে দিল। এই আত্মজীবনীতে সুনীতিকুমার তাঁর পিতৃ-পুরুষ, জন্ম-শৈশব-শিক্ষারম্ভ এবং সমকালীন যুগ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। সুনীতিকুমারের সব ধরণের পরিচয়ও রচনাটিতে বিধৃত আছে।

কিন্তু রচনাটির মধ্যে যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা তাঁরই দৃষ্টিকোণ। রচনাটি একাধিক বার পাঠ করে আমাদের মনে হয়েছে, কোনো পণ্ডিত নয়, একজন সহৃদয় মানুষ তাঁর সর্বাঙ্গীণ সত্তা নিয়ে, নিরহঙ্কারের অশ্রু-মালা গেঁথে গেছেন। তাঁদের দারিদ্র্য, মতিলাল শীলের ফ্রী ইস্কুলে পড়া, অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে মায়ের শ্রাদ্ধ, প্রভৃতির বর্ণনার ফাঁকে তাঁর মনটি ধরা পড়েছে। আশি বছর বয়স পেরিয়ে তিনি মায়ের জন্যে যে মমতা প্রকাশ করেছেন, কিংবা মতিলাল শীল ও শীল পরিবারের প্রতি যে কৃতজ্ঞতা, তাতে তাঁর সহৃদয় সামাজিক এবং চিরকালীন মানবিক মূর্তিটিই প্রতিফলিত হয়েছে। ওয়াই. এম. সি. এ.-র খ্রীষ্টান পাদ্রীর নিষ্ঠা-সততা অথবা সামান্য একজন রাজমিস্ত্রীর মানবিক অনুভূতি তিনি নিজে মানবিক বলেই নিখুঁত ভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। এ সবেরই পেছনে কাজ করেছে অতীত জীবন, সংস্কার ও ঐতিহ্যের value বা মূল্যকে স্বীকার করা। আমাদের মনে হয়, এই মূল্যবোধের ফলেই তাঁর মধ্যে লৌকিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে আগ্রহ-উৎসাহ

সঞ্চারিত হয়েছিল। এই পথ ধরেই রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা-প্রীতি প্রবাহিত হয়। উল্লিখিত রচনাটি থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি প্রসঙ্গ তুলে ধরি :

ক. বাঙালীর সাধারণ বিশ্বাস, দুর্গাপূজার তিনদিন দুর্গা বাপের বাড়ীতে এসে, চতুর্থ দিনে পতি-গৃহে ফিরে যান। এই বিদায়-বেদনা সকল বাঙালীকেই অন্তরে কাঁদিয়ে তোলে, তখনকার দিনে বয়স্ক পুরুষরাও কেউ কেউ সত্যি-সত্যিই কেঁদে ফেলতেন। সুনীতিকুমারের মন্তব্য : 'এই সরল বিশ্বাস আমাদের জীবনে একটা অনির্বচনীয় আনন্দ এনে দিত।'

খ. 'স্বামীজীর প্রভাবের ফলে, আমি কঠোপনিষদও পড়ে ফেললুম। আর্যসমাজী ব্যাখ্যা শুনে, মাথায় এক গোছা টিকিও রাখলুম।'

গ. ১৯৭৬ সনের ২৯ ডিসেম্বর অধ্যাপক জয়লাল কৌল-কে একটি চিঠিতে সুনীতিকুমার লেখেন : 'I am not atheist, but I am an agnostic with imagination—being a follower of Rabindranath Tagore'.

১৯০৪ সনে, সহপাঠী গৌরগোবিন্দ গুপ্তের আগ্রহে রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে সুনীতিকুমারের প্রথম পরিচয় ঘটে। সুনীতিকুমার জানাচ্ছেন : 'আমার আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশে রবীন্দ্রকাব্যজ্যোতি এসে নোতুন প্রাণ এনে দিলে, তাঁর কল্পিত "জীবন-দেবতা" এক অপরিসীম মূল্য নিয়ে আব্‌ছা-আব্‌ছা ভাবে আমার মনের মধ্যকার হিন্দু দেব-কল্পনা, শিব-উমা বিষ্ণু শ্রীদুর্গা কালী প্রভৃতি, যার উপরে বিবেকানন্দ উপদিষ্ট বেদান্তচিন্তা এক ধরণের অতি মহনীয় আলোকপাত করেছিল, সেই সমস্তকে এমন একটা নোতুন রূপ দিলে যা অনির্বচনীয়, যার পুরো বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা আমার অপরিপক্ক কিশোর মনের পক্ষে অসম্ভব ছিল।—এখনও এই বৃদ্ধ বয়সে এই অনির্বচনীয়তার গণ্ডী বা জাল কাটিয়ে উঠতে পারলুম না।'

ঘ. ১৯০৩ খ্রীষ্ট সনে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার সঙ্গে সুনীতিকুমারের পরিচয় হয়। এর ফল তিনি বিশ্লেষণ করেছেন : 'এই সব ছবি চোখের ভিতর দিয়ে আমার আভ্যন্তর শিল্পচেতনাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মদিদৃক্ষাকে নোতুন ভাবে জাগিয়ে তুললে, আত্ম-সমীক্ষার পথে যেন অনেকটা এগিয়ে দিলে।'

ঙ. সুনীতিকুমারের মাতুলালয় ছিল হাওড়ার শিবপুরে। শৈশবের একটা অংশ কেটেছে তাঁর এইখানে। মাতুলালয় তাঁর জীবনে দুটি ভাবনাকে জাগিয়েছে। একটি হল সেখানকার পল্লী পরিবেশের মাধ্যমে বাঙলাদেশের চিরকালীন পল্লীপরিবেশকে প্রত্যক্ষ করা। এটির প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য : '…গ্রামের একটু ভিতরে গেলে, সেই প্রাচীন বাঙালী ভদ্রপল্লীর রূপটি আমার ছেলেবেলায় কৈশোর পর্যন্ত নষ্ট হতে পারে নি। আর তারই মধ্যে আমার বাল্যজীবনের আনন্দময় স্মৃতি অনেকটা জড়িয়ে আছে।' অপরটি হল তাঁর সঙ্গীত-চেতনা, যে চেতনার ফলে প্রাচীন বাঙলা গান শুনতে তিনি ভালোবাসতেন, যার ফলে 'ভারতীয় সঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ (এটি তাঁর 'সাংস্কৃতিকী' ও 'মনীষীস্মরণে'—দুটি বইতেই মুদ্রিত হয়েছে) লিখতে উৎসাহী

হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য : 'মামার বাড়ী থেকে আর একটি বিষয়ে আমার মানসিক সংস্কৃতির একটু উৎকর্ষ লাভের সুযোগ পেয়েছিলুম—সেটা হচ্ছে আমাদের কালোয়াতী সঙ্গীত ধ্রুপদ-খেয়ালের সৌন্দর্যের দিকে একটা আকর্ষণ। আর তা থেকে উত্তরকালে স্বদেশের ও বিদেশের classical music উচ্চকোটির মার্গসঙ্গীতের উদাত্ত মধুর বায়ুমণ্ডলের অনুভূতি আর সে সম্বন্ধে অব্যক্ত প্রীতি।'

চ. কৌলীন্য, কুলশাস্ত্র ও সামাজিক কুসংস্কার নিয়ে আলোচনা করবার পর তাঁর সিদ্ধান্ত : 'এই তো হচ্ছে কুলের ইতিহাস। কিন্তু এই কুসংস্কার গোঁড়ামি অজ্ঞতা নিষ্ঠুরতার মধ্যেও যে আদর্শনিষ্ঠা, স্বার্থত্যাগ ভালোবাসা দয়ামায়া মানবিকতা দেখেছি বিশেষ করে সমাজের এই নিপীড়িতা মেয়েদের মধ্যে, তা মনে করলে বুক ভরে ওঠে, চোখের জল বাধা মানে না—সব দোষ সত্ত্বেও আমার এই আধুনিক সর্বদোষের আকর হিন্দু সমাজকে, এইরূপ দু-পাঁচ দেবীপ্রকৃতির নারীর জন্মক্ষেত্র আর কর্মক্ষেত্র বলে, হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে এই সমাজকে ভালো না বেসে পারি না।...'

সুনীতিকুমারের মানস গঠনের কয়েকটি উপাদান-প্রসঙ্গ ওপরে তুলে ধরা হল। এগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তাঁর মানস-বিশেষত্বটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে, এই রচনাটির সঙ্গে অলঙ্কার হিসেবে যুক্ত, সুনীতিকুমারেরই আঁকা কয়েকটি স্কেচের বিষয়বস্তুর কথা বলা যায়। ছবিগুলোর অঙ্কন-পদ্ধতি বা ভালো-মন্দত্বের বিচার আমাদের লক্ষ্য নয়। কিন্তু তাদের বিষয়বস্তুগুলো লক্ষণীয়। তার মধ্যে আছে : বৈদিক জীবনের খণ্ডাংশ, ঋষির পরিচিত মূর্তি, হাতে কমণ্ডলু। কিংবা ঘোড়ায় চড়া উনবিংশ শতকের বাবু, পাল্কীর ছবি। সব জুড়ে প্রাচীন ও অতীতের প্রতি একটি শ্রদ্ধা-সম্নত ভাব ফুটে উঠেছে। কখনো দেখি, প্রাচীনা স্ত্রীলোকের বিশেষত্ব তুলে ধরছেন নিজের ঠাকুরমা বা পিসিমার প্রসঙ্গে। সুনীতি-কুমারের প্রপিতামহ ভৈরবচন্দ্র ষাটটি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর ঠাকুরমা এই জন্যে তাঁকে বলতেন 'ষাট-ফৈরব'। ভৈরব কেন 'ফৈরব' হল, ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার তার ভাষাতত্ত্ব-ঘটিত কারণ নির্দেশ করতে বসেন নি, সহজ সামাজিক প্রথার উল্লেখ করেছেন : 'শ্বশুরের স্বামীর নাম সে যুগে মেয়েরা উচ্চারণ করলে তাঁদের মহাপাপ হত, তাই তাঁরা 'হরি'-কে 'ফরি', 'কালী'-কে 'ফালী', 'ভৈরব'কে 'ফৈরব' বলতেন[২] —আদ্য অক্ষরের জায়গায় 'ফ' বসিয়ে বললে পরে পাপ হত না।' কিংবা সেকালের মহিলাদের অভিশাপ দেবার রীতিটির উল্লেখ : '...যার উপরে তাঁর [সুনীতি-কুমারের পিসিমার] রাগ হত চীৎকার করে আঙুল মট্‌কে-মট্‌কে তাঁর মৃত্যু কামনা করে গালি দিতেন।' এই সব উল্লেখ ও বর্ণনার মধ্যে সুনীতিকুমারের মানসবিশেষত্ব অনুধাবন করা যায়।

অথবা, এই রচনাটির ভাষা ; তারও মধ্যে পাই ঘরোয়া জীবনের এক বিশিষ্ট ও পরিচিত দিক। কয়েকটি নিদর্শন এই : 'থিতু হয়ে' বসা। চন্দন পীড়ি। 'খাটন-মালা' হয়ে বসা। 'থোদা-ঘর'। শট্‌কে, কড়াকে, বুড়্‌কে। একদমা,

দোদমা বোমা। কুমার কানন [kindergarten-এর বঙ্গানুবাদ]। ধর্মদেয় [charity-র বঙ্গানুবাদ]। 'ড্যাং-ডেঙিয়ে' [with drums beating]। ঘোড়্-তোলা বুট জুতো [গোড়ালি-তোলা জুতো]। 'ফিক্টি' লাগা। 'ঠাট্টাঠাট্টি' করা। আঠা ['আকর্ষণ' অর্থে]। ঢাডা [লম্বা, দীর্ঘ]।

বেশবাসেও সুনীতিকুমার ছিলেন বঙ্গীয় তো বটেই, হয়তো বা উনবিংশ শতকীয়। মালকোঁচা দিয়ে ধুতি, ঢোলা, গোলহাতা পাঞ্জাবী, কাঁধে চাদর বা উড়ুনী। একেবারে নিখুঁত ও পরিপাটী বাঙালী, এই বেশেই তাঁকে জীবনের শেষ দেখা দেখেছিলুম॥

...২...

ওপরে সুনীতিকুমারের যে মানসটির কথা বলা হল, তাঁর ভাষাচর্চার মধ্যে কেমন করে তা ধরা দিয়েছে, এইবার সে সম্পর্কে দু-চার কথা বলি। এ বিষয়ে কেবল তাঁর 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২। দ্বিতীয় সংস্করণ) গ্রন্থটিই এক্ষেত্রে আমরা অবলম্বন করেছি।

এই গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ে সুনীতিকুমার যে সব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তার মধ্যে তাঁর মনটিকে লক্ষ করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। যে-সব উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তা দুভাগে ভাগ করা যায় : ক. অপরের লেখা বা রচনা থেকে চয়ন করা বাক্য ও শব্দ খ. নিজেই যে সব শব্দ লৌকিক ও দৈনিক জগৎ থেকে বেছে নিয়েছেন ; এবং যে-সব বাক্য রচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, এই দ্বিতীয় ধরণের শব্দ ও বাক্যের মধ্যেই লেখকের মনটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

এইখানে আমাদের একটি কথা বিশদ করে নিতে হয়। একথা সকলেই আমরা জানি, সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে লেখকের শব্দ-নির্বাচন ও বাক্যবিন্যাস তাঁর মনের বিশিষ্টতাকে নির্দেশ করে ; কিন্তু যে সব লেখা সৃষ্টিধর্মী নয়, যেমন ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনার বেলায়, তার মধ্যেও কিন্তু লেখকের ব্যক্তিগত স্পর্শ একটু-আধটু মেলে। যেমন, বিদ্যাসাগরের 'বাল্যপাঠ' বা রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠে'র মধ্যে তাঁদের বিশিষ্টতাকে ক্ষণে ক্ষণে অনুধাবন করা যায়। কেবল যে পৃথক পৃথক ভাবে কোনো শব্দ বা একটি বাক্যই লেখকের মনকে এক ঝলক দেখিয়ে দেয়, তাই নয় ; যেখানে একই বিষয়ে একাধিক দৃষ্টান্ত দিতে হয়, সেখানে সেই দৃষ্টান্তগুচ্ছকে পর পর স্থাপনার মধ্যে এক-একটি ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায়। এও লেখকের ব্যক্তিগত দিককে নির্দেশ করে। তেমনি অপরের লেখা থেকে দৃষ্টান্ত চয়নও অনেক সময় লেখকের ব্যক্তিগত বিশেষত্বকে নির্দেশ করে। সুনীতিকুমারের ক্ষেত্রে যেমন রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং লোকসাহিত্য থেকে পঙ্‌ক্তি আহরণ করা। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র বা শরৎচন্দ্রের তুলনায় রবীন্দ্র-সাহিত্যকে সুনীতিকুমার উদাহরণ হিসেবে অনেক বেশি পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। লোক-সাহিত্যের পঙ্‌ক্তি-ব্যবহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিজের রচনা করা উদাহরণগুলির মধ্যে আবার দুটি ভাগ দেখা যায় : ক. দৈনিক

ও ঘরোয়া জীবন, এইটিই প্রাধান্য পেয়েছে ; খ. ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞান-বিষয়ক।

এ ছাড়া আছে মৌখিক ও কথ্যরীতিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে সুনীতিকুমারের প্রয়াস। মৌখিক ও কথ্য রীতির মধ্যে একটি লৌকিক ও সামাজিক দিক আছে, বইয়ের জগতের সঙ্গে তার যোগ নেই। যেমন, চলিত বাঙলায় 'ফ' ও 'ভ' বিশুদ্ধ মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয় না, তা উষ্মধ্বনিতে পরিণত হয়ে গেছে। যেমন 'প্রফুল্ল' বা 'প্রভা' শব্দে। শব্দ দুটির শুদ্ধ উচ্চারণ কি হবে, সুনীতিকুমার তা লিখে দিয়েছেন : 'প্রপ্‌হুল্ল' 'প্রব্‌হা'। শুদ্ধ উচ্চারণের অনুসরণে শব্দের এই বিচিত্র চেহারা অবশ্যই পাঠকের মনে এক বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি করে। তেমনি, পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ রীতিতে 'ড়' ও 'র'র বিপর্যয় বোঝাতে তিনি যে উদাহরণটি দিয়েছেন তার উপস্থাপনার মধ্যে আছে এক রসিকতাবোধ : '·· অনেক সময়ে লেখায় ড়-ও র-এর বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে—ঘর-ভাড়া স্থলে ঘড়-ভারা লেখা দেখা যায়।' কলকাতার ছাত্ররা 'স্যান্‌সক্রিট্' (sanskrit) শব্দের উচ্চারণ করে 'স্যাঁয়েন-কীট' এবং পূর্ববঙ্গের লোকেরা 'ক্যালকাটা'কে বলে 'ক্যালকাডা'। দুটি উদাহরণের পরই সুনীতিকুমার বন্ধনীর মধ্যে বিস্ময়-বোধক চিহ্ন স্থাপনা করে তাঁর রসিকতাটুকু ব্যক্ত করেছেন। হিন্দু-মুসলমান ব্যক্তিনামের প্রতিবর্ণীকরণ বা পদবীর বিভিন্ন ইংরেজি-রূপ লিখনের যে বিচিত্র ও বহু দৃষ্টান্ত তিনি সঞ্চয়ন করেছেন, তাতে বাঙালী জাতি ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর বহুদর্শিতা ব্যক্ত হয়েছে।

বাঙলা স্বরাঘাতের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে তিনি যে যৌথ পরিবারের ছবি এঁকেছেন, তা আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না : 'বাঙ্গালায় বাক্য বা বাক্য-খণ্ডই স্বরাঘাত নির্দেশ করিয়া দেয়, ইংরেজীতে প্রত্যেক শব্দ স্বতন্ত্র থাকে। বাঙ্গালা বাক্যস্থ শ্বাস-পর্ব বা অর্থ-পর্বগুলি যেন কতকগুলি একান্নবর্তী পরিবার—মাথার উপরে কর্তা, স্বরাঘাত-রূপে মর্যাদা তাঁহারই. এবং পরে কতকগুলি অক্ষর বা পদ, ·· ; কিংবা যেন কতকগুলি রেলগাড়ীর সমষ্টি, স্বরাঘাত-যুক্ত প্রথম অক্ষর যেন ইঞ্জিন-গাড়ী, বাক্য-খণ্ডের অন্য অক্ষরগুলিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে ; আর ইংরেজীর বাক্য যেন সিপাহীদের কুচ করিয়া হাঁটিয়া যাওয়া, প্রত্যেক প্রধান শব্দের বল বা স্বরাঘাত বন্দুকের উপর সঙ্গীনের ন্যায় নিজ স্বাতন্ত্র্যে বিদ্যমান... .'—পৃ: ৮৩-৮৪

ইংরেজি স্বরাঘাতের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে ইংরেজের কুচ করে হাঁটাকেই গ্রহণ করবার মধ্যে ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতির যোগটিকে তীক্ষ্ণ করে তোলা হয়েছে। রেল-গাড়ীর উপমাটিও ভোলবার নয়।

বাঙলা যতিচিহ্নের মধ্যে একটি হল 'আঁজি' বা 'গণেশের আঁকড়ী' [অর্থাৎ '৴৭', '৭']। এই চিহ্নের কেবল উল্লেখ করলেই চলত, কিন্তু লৌকিক জীবনরসিক সুনীতিকুমার এর পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে : এটা একটা প্রাচীন চিহ্ন, দেবনাগরী গুরুমুখী প্রভৃতি বর্ণমালায়ও মিলে, অধুনা অনেকটা অপ্রচলিত। এই :

চিহ্ন দিয়া পত্রাদি আরম্ভ হইত—ইহা ওঁ-কারের (পরব্রহ্মের নাম-দ্যোতক শব্দের), অথবা একমাত্র ঈশ্বরের প্রতীক (৭=দেবনাগরীর ১=১)। কাহারও-কাহারও মতে ইহা গণেশ দেবতার প্রতীক, গণেশের চিত্র বা প্রতিমূর্তি-স্থলে গণেশের হস্তি-মুণ্ডের সংক্ষিপ্ত রূপ,—৭— ; কিন্তু এই মত ঠিক মনে হয় না।'—পৃ. ৯০। এই ভাবে ব্যাকরণের আলোচনা করতে করতে সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণামূলক মন্তব্য করেছেন। এও তাঁর বিচিত্র মনের একদিক।

বাঙলা শীৎকার বা কাকুধ্বনি (clicks) নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর উদাহরণ : 'পায়ে আলপিন ফুটিয়া গেলে. বা জ্বালা করিলে, আমরা ওষ্ঠদ্বয় বর্তুলাকার করিয়া হাওয়া টানিয়া লইয়া এক প্রকার ধ্বনি করিয়া থাকি ;...এবং খুব ঝাল লাগিলে, আমরা ল-কার উচ্চারণের মত জিহ্বাকে মাঝে রাখি, ও পাশ দিয়া হাওয়া টানিয়া লই—ইহা এক প্রকার পার্শ্বিক ধ্বনি।' —পৃ. ৯২

স্বরভক্তি, স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির যে সব দৃষ্টান্ত তিনি চয়ন করেছেন, তার মধ্যে লোক জীবনের প্রতি মমতা-সচেতনতা প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য, এই বিষয়গুলিই এমন যে তার সঙ্গে সামাজিক জগৎ ও মৌখিকতার যোগ অচ্ছেদ্য। য়-শ্রুতির আলোচনাতে তাঁর সঙ্গীত চেতনা এবং রবীন্দ্রপ্রীতি এই ভাবে প্রকাশিত : 'বাঙ্গালায় গান করিবার কালে, এই শ্রুত্যাগম বিশেষ ভাবে কর্ণগোচর হয় ; যথা—সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চ'খের জলে=[সকলো-য়্-অহংকার হে-য়্-আমার] ইত্যাদি।'—পৃ. ১০৬।

খাঁটি বাঙলা সন্ধির দৃষ্টান্তরূপে তিনি কলকাতার কথ্য ভাষার বিশিষ্টতা নির্দেশ করেছেন : কোথা যাবে=কোজ্জাবে। পাঁচ সের—পাঁশ্‌শের। পাঁচ জন—পাঁজ্জন। হাত-ধরা=হাদ্ধরা। মেঘ করেছে—মেকোরেচে। অনেক সেকেলে পণ্ডিত প্রয়োজন না থাকলেও সন্ধি করে ভাষাকে সংস্কৃত ঘেঁষা-করতে চাইতেন। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি যেন তাঁদের একটু খোঁচা দিতে চেয়েছেন। যেমন, 'তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট' এই অংশটি কেউ যদি সন্ধি করে বলেন 'তুম্যামারোপরাসন্তুষ্ট' তাহলে তা না হল সংস্কৃত, না হল বাঙলা। এও তাঁর রসিকতা বোধের একটি দৃষ্টান্ত। মৌখিক ভাষাতে ব্যঞ্জন সন্ধির চেহারা কেমন দাঁড়ায়, তা তিনি দেখিয়েছেন : বাঁধ ভাকে—বাঁৎভাকে। কাজ চালানো=কাচ্চালানে। নাত্‌ জামাই—নাজ্‌জামাই।

কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় এবং উপসর্গের দৃষ্টান্তমালা চয়নে সুনীতিকুমারের জীবন-বোধ ও সমাজ-অভিজ্ঞতা ভুজে উঠেছে। এখানে যে সব দৃষ্টান্ত পাই তা জীবনের সর্বদিক ও সর্বস্তরকে স্পর্শ করেছে। প্রাচীন বাঙলায় প্রচলিত 'রাজাই' (আই প্রত্যয়ের উদাহরণ, 'রাজত্ব' অর্থে) থেকে এ যুগের নারীর রান্না-বান্না, প্রেম-কলহ-আদর-অনাদর, সমাজের নানা পেশার লোক, হিন্দু-মুসলমানের ভাষার বিচিত্র দিক —সবই আছে। অভিজ্ঞতা ব্যতীত এত বিচিত্র ধরণের দৃষ্টান্ত চয়ন সম্ভব নয়।

তেমনি, একই বিষয়ের একাধিক দৃষ্টান্তকে পর-পর স্থাপনার মধ্যে এক একটি ভাবনা অজ্ঞাতে কাজ করেছে। যেমন, নিষ্ঠা প্রত্যয় সম্পর্কে:

'এই নিষ্ঠা আ-প্রত্যয়-যুক্ত শব্দের সহিত অন্য শব্দের সমাস করা যায়,...যথা. ঘরে-পাতা দই; পায়ে-চলা পথ; সুর-বাঁধা বীণা; ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল; কুয়া-তোলা জল; বাদুড়-চোষা আম, ইত্যাদি।'—পৃ. ১৫৮। পর পর সব কটি উদাহরণের পরিবেশ লক্ষ করলে দেখা যায়, গ্রাম জীবন ও সঙ্গীতের আবহ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এমন ব্যাপার বহু ক্ষেত্রেই ঘটেছে। কেবল একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে তা দেখানো গেল।

সমাস ও শব্দদ্বৈতের উদাহরণেও তাই। পারিবারিক জীবনের পটভূমিকাই এসব ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টান্তগুলির উৎস। পদাশ্রিত নির্দেশকের আলোচনায় 'টা' ও 'টা'র পার্থক্য বোঝাতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন পরিচিত ছড়ার পঙ্‌ক্তির: 'ওদের বাড়ীর ছেলেটা খায় এতটা, নাচে যেন বুড়ো ভাম্‌কটা—আর আমাদের বাড়ীর ছেলেটী খায় এতটী, আর নাচে যেন ঠাকুরটী।'—পৃ. ২৫৬। একাধিক বিষয়ের দৃষ্টান্ত হিসেবে লোকসাহিত্যের পঙ্‌ক্তি গ্রহণ করেছেন। যেমন কারক-বিভক্তির আলোচনায়: 'প্রবাদাত্মক বাক্যে প্রাচীন ভাষার রীতি বজায় থাকে বলিয়া, এইরূপ বাক্যে বহু সময়ে কর্তৃকারকে এ-কার পাওয়া যায়; যথা.. গাধায় খায় পাকা কলা শূয়রে খায় পান।'—পৃ. ২৮২। করণকারকের আলোচনায়: 'হট্টমালার দেশে, তারা গাই বলদে চষে।' রবীন্দ্রনাথ থেকে আরো উদাহরণ: 'দুখের বেশে এসেছ বলে, তোমারে নাহি ডরিব হে।' সম্প্রদান কারকের উদাহরণ: 'অন্ধজনে দেহ আলো, মৃকে দেহ ভাষা' [সুনীতিকুমার উদ্ধৃতিতে ভুল করেছেন। হবে এই:... মৃতজনে দেহো প্রাণ]। অধিকরণ কারকে: 'বিষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদী (= নদীতে) এল বান'। এটি অবশ্য লোকসাহিত্য থেকে গৃহীত। 'ভাবে প্রয়োগ'-এর উদাহরণে: ঘর থাকতে বাবুই ভিজে।

বাঙলায় সংস্কৃত বিভক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার আর একটি সামাজিক তথ্য জানিয়েছেন। প্রাচীন বাঙলার চিঠি-পত্রে বা দলিল-দস্তাবেজে স্ত্রীলোকদের প্রসঙ্গে 'শ্রীমত্যা', 'দেব্যা', 'দাস্যা' ব্যবহৃত হত। এর কারণ সুনীতি কুমারের মতে: 'সধবা বা কুমারী অপেক্ষা বিধবাগণই বেশীর ভাগ সম্পত্তি-পরিদর্শন অথবা রক্ষা হেতু এইরূপে নিজ নাম ব্যবহার করিতে হইত বলিয়া, ক্রমে বাঙ্গালা ভাষায় বিধবাগণের নামের সহিত, এমন কি প্রথমা বিভক্তিতেও, শ্রীমতী, দেবী, দাসী-র পরিবর্তে—শ্রীমত্যা, দেব্যা, দাস্যা এই কয়টী বিকৃত রূপ আসিয়া যায়; ..' পৃ. ২৭৬

কিছু কিছু দৃষ্টান্তের মধ্যে সুনীতিকুমারের স্বদেশ বোধ কাজ করেছে। সমসাময়িক ভারত, ভারতের রাজনীতি এবং ইংরেজের প্রসঙ্গ তারই প্রমাণ। যেমন 'ঘর' এই অনুসর্গের দৃষ্টান্তে: ইংরেজদের ঘরে। অন্যোন্য অর্থে, দুই কর্তার প্রয়োগে

'এ' বিভক্তির ব্যবহারের দৃষ্টান্তে : 'লর্ড আরউইন ও মহাত্মা গান্ধী পরস্পরে এ বিষয়ে পত্রালাপ করিয়াছেন।' কর্ম-কারকের বিভক্তিতে, কাব্যে, কে-র বদলে রে-র ব্যবহারের দৃষ্টান্তে : 'অবনত ভারত চাহে তোমারে'। [এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃতি : 'আমারে করহ তোমার বীণা'। ঠিক উদ্ধৃতি এই হবে : আমারে করো ··] 'দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার হবে না, হবে না'—করণকারকের দৃষ্টান্তে। তারতম্য বাচক অপাদান কারকের উদাহরণে : 'স্বর্গ অপেক্ষা জন্মভূমির গৌরব অধিক।' স্থান বাচক অধিকরণ কারকের দৃষ্টান্তে : পৃথিবীতে প্রায় সব দেশেই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। ব্যাপ্ত্যাধিকরণের উদাহরণে : এই বৎসরে প্রজাদের বড়ই অন্নাভাব যাইতেছে।

বিভিন্ন বিষয়ের দৃষ্টান্তরূপে মাঝে মাঝে স্বরচিত এমন বাক্য পাওয়া যায়, রাজা ও ব্রাহ্মণের প্রতি যাতে শ্রদ্ধা-সম্মান জ্ঞাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায় যা করা হত, সুনীতিকুমার তারই জের টেনেছেন। তবে, ব্রাহ্মণের প্রতি কিঞ্চিৎ অম্লরসাত্মক বাক্য হানতে কখনো দেখা যায়। উদাহরণ এই : বাঙলা সংযোগ মূলক ধাতুর কর্-যোগে প্রয়োগের দৃষ্টান্তে : আমরা রাজাকে দর্শন করিলাম। রাজা গো-দান করিলেন। সে পাঁচটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছে। অনেক সময় বাক্যে সংযোগ মূলক ধাতুর প্রয়োগ হয়েছে, না সমাস যুক্ত বিশেষ্য পদ আছে, সহসা ঠাহর করা যায় না, অর্থ বা স্বরাঘাত ধরে তা স্থির করতে হয়। এরই দৃষ্টান্তে : তিনি মিষ্টান্ন ভোজন করিলেন (ছাঁদা বাঁধিয়া বাড়ীতে লইয়া গেলেন না!), তিনি মিষ্টান্ন-ভোজন (অন্য কোনও খাদ্য-ভোজন নহে) করিলেন; ·পৃ. ৩৫১। কিন্তু করণকারকের 'দিয়া' বিভক্তির উদাহরণে পাই : ব্রাহ্মণকে দিয়া জল তুলাইবে না।

ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক দৃষ্টান্ত প্রদানে পড়াশোনা, ভূয়োদর্শিতা, এবং নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে লেখকের অভিজ্ঞতা ধরা পড়ে।[৩] যেমন, কর্ম ও ভাববাচের উদাহরণে : প্রায় সকল দেশেই দুল পরিবার জন্য কান বেঁধায়। নিত্যবৃত্ত অতীতের উদাহরণে : মোগল বাদশাহেরা প্রত্যহ প্রাতে দর্শন ঝরোখায় প্রজাবর্গকে দর্শন দিতেন। লিঙ্গের উদাহরণে : মধ্য-এশিয়ায় তুর্কীরা ঘোড়ার দুধ খায়। অধিকরণ কারকের উদাহরণে : হিমালয়ে কস্তুরী-মৃগ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই ভাবে দেখলে এই ব্যাকরণ বইতে সুনীতিকুমারের মনটিকে অনুধাবন করা যায়। অন্যান্য যে সব দিক আছে, তা এই : প্রাচীন বাঙলা দেশ ও বর্তমান পল্লী জীবনের কর্ম ও ভাষা সম্পর্কে সচেতনতা; নারীর মন, জীবন, রান্না-বান্না ও ভাষা-ভঙ্গি; খাওয়া-দাওয়া; তৈজসপত্রাদি; নাচ-গান; মা-সম্পর্কে সচেতনতা, মাকে অবলম্বন করে নানা ধরণের বাক্য; কাশী ও গঙ্গা নদী; মন্দির-মসজিদ; হিন্দু-মুসলমানের মিলন, অসাম্প্রদায়িকতা, সমকালীন রাজনীতি; উপদেশমূলক বাক্য; বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে ভিত্তি করে বাক্য; স্কুল-বিদ্যালয়ের অনুষঙ্গে রচিত বাক্য; মুটে-মজুরকে অবলম্বন করে একাধিক প্রসঙ্গে বাক্য; ব্যায়াম-চর্চা অবলম্বনেও একবার

বাক্য মিলেছে ; লোকসাহিত্য থেকে গৃহীত বাক্য বা বাক্যাংশ (যেমন : উদ্দেশ্য বাচক চতুর্থীর উদাহরণে : জীয়নকাঠি, মরণকাঠি। স্থানবাচক সপ্তমীর উদাহরণে : গোলা-ভরা ধান, বাটা-ভরা পান। সম্বন্ধ পদের দৃষ্টান্তে, অধিকরণের অর্থে : গহীন পানির মীন। বাক্যে পদের ক্রমের বিপর্যয়ের উদাহরণে : এক ছিল রাজা)। সাধারণ ক্ষেত্রে যে কোনো উদাহরণে, ব্যক্তিনাম বলতে ইংরেজির 'টম্-ডিক্-হ্যারি'-র মতো বাঙলায় 'রাম-শ্যাম-যদু' ব্যবহৃত হয়। সুনীতিকুমারের দৃষ্টান্তমালায় এ নামগুলো তো আছেই, কিন্তু সবচেয়ে বেশি যার নাম পাই, সে 'গোপাল'॥

পাদটীকা :

১ এই নিবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'চাটুর্জ্যা' বা 'চাটুজ্জে' বানান লেখা উচিত ছিল। কেননা, সেটাই খাঁটি বাঙালী রীতি। সুনীতিকুমারের অভিমত : 'চাটু গ্রামের 'জীব', সম্মানার্থে, তা থেকে 'চাটুর্জ্যা'।

২ 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণে' (দ্বি সং ১৯৪২) 'অনুকার-বিকারময় শব্দ দ্বৈতে ভাষার ইঙ্গিত' (পৃ. ২৩২-২৩৪) আলোচনাকালে দেখিয়েছেন ফ-যোগ করে বাঙলায় অনুকার-শব্দদ্বৈত সৃষ্টি করা হয়। ফ-যোগ সাধারণতঃ অবজ্ঞা-সূচক। কিন্তু ফ-বর্ণের আলোচ্য ধরণের ব্যবহার ভাষাতাত্ত্বিক দিক অপেক্ষা নৃতাত্ত্বিক দিককেই পরিস্ফুট করে। 'ফ'-ছাড়াও অন্যান্য বর্ণকে এই ভাবে ব্যবহার করতে আমরা শুনেছি।

৩ এই রকম উদাহরণ, 'ও. ডি. বি. এল্'-ওতেও মেলে। যেমন আধুনিক বাঙলায় দ-র উদ্ভব ও অস্তিত্বের নিদর্শনরূপে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে : 'সোদোভাসান' : 'a festival, when toy boats with lights are floated in rivers or tanks— p. 505. ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় এই ধরণের লৌকিক ব্রতানুষ্ঠানের উল্লেখ ও পরিচয় প্রদান লেখকের দৃষ্টির বিশেষত্ব নির্দেশ করে।

সুনীতিকুমার : শিল্পী ও শিল্পকলা-রসিক

প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

১

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত—পৃথিবীর যেখানে যেখানে বিদ্যাচর্চার আয়োজন বা পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি আছে, সর্বত্রই তিনি বিদ্বজ্জনের প্রণাম ও অভিনন্দন লাভ করেছেন। ধর্ম-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি-পারম্পর্যে গ্রথিত বিশ্লেষক মন, বস্তুনিষ্ঠ ও পরিচ্ছন্ন মনন নিঃসন্দেহে 'এনসাইক্লোপীডিক্' গভীরতায় স্বতন্ত্র। সুনীতিকুমারের রচিত ভ্রমণকাহিনীগুলির মধ্যেও তাঁর মনোজীবনের এই অভ্রান্ত শিল্পসংকেত দ্যোতিত—অনুপুঙ্খ পরিচ্ছন্ন বর্ণনারীতির মধ্যেও রস-পরিবেশনের আয়োজন তথ্যমুখীন ও বস্তুনিষ্ঠ। ভাষাতত্ত্বকে সুনীতিকুমারের মনীষা বৃহৎ শাস্ত্রের মর্যাদা দান করেছে। এ ক্ষেত্রেও তাঁর অধ্যয়ন এবং অনুশীলনের মধ্যে গবেষকের বিপুল শ্রমের সঙ্গে শিল্পীর মর্মরস সংমিশ্রিত ছিল। এই দুর্লভ স্বাতন্ত্র্যের উল্লেখ করেই সুনীতিকুমার প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারেনি এই বড় অপূর্ব।" সুনীতিকুমারের মনোজীবনকে আরও স্পষ্টভাবে রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করেছিলেন 'জাভা যাত্রীর পত্র' গ্রন্থে: "আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ আস্ত জিনিসকে টুক্‌রো করা ও টুক্‌রো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তাল ভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন এবং কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্বব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ।" সুনীতিকুমারের ভাষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্যানুশীলনের এই মনো-জীবনের ভূমিকা বৃহৎ ও মহৎ পরিচয়ে এক শিল্পীরই ভূমিকা। হীরকখণ্ডের মতো বহু ভাব-বিভঙ্গে বিচ্ছুরিত তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব এই মহান শিল্পীর ভূমিকাতেই ভাস্বর। তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য ও বিশ্বমুখীন বিদ্যাবত্তার মূলেও এই শিল্পীর মহান ভূমিকা, যেখানে তিনি 'শিক্ষায় সংস্কৃতিতে জাগ্রত বৃহত্তর সমাজের স্বচ্ছন্দ স্বীকৃতি'তে আচার্য-রূপে বরেণ্য, সেখানেও মনন-প্রণালীতে তিনি শিল্পী। তাঁর ভ্রমণরসিক-বক্তা বা রাজনীতিক পরিচয়ের মধ্যেও এই বৃহত্তর শিল্পী-আত্মা সংগুপ্ত। সুনীতিকুমারের মনোজীবনের যথার্থ শিল্পী-পরিচয়ের এই আত্মিক সূত্রটুকু নির্ধারণ করে এবারে আমরা তাঁর বহিরঙ্গ জীবন-পরিচয়ের এক বিরল ও বিস্ময়কর পরিচিতির মধ্যে যাবো।

চিত্রকর এবং বিশিষ্ট শিল্পরসিক হিসেবে পণ্ডিত ও গবেষক সুনীতিকুমারের

ক্ষেত্রে কখনই চিহ্নিত নয়। তথাপি এ পরিচয়েও তিনি বিশিষ্ট পর্যালোচনার দাবী রাখেন। আর তাঁর বৃহত্তর শিল্পীমন যে এ জাতীয় কর্ম বা চিন্তা প্রয়াসের মধ্য দিয়ে অপ্রত্যক্ষভাবে সুসমঞ্জস তার ইংগিত আমরা পূর্বেই দিয়েছি। এই বিরল প্রতিভার কারণেই ভাষা-ব্যাকরণ-শব্দ-লিপি-অক্ষর-হরফের মধ্যে নিমগ্নচেতন গবেষক সুনীতি-কুমার ছবি আঁকেন, ছবি আঁকতে ভালোবাসেন, ছবির রসিক ও রসপ্রমাতা। ভাষাতত্ত্বের শ্রেণীকক্ষে অধ্যাপনায় রত সুনীতিকুমার নাকি তাত্ত্বিক নীরসতাকে শৈল্পিক চিত্তাকর্ষকত্বে সহজতর করে ধরতেন। বর্ণের উচ্চারণ প্রণালী বা বাগ্-যন্ত্রের তাত্ত্বিক শাস্ত্রীয় প্রণালীকে চিত্রিত পন্থায় সুনীতিকুমার পরিবেশন করতেন— একটি উচ্চারণ স্থান থেকে অন্য স্থান পর্যন্ত জিহ্বার অবস্থান বা পরিভ্রমণ-পথটি তিনি নাকি অঙ্কিত করতেন। গুরুমুখী বিদ্যার তত্ত্ব রসগ্রাহী চিত্তে চিহ্নিত হয়ে যেতো। ব্ল্যাকবোর্ডে চকে আঁকা মানুষের মুখ—সংবৃত বা বিবৃত মুখ, কোন মুখের জিহ্বা তালু বা মূর্ধা-স্পর্শী, কারুর জিহ্বা হয়তো বা দন্ত-স্পর্শী। সুনীতিকুমারের ভাষা ও ব্যাকরণ-বিষয়ক কোন কোন গ্রন্থে স্ব-হস্ত অঙ্কিত কিছু ছবি মুদ্রিত আছে; বিভিন্ন অটোগ্রাফের সমীক্ষা নিলেও সুনীতিকুমারের ছবি আঁকার প্রতিভা ও শিল্প-সাধনার পরিচয় পাওয়া যাবে।

পরিমল গোস্বামী আচার্য সুনীতিকুমারের প্রতিভার এই দিকটি বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন—আইনস্টাইনের মতো উচ্চ গণিতবিদও বেহালা নিয়ে মেতে উঠতে অসুবিধা বোধ করতেন না। সুনীতিবাবুর হাতে বেহালা দেখিনি, কিন্তু কল্পনার চোখে ছবি আঁকার তুলি দেখেছি। এবং তাঁর আঁকা ছবি দেখেছি! তারও আগে দেখেছি চিত্রকলার প্রতি গভীর মমত্ব।" শনিবারের চিঠি-(জুলাই ১৯৩৪)-তে সুনীতিকুমারের একটি ব্যঙ্গ রচনা এবং স্বহস্ত-অঙ্কিত 'পাকা হাতে আঁকা একখানি রেখাচিত্র' মুদ্রিত হয়। 'কথাসাহিত্য' পত্রিকার সুনীতিকুমার সংবর্ধনা সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯) পরিমল গোস্বামী সুনীতিকুমারের ছবি আঁকার প্রতিভার মূল্যায়ন প্রসংগে স্মৃতিচারণ করেছেন: যে ছবিগুলি তিনি আমায় পাঠিয়েছেন তা শুধু পাওয়ার দিক দিয়ে আশাতীত নয়, আঁকার ভঙ্গীর দিক দিয়ে আশাতীত। একেবারে পাকা হাত। রেখাঙ্কনে কোথাও সঙ্কোচ নেই, আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা এবং বহু অভ্যাসের ঋজুতা এর প্রত্যেকটি অংশে। কম্পো-জিসন জ্ঞান অসামান্য। বহু অভ্যাস কথাটি ব্যবহার করেছি সাধারণ অর্থে। আমি জানি না তিনি এ বিদ্যা বহুদিন চর্চা করেছিলেন কিনা। আমি তাঁকে এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিতে পারতাম, কিন্তু ইচ্ছা করেই করিনি। কারণ তাতে তাঁর এ পরিপক্ব শিল্পকৃতির কোন নতুন ব্যাখ্যা হত না। সমস্ত ব্যাখ্যা পড়ে আছে চোখের সামনে তাঁর ছবির মধ্যেই।" সুনীতিকুমারের আঁকা ছবির মধ্যে অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির বিরোধিতা করে দৃপ্ত আত্মবিশ্বাসের সম্পূর্ণতা অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।

২

শিল্পী সুনীতিকুমার মনে-আত্মায়-ধ্যানে কী পরিমাণে শিল্প-মনস্ক এবং শিল্পাসক্ত ছিলেন—এবার তার পর্যালোচনা করা যেতে পারে। কাব্য-সংগীত ইত্যাদির অমৃত-আস্বাদনের মতো শিল্পাস্বাদনও যে আমাদের জীবনে অপূর্ব প্রাণ-প্রৈতি এনে দিতে পারে, এ বিষয়ে সচেতন আস্থার পরিচয় মেলে সুনীতিকুমারের স্বীকারোক্তিতে—"সংসারবৃক্ষে আমরা নূতন অমৃত ফলের অধিকারী হইব, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দীনতার মধ্যে নূতন সম্পদ আমরা পাইব।" এই নূতন সম্পদ উদ্ঘাটন ও তার মূল্যাবধারণার দায়িত্ব তিনি রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-পরিচালনার বিভাগীয় দায়িত্ব রূপেই নির্দেশ দিয়েছেন। ইতিহাসের বইয়ের মাধ্যমে ছবির সাহায্যে ছাত্রদের মধ্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিল্পধারার প্রত্যক্ষ পরিচিতি উদ্ঘাটিত করে দিতে তিনি প্রয়াসী। এই জাতীয় চিত্রময় বইয়ের প্রয়োজনীয়তা বিষয়েই তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন—"প্রায় ৩৮ বৎসর পূর্বে Smith সাহেবের প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস…তাহার কতকগুলি অতি মোটা রকমের কাঠে খোদা ছবি হইতে আমি অবিনশ্বর গ্রীক শিল্পের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই, Bury সাহেবের গ্রীক ইতিহাসের বড় বই…তাহাতে প্রকাশিত গ্রীক মুদ্রার কলমে-আঁকা ছবি হইতে গ্রীকমুদ্রার সৌন্দর্যে প্রথম আকৃষ্ট হই। ভারতের ইতিহাস বিষয়ে এ দুই বইয়ের মতো চিত্রময় বই তখন আমাদের কালে দুর্লভ কেন, অলভ্য ছিল; প্রাচীন ভারতীয় গৃহাদি, মুদ্রা, ভাস্কর্য-চিত্র প্রভৃতির নিদর্শন সমেত যদি কোনও সচিত্র বই তখন পাইতাম, কত না খুশী হইতাম।"

ইতিহাসের মধ্যে বাস্তব-সভ্যতার চর্চার পথকে তিনি চিত্র-সহযোগে উন্মোচিত করার পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। জ্ঞান-বর্ধন ছাড়াও এর মধ্য দিয়ে তরুণ মনে যথার্থ কৌতূহল সঞ্চার করে শিল্পানুরাগ উৎপন্ন করতে তিনি অভিলাষী ছিলেন। এই জাতীয় শিল্পানুরাগকে তিনি জীবনের উপযোগী পাথেয়ের শাশ্বত মূল্যে অভিষিক্ত করেছেন। শিল্পকে সংস্কৃতির প্রকাশ-মাধ্যম হিসেবে ব্যাখ্যা করে চিত্তপ্রসাদ বা আধ্যাত্মিক রসানন্দের ঊর্ধ্বে ঐতিহাসিক মহত্তর বোধের (Historic Consciousness) সমর্থক রূপে সুনীতিকুমার দেখতে অভিলাষী। ভারতীয় শিল্পের বিভিন্ন প্রান্তিক প্রকাশকে তিনি ইতিহাস বইয়ের সংচিত্রিত রূপের মধ্য দিয়ে পেতে চেয়েছেন—পাঠার্থীদের চোখ ও চিন্তাকে যুগপৎ উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। সুনীতিকুমারের সংগঠনশীল মন এ বিষয়ে আশাবাদী ধারণায় সোচ্চার—"ঐতিহাসিক ভূচিত্রাবলীর মতো, ঐতিহাসিক চিত্রাবলীর প্রচুর প্রয়োগ হওয়া উচিত। চলচ্চিত্র সহযোগে ইতিহাসকে ও ভূগোলকে দৃষ্টিগোচর করাইবার ব্যবস্থা, চিত্রচর্চারই সহায়ক হইবে। আশা করি এই কার্য ঐতিহাসিক ও শিল্পাশ্রয়ী উভয়ের সহযোগিতায় সহজসাধ্য হইবে—তখন যুগধর্মের এবং মানুষের আধ্যাত্মিক প্রেরণার প্রকাশরূপে, শিল্পের আলোচনা আরও ব্যাপক করিয়া, জীবনে আরও কার্যকর করিয়া তুলিবার সুযোগ মিলিবে।"

৩

শিল্পকলার চর্চাকে সুনীতিকুমার জীবনের অন্যতম প্রধান আনন্দ-রূপে গ্রহণ করেছিলেন—'ইহাকে আমার একটি ব্যসন বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি।' ভাষাশ্রিত সাহিত্য বা বাঙ্ময় ভিন্ন মানব সংস্কৃতির আরও কয়েকটি শিল্পকলাকে তিনি সংস্কৃতির অঙ্গীকৃত করেছেন—কেননা শুধুমাত্র বাঙ্ময়কে মুখ্য বলে ধরে নিলে সংস্কৃতির সামগ্রিক প্রতীতি ঘটে না। বাস্তুশিল্প, ভাস্কর্য ও চিত্রবিদ্যাকে তিনি মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির নেত্রগ্রাহ্য এবং স্থিতিশীল রূপময় প্রকাশ হিসেবে দেখেছেন। শিল্পকে তিনি 'রূপ বা নেত্র-গ্রাহ্য সৌন্দর্যের আভ্যন্তর আত্মা' হিসেবে প্রণতি জ্ঞাপন করেছেন—"ওঁ নমস্তে চিত্তে বিশ্বরূপাত্মকায়।" বাহিরের পরিদৃশ্যমান রূপ-জগৎ ও অন্তর্লীন অদৃশ্য মনোজগৎ এই দুইয়ের পারস্পরিক শক্তি—একদিকে রূপের অনুকৃতি, অপর দিকে রূপের মাধ্যমে অরূপের অভিব্যক্তির জন্যে মানুষকে শিল্প চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং আধিমানসিক জগতের মধ্যে কোন বিরোধ রূপশিল্পের যাথার্থ্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। সুনীতি-কুমার বলেছেন: "অনুকৃতি এবং অভিব্যক্তি—প্রতিস্পর্ধন ও প্রকাশ—এই দুইটি-ই শিল্পের মৌলিক বা মুখ্য প্রেরণা।" এই মৌল প্রেরণা দুটি অখণ্ড মানবজাতির মধ্যে এক—যদিচ বিভিন্ন দেশে-কালে পারিপার্শ্বিক স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা বর্তমান। উল্লিখিত দুই সমসূত্রের কারণে মানবমনের শিল্পময় প্রকাশ অখণ্ড। সার্থক শিল্প আচার্যের মতে তাই বিশ্বমানবের সম্পত্তি। তা 'মানবসমাজের কৃত্রিম জাতি বিভাগের উর্ধ্বে যেমন সাধারণ একটি মানবিকতা বিদ্যমান'—ঠিক তেমনি। শিল্পের প্রকাশভংগী নানা প্রকারের, কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিল্প রচনার মধ্যে এমন একটা সার্বজনীনতা বিদ্যমান, তার মুখ্য প্রাণ-বস্তু এক এবং দেশকালাতিগ—যে শ্রেষ্ঠ জাতীয় শিল্পকে কখনই পরস্পর-বিরোধী পর্যায়ে ফেলা চলে না।

অনুকৃতি এবং অভিব্যক্তির পরেই সুনীতিকুমার শিল্পের আবশ্যকতার বা প্রয়োজনবাদের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সকল যুগে সকল জাতির মধ্যে শিল্পের প্রয়োজন এক রূপ থাকে না। আদিম যুগে যে সম্মোহনী বা জাদুর প্রয়োজন শিল্পপ্রাণের সঙ্গে অন্বিত ছিল—পরবর্তীকালে মানুষের আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রসারের সংগে সংগে তা দেবপ্রতীকমূলক শিল্প-প্রয়াসে উন্নীত হল। আবার বর্তমানে সৌন্দর্য বোধের দ্বারা উদ্বোধিত অপার্থিব অনুভূতির সূক্ষ্ম চৈতন্য শিল্পের উদ্দেশ্য হিসেবে নির্দিষ্ট হচ্ছে। শিল্পকলার এই স্বরূপ-বিশ্লেষণে গবেষক সুনীতিকুমারের তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনাও দৃষ্টি আকর্ষণ করে—তিনি প্রসংগত হিন্দু, গ্রীক ও চীনা জাতির পৃথক মনোভংগী সত্ত্বেও রূপ-শিল্পকে মানবের প্রধান কৃতিত্বরূপে সাদরে বর্ণনা করার কথাও উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষে দৈনন্দিন জীবন থেকে শিল্পকে পৃথক করে দেখা হত না বলেই রূপ-শিল্পের পৃথক বিশ্লেষণে সমালোচক পণ্ডিত আবির্ভূত হননি। সুনীতিকুমারের ইতিহাসের মনীষা-মণ্ডিত রসানুভূতি দিয়ে শিল্প-চেতনার বিশ্লেষণ করেছেন—

"এই সহজ সৌন্দর্যবোধের স্রোতস্বতী আর্য ও অনার্য-নির্বিশেষে ভারতের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কখনও অবলুপ্ত হয় নাই। মুসলমান ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান তাহার মূর্তি বা রূপ-বিরোধী ভাব-সম্পুট ভারতে লইয়া আসিলেও রূপরসিক পারস্যের প্রভাবে ইতিপূর্বেই এই ধর্মের রূপ-বিরোধিতা অনেকটা খর্ব হইয়া গিয়াছিল বলিয়া তুর্কী, ঈরাণী ও অন্য বিদেশীয় মুসলমানের আগমনে এ-দেশের রূপ-শিল্পের ধ্বংস ঘটে নাই;—বরঞ্চ, পারস্যের মুসলমান সভ্যতার সহিত ভারতের হিন্দু-মনোভাবের আশ্চর্য সাহচর্য ঘটায়, ভারতে মোগল চিত্রকলার উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছিল।" শিল্পের উদ্দেশ্য বা আদর্শ বিষয়ে মানুষকে উন্নত ও উন্নীত করতে সুনীতিকুমার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বচন উদ্ধৃত করে বলেছেন—"শিল্পসমূহ আত্মসংস্কৃতির কারণ।"

বিংশ শতকের প্রারম্ভে বাঙালীর শিল্পবোধ এবং প্রয়াস যে নতুন পথ ধরেছিল——"সেক্ষেত্রে বাহিরের স্পর্শ কার্যকর হইয়াছিল", ভগিনী নিবেদিতা ও ঈ. বী. হ্যাভেল প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষীদের দ্বারা প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের চর্চা এবং প্রতি-স্পর্ধী ইউরোপীয়-রেনেসাঁস এবং গ্রীক শিল্পের পার্শ্বে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের গৌরবময় প্রতিষ্ঠা, ভারতের শিল্পীদের আর একবার অন্তর্মুখী হইতে উৎসাহ দিল; ...... ইহার ফলে আশার বাণী এবং কৃতকারিতার গৌরব লইয়া দেখা দিলেন শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ।" ভারতের শিল্পসাধনায় অবনীন্দ্রনাথের প্রতি সুনীতিকুমারের অত্যন্ত সশ্রদ্ধ মনোভাব ছিল। পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত "ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্ট" প্রকাশিত মুখপত্রের বিশেষ গোল্ডেন জুবিলী সংখ্যাতেও সুনীতিকুমার অবনীন্দ্রনাথের শিল্প মূল্যায়ন করে একটি বিশেষ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বিশ্বশিল্পসভায় নন্দলালের প্রসংগে তিনি বলেছেন—"একাধারে প্রাচীন শিল্পের প্রাণরস ও তাহার শক্তিটুকু আহরণ করিয়াছেন, এবং আধুনিক ভারতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ সত্যতম এবং সুন্দরতম রূপময় প্রকাশ করিয়াছেন।"

শিল্পী ও শিল্পরসিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর আত্মিক দৃষ্টি দ্বারা ভারতের সংগে বৃহত্তর ভারতের গভীরতর আত্মীয়তার সম্পর্ক আপন অন্তরে ধারণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেই গভীরতর চৈতন্যের মধ্য দিয়ে নতুন করে আমাদেরও আত্মাবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়েছে।

সুনীতিকুমারের সংস্কৃতি-চিন্তা

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

আচার্য সুনীতিকুমার ছিলেন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান মনীষী। ভাষাতত্ত্বের বহু বিচিত্র শাখায় ছিল তাঁর অনায়াস বিচরণ, ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা ও আলোচনায় তিনি অক্লান্ত। বহু ভাষাবিদ্ সুনীতিকুমারের O. D. B. L. গ্রন্থখানি একালের মানব-মনীষার এক কীর্তিভাস্বর সৃষ্টি। ভাষাবিজ্ঞানীরূপেই সুনীতিকুমারের প্রকৃত পরিচয়। এখানেই তাঁর প্রতিভার স্বক্ষেত্র। সুদীর্ঘকাল এই ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা, পড়াশোনা ও ভাবনার মধ্য দিয়ে তিনি একজন মননশীল প্রথম শ্রেণীর প্রাবন্ধিকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু জ্ঞানের এই বিশেষক্ষেত্রে বিচরণ যে তাঁর একটি স্বতন্ত্র মনোজগৎ রচনা করেছিল এবং চিন্তায় ও দৃষ্টিতে তিনি যে সকল সংকীর্ণ গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়ে গভীরতর অর্থেই মানব-প্রেমিক হয়ে উঠেছিলেন, একথাটা আমরা সব সময় ভেবে দেখি না। ভাষার আলোচনার সোপান অতিক্রম করেই তিনি জাতির ভাবনায় উপনীত হন। ফলে কোনো জাতির ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কেও তিনি অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। সুদূর অতীতে ভাষাগত ঐক্য তাঁর মনে বর্তমান বহু-ব্যবহিত জাতিগুলির ঐক্য ও মিলিতরূপের উজ্জ্বল চিত্র উপস্থাপিত করে। নিরন্তর সেই মিলিত বা অতিসন্নিহিত চিত্রের ধ্যান তাঁর মনের পরিধিকে সুবিস্তৃত করে। এই বাঙলাদেশের সন্তান সুনীতিকুমার ধীরে ধীরে তাই ভারত-সন্তানের গর্ব অনুভব করতে থাকেন, ও পরিশেষে বিশ্বমানব-সম্মিলনের চিন্তায় বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপিত হন। এই তথ্যটুকু মনে না রাখলে সুনীতিকুমারের বহু বক্তব্যকেই আমাদের ভুল বোঝার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের রচনামাত্রই নীরস, ভাষাতত্ত্বগন্ধী ও পাণ্ডিত্যকণ্টকিত এমন মনে করাও ভুল। মানবপ্রেমিক ভাষাবিজ্ঞানীরও একটা রস-দৃষ্টি ছিল, বহু প্রবন্ধের অংশ-বিশেষে সে পরিচয় স্পষ্ট। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে চিৎশক্তির প্রাধান্য থাকলেও হৃৎশক্তির স্পর্শও দুর্লভ নয়।[১] তাঁর নানা ধরণের প্রবন্ধের মধ্যে সংস্কৃতিবিষয়ক চিন্তা-ভাবনা একটা মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। অথবা এমনও বলা যায় যে তাঁর এই বিশেষ ভাবনাটির সূত্রেই বহু প্রবন্ধের জন্ম। আমরা এখানে তাঁর সংস্কৃতি সম্পর্কিত চিন্তা ও ধারণার কিছু পরিচয় দিতে চাই। বঙ্গসংস্কৃতি ও ভারত সংস্কৃতির ভাবনা কিভাবে তাঁকে বিশ্বমানব-সংস্কৃতির রাজ্যে নিয়ে যায়, আমাদের আলোচনায় তা লক্ষ্য করা যাবে।

ইংরেজি Culture শব্দের প্রতিশব্দ রূপে বাঙলা ভাষায় 'সংস্কৃতি' শব্দটি এখন বহুল ব্যবহৃত। কিন্তু শব্দটির প্রয়োগ-ইতিহাস আমাদের ভাষায় খুব বেশীদিনের

নয়। প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর ধরে শব্দটি ক্রমশঃ ব্যবহৃত হতে হতে এখন অত্যন্ত লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র অনেকদিন পূর্বেই তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব'-এর আলোচনায় Culture-এর প্রতিশব্দরূপে 'অনুশীলন' শব্দটির প্রয়োগ করেছিলেন। 'কৃষ্টি' শব্দটিও বঙ্কিমচন্দ্রের কিঞ্চিৎ পরবর্তীকাল থেকে চলছিল এবং আজও তা একেবারে অপ্রচলিত হয়নি। কিন্তু 'সংস্কৃতি' শব্দটির মতো এতখানি লোকপ্রিয়তা কোনো শব্দই অর্জন করেনি। Culture শব্দের চমৎকার প্রতিশব্দরূপে 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রয়োগের একটি ইতিহাস আছে। সে কথা অনেকেই আমরা জানি না কিংবা জেনেও কেউ কেউ স্বীকার করতে দ্বিধাগ্রস্ত।[২] এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধে[৩] সুনীতিকুমার নিজেই জানিয়েছেন যে Culture বা Civilisation অর্থে 'সংস্কৃতি' শব্দটি তিনি প্রথম পেয়েছিলেন প্যারিসে তাঁর এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। পরে সেখান থেকে দেশে ফিরে তিনি শব্দটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। Culture-এর এক সুন্দর প্রতিশব্দ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত খুশী হন এবং তাঁর সম্পূর্ণ অনুমোদন জ্ঞাপন করেন। সুপণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনও শব্দটিকে গ্রহণীয় বলে অভিমত দেন ও "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ"-এর শিল্পস্তুতি অংশটি উদ্ধৃত করে সেখানে কী অর্থে 'সংস্কৃতি' শব্দটি ব্যবহৃত, তা দেখিয়ে দেন। সেখানে আছে, "আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি। ছন্দোময়ং বা এতৈর্যমান আত্মানং সংস্কুরুতে।" অর্থাৎ এই শিল্প সমূহই হচ্ছে আত্মার সংস্কৃতি। এগুলির দ্বারা যজমান নিজেকে ছন্দোময় করে। জীবনকে ছন্দোময় করে তুলতে আত্মোৎকর্ষ-বিধানে বা আত্মসংস্কৃতিতে শিল্পের ভূমিকা কি, তা ঐ অংশে বিবৃত হয়েছে। জীবনের ছন্দোময়তা বা উৎকর্ষ-সূচক 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রয়োগ 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এ লক্ষ্য করে সুনীতিকুমার আশ্বস্ত হয়েছিলেন। ১৯২২ সালের অনেক পূর্ব থেকেই মারাঠী ভাষায় শব্দটি বহুল প্রচলিত হলেও আমাদের বাঙলা ভাষায় শব্দটি ১৯২২ এর পূর্বে কেউ ব্যবহার করে থাকলেও সুনীতিকুমারের তা চোখে পড়েনি।[৪] আমাদের বক্তব্য হল যে শব্দটি সুনীতিকুমারের সচেতনভাবে প্রয়োগ এই প্রথম এবং তাঁর প্রয়োগ ও রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনের ফলেই শব্দটির ধীরে ধীরে এমন জনপ্রিয়তা।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। Culture-এর প্রতিশব্দরূপে 'সংস্কৃতি' শব্দটি ব্যবহারের যৌক্তিকতা নিয়েও যে তিনি কতো চিন্তা করেছেন তাঁর 'সংস্কৃতি' প্রবন্ধ ও 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধেও তার প্রমাণ আছে। তিনি জানিয়েছেন যে লাতীন Cultura কুলতুরা শব্দ থেকে Culture এসেছে। লাতীনের কোল্ ধাতুর অর্থ কৃষ্‌, বা চাষ করা, যত্ন করা, পূজা করা। Culture-এর অনুরূপ শব্দ 'উৎকর্ষ সাধন' বা 'উৎকর্ষ' চলতে পারে। কিন্তু 'কৃষ্টি' শব্দটি বাঙলা ভাষায় Culture-এর প্রতিশব্দ হিসেবে বহুদিন ব্যবহৃত হলেও তিনি গ্রহণের পক্ষপাতী নন। টানা, লাঙ্গলটানা বা চাষ করা অর্থে কৃষ ধাতু থেকে জাত 'কৃষ্টি' শব্দটি। বৈদিক আর সংস্কৃত সাহিত্যে শব্দটির খুবই অর্থ-পরিবর্তন ঘটেছে। কৃষ্টির মূলগত অর্থ কর্ষণকার্য,

তা থেকে চাষ করা ক্ষেত, তা থেকে ক্ষেত্র, ভূমি দেশ এবং আরও পরে 'দেশের মানুষ', জাতি। বৈদিক ভাষায় 'কৃষ্টি' মানে জাতি।[৫] পরবর্তী সংস্কৃতে চাষ অর্থেই 'কৃষ্টি' শব্দটি মেলে, ইংরেজি Culture অর্থে নয়।[৬] কিছু কিছু বাঙালী মুসলমান লেখক 'সংস্কৃতির'[৭] পরিবর্তে আরবী 'তমদ্দুন' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। কিন্তু সুনীতিকুমার দেখিয়েছেন যে 'তমদ্দুন' শব্দটির মূলে আছে 'মদীনা' বা নগর। নগরকে কেন্দ্র করে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে, 'তমদ্দুন' তারই দ্যোতনা করে। Culture-এর প্রতিশব্দের ইতিহাস বিবৃত করেই সুনীতিকুমার নিরস্ত হননি। প্রকৃতপক্ষে এই বহুল প্রচলিত শব্দটি সম্পর্কে আমাদের ভাসাভাসা ধারণা থাকলেও এর সঠিক অর্থ কি এবং কি অর্থে বাঙলায় এখন আমরা শব্দটিকে প্রয়োগ করি সে সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট বোধ অনেকেরই নেই। সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, নৃ-বিজ্ঞান প্রভৃতি শব্দগুলির সঙ্গে আমরা খুবই পরিচিত, এগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে বলেই পৃথগ্‌ভাবে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়। অথচ একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য কোথায় তা বলা খুবই কঠিন। এই বিষয়ে সুনীতিকুমার কতো গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ-সীমানা কিরূপ নির্দেশ করেছিলেন, তা লক্ষ্য করা যেতে পারে।

সংস্কৃতে 'সভ্য' শব্দের মুখ্য অর্থ হল, 'যা সভার উপযুক্ত', 'যেখানে পাঁচজনে ভদ্রভাবে বা বন্ধুভাবে মিলিত হয়, সেখানকার উপযুক্ত'। আদি আর্য ভাষায় 'সভ্য' মানে 'কোনো গোষ্ঠীদলের মানুষ'। এ শব্দের ইন্দো-ইউরোপীয় প্রতিরূপ হল 'Sebhyos', এর থেকে এখন প্রায় অপ্রচলিত ইংরেজি শব্দ 'Sib' বা 'Sibling' অর্থাৎ 'আত্মীয়'। আর অনুরূপ জারমান শব্দ হল 'Sippe' অর্থাৎ 'জাতিগোষ্ঠী'। সুতরাং দেখা যায় সভ্য শব্দ মূলতঃ 'গোষ্ঠীসম্পৃক্ত' তারপর 'জনসমাগম সম্পৃক্ত', পরে ভদ্র, সংযত, সংস্কারযুক্ত, refined civilised প্রভৃতি অর্থ উদ্ভূত হয়। ইংরেজদের কাছে আমরা Civilised ও Uncivilised শব্দ দুটি গ্রহণ করে সংস্কৃত থেকে ঐ দুয়ের অনুরূপ 'সভ্য' আর 'অসভ্য' শব্দ নিয়েছি। তারপর এল নতুন দৃষ্টিতে মানুষ দেখার রীতি। মানুষের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষলাভের বিষয়টিকে আরও সূক্ষ্মভাবে দেখার প্রয়োজন হল। পার্থিব বা ভৌতিক সভ্যতা তো বহু জাতির মধ্যেই আছে। কিন্তু ক্রমশঃ উপলব্ধি করা গেল যে ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, সুসংবদ্ধ জীবনরীতি প্রভৃতির অতিরিক্ত আর একটা কিছু জাতির জীবনে পাওয়া যায়, যেটা তার বাহ্য সভ্যতার ভিতরের ব্যাপার। সেটা একদিকে বাইরের সভ্যতার আভ্যন্তর প্রাণ বা অনুপ্রেরণা আবার আর একদিকে তার বাহ্য সভ্যতার প্রকাশও বটে। সভ্যতার এই আভ্যন্তর অথচ বাইরেও প্রকাশমান অতিরিক্ত বস্তুটি ইংরেজি প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় ভাষায় Culture (জারমানে Kultur, কুলতুর)। তাই সুনীতিকুমারের সিদ্ধান্ত, 'একাধারে সভ্যতা-তরুর পুষ্প আর তার আভ্যন্তর প্রাণ বা মানসিক অনুপ্রেরণা যা, তাই হচ্ছে Culture'. 'ইতিহাস ও

সংস্কৃতি' নামক প্রবন্ধে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পার্থক্য দেখাতে গিয়ে তিনি আরও সংক্ষেপে বলেছেন,—"Civilisation বা সভ্যতা বলিলে আমরা ব্যাপকভাবে উৎকর্ষপ্রাপ্ত বা উন্নত মানবসমাজের বহিরঙ্গ—তাহার উন্নত জীবনযাত্রা পদ্ধতি, তাহার সামাজিক রীতি-নীতি, তাহার রাষ্ট্রনীতি, তাহার রূপশিল্প বাস্তুশিল্প, পূর্ত, সাধারণভাবে তাহার সাহিত্য ও ধর্ম এই সব বুঝি; এবং Culture বা সংস্কৃতি বলিতে তাহার উন্নত জীবনের অন্তরঙ্গ বস্তুগুলি তাহার আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন, তাহার সামাজিক জীবনের সৌন্দর্যময় প্রকাশ, তাহার সাহিত্য ও সৌন্দর্যবোধ, তাহার বাহ্যসভ্যতার আভ্যন্তর প্রাণবস্তু যাহা মুখ্যত তাহাই বুঝি। সভ্যতা তরুর মূল যেন সংস্কৃতি।"

বলা বাহুল্য সুনীতিকুমারের বক্তব্য খুবই স্বচ্ছ। উৎকর্ষপ্রাপ্ত বা উন্নত মানব সমাজের নানা বহিরঙ্গ দিকেই সভ্যতার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আর তার অন্তরঙ্গ দিকে যে Intellectual বা Spiritual জীবন, যে হৃদয়-মন ও আত্মিক জীবন, এমনকি তার সামাজিক জীবনের মধ্যেও যে সৌন্দর্যের প্রকাশ, তার সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধেও যে সৌন্দর্যবোধ তাকেই তিনি সূক্ষ্ম অর্থে সংস্কৃতি বলতে চান। আবার লাতীন 'Civis' শব্দের মূলগত অর্থ মনে রেখে তিনি সভ্যতাকে নগরাশ্রয়ীও বলেছেন। কিন্তু যেখানে কোনো জাতির বহুমুখী বৈশিষ্ট্য নগরকে কেন্দ্র না করে গ্রামকে অবলম্বন করেই মুখ্যতঃ প্রকাশিত, সেখানে সে-জাতির সভ্যতা না থাকলেও সংস্কৃতি থাকতে পারে কি? অন্য একটি প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন, তাতে এ প্রশ্নের উত্তর আছে। তিনি বলেছেন, "সভ্যতা বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, অর্থাৎ পার্থিব বস্তুনিষ্ঠ যান্ত্রিক সভ্যতা, যাহার ফলে বড় বড় বাড়ী-ঘর মন্দির-ইমারত, উচ্চকোটির শিল্প, সাহিত্য, নাট্য, দর্শন বিজ্ঞানের প্রসার প্রভৃতি তাহা কোলদের নাই; কিন্তু স্বকীয় প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে শান্তিতে ও মনের সুখে বাস করিবার উপযোগী মানস-সংস্কৃতি তাহাদের আছে, তদুপযোগী সাধনও তাহারা গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহাদের ভাষার সঙ্গে ও সমবেত জীবনের সঙ্গে এই সংস্কৃতি জড়িত।"[৮] সভ্যতা তার বাইরের লক্ষণ প্রকাশ করে নগরকে কেন্দ্র করে, কিন্তু যেখানে নগর গড়ে ওঠেনি, সেখানে তার আন্তর-লক্ষণ জাতির মনোজীবনেই দেখা দিতে পারে এবং তার জন্যও প্রয়োজন সাধন বা অনুশীলনের। এখানে সুনীতিকুমারের কথায় আমরা 'সভ্যতাতরুর পুষ্প'-কেই দেখছি—সভ্যতা-তরুকে দেখছি না—তরু দৃশ্যমান হওয়ার অনুকূল পরিবেশ পায়নি। বস্তুত সংস্কৃতিকে এই বিশিষ্ট অর্থে বা সূক্ষ্ম অর্থে প্রযোগের চেষ্টা পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিতই করেছেন। সকলের বক্তব্য এক নয়—কিন্তু মোটের ওপর অন্তরের ঐশ্বর্য তথা মানস-সম্পদকে বোঝানোর তাঁরা চেষ্টা করেছেন। 'What is civilisation' অর্থাৎ সভ্যতা কি তা বোঝাতে গিয়ে ক্লাইভ বেল যে মূল্যবান আলোচনা করেছেন, তাতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়নি বটে, কিন্তু সভ্যতার আন্তর-লক্ষণটিকে তিনি নানাভাবে

ধরবার চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন বিশ্বের সভ্য জাতির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে আত্মপরভেদজ্ঞান, সত্যভাষণ, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা, নারীর প্রতি সম্মান, ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস, নারীর সতীত্ব ও দেশপ্রীতি—এগুলির কোনটিই সভ্যতার লক্ষণ নয়। মূল্যবোধ (sense of value) ও বিচার-বুদ্ধিকেই তিনি সভ্যতার মূল লক্ষণ বলে মনে করেছেন এবং এই দুই লক্ষণ থেকে আরও যে-সব লক্ষণ দেখা দেয় তারও একটি তালিকা[৮ক] দিয়ে সেগুলিকে 'হৃদয়ের সরসতা' ও 'মনের উজ্জ্বলতা' এই দুটি শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেছেন। তাঁর আরও বক্তব্য হল যে সভ্যতা ব্যক্তি-মানসেরই সৃষ্টি, কয়েকজন ব্যক্তি এর স্রষ্টা এবং পরে তা বহুর মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সভ্যতার ভিতরের কথাটি ক্লাইভ বেল বলেছেন বলে, তা 'সংস্কৃতি'র দিকেই অঙ্গুলি সংকেত করে। জার্মাণ দার্শনিক অটোস্প্যাংলার তাঁর গ্রন্থ 'The Decline of the West' গ্রন্থে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন,—সভ্যতা হল একটি জাতির উৎকর্ষের একটি সুস্থির বা স্থিতিশীল পরিণতি, আর সংস্কৃতি হল ব্যক্তি বা জনসত্তার গতিশীল বিকাশ কামনা। দুয়ের মূলেই তিনি 'উৎকর্ষ'-কে লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু দুয়ের মধ্যে যে ভেদরেখা টেনেছেন তা সুনীতিকুমারের বক্তব্যকে সমর্থন করে না। 'Culture and Anarchy' নামক গ্রন্থে ম্যাথু আর্ণল্ড 'Culture'-এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার সঙ্গে সুনীতিকুমারের বক্তব্যের অনেকখানি ঐক্য আছে। তিনি বলেছেন "Culture is then properly described not as having its origin in curiosity, but as having its origin in the love of perfection, it is a study of perfection."[৮খ] আবার "The persuit of perfection, then is the persuit of sweetness and light ··· he who works for sweetness and light united, works to make reasons and the will of God prevail."[৮গ] এই Perfection বোঝাতে আর্ণল্ড বলেছেন যে এতে মানুষকে "হয়ে উঠতে হবে" এবং তা হবে "in an inward condition of the mind and spirit, not in outward set of circumstances."[৮ঘ] 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে ভারতীয় সংস্কৃতির কথায় সুনীতিকুমারও বলেছেন "Sweetness and Light" মাধুর্য ও জ্ঞানালোক আহরণ করে সংস্কৃতিকে প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করার কথা।

টি. এস. এলিয়টও সংস্কৃতি নিয়ে অনেক ভেবেছেন। তিনি ম্যাথু আর্ণল্ডের 'Perfection' কথাটিতে আপত্তি করেননি। তাঁর মতে Culture জীবনের বহুমুখী উৎকর্ষের ফল। তা ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করে সবটা ফুটে উঠতে পারে না—একটি সমগ্র সমাজে নানাশ্রেণীর মানুষ যে অবদান রেখে যাচ্ছে, তাতেই সমাজ হয়ে উঠছে cultured—'In the pattern of the society as a whole'-এ তিনি Culture সন্ধানী।[৯]

কিন্তু শুধু পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিতদের কথায় নয়; আমাদের 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে 'সংস্কৃতি' শব্দটি আত্মোৎকর্ষসূচক। ঋক্‌বেদে 'সংস্কার' শব্দটি আছে, সাম ও অথর্ব

বেদেও আছে—প্রথম যজুর্বেদে 'সংস্কৃতি' শব্দের প্রয়োগ আছে—কিন্তু সেখানে সংস্কার ও সংস্কৃতি শব্দে কোনো পার্থক্য নেই। হিন্দুশাস্ত্রে যে দশ-সংস্কারের কথা আছে সেই সংস্কার ও সংস্কৃতি শব্দের মধ্যে বৈদিক যুগে কোনো অর্থ-পার্থক্য ছিল না। সংস্কার বা সংস্কৃতি শব্দের মধ্যে একটা পবিচ্ছন্নতার ভাব আছে। এ যেন বিশুদ্ধীকরণ। শব্দটি সহজেই তাই উৎকর্ষসূচক হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'অনুশীলনতত্ত্ব'-এর ব্যাখ্যায় ম্যাথু আর্ণল্ড ও তাঁর বহু ব্যবহৃত ও ব্যাখ্যাত Culture শব্দটি স্মরণ করেছেন। অনুশীলনধর্ম বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "Culture বিলাতী জিনিস নহে। ইহা হিন্দুধর্মের সারাংশ।"[১০] সধবার পতিদেবতার উপাসনায়, বিধবার ব্রহ্মচর্যে, সমস্ত ব্রতনিয়মে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, যোগে, ব্রাহ্মণদের চতুরাশ্রমে অনুশীলনতত্ত্ব (culture) নিহিত বলে তিনি মনে করেছিলেন।[১০ক] অনুশীলন ধর্মের সারসংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন, তাতে cultured man বা সংস্কৃতিবান মানুষের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয়েছে।[১০খ] "জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্মাত্মতা এবং সুরসে রসিকতা, এই সকল হইলে তবে মানসিক সর্বাঙ্গীণ পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্বাঙ্গীণ পরিণতি আছে, অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ এবং সর্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই।"[১০গ] বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বের ব্যাখ্যায় আমাদের 'সংস্কৃতি' শব্দের বিশুদ্ধীকরণ বা উৎকর্ষ সাধন অর্থ যেমন রক্ষিত হয়েছে তেমনি পাশ্চাত্যের আর্ণল্ড-এর Perfection, Sweetness and Light এবং পার্কারের 'Fourfold Piety'র সঙ্গে গীতোক্ত ধর্ম ও পৌরাণিক শাস্ত্র বচনেরও অনেক প্রতিধ্বনি মিলছে। রবীন্দ্রনাথও 'সংস্কৃতি'কে একটু সীমিত অর্থেই 'চিত্তোৎকর্ষ' বোঝাতে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, "আধুনিক শিক্ষা থেকে একটা জিনিস কেমন করে স্খলিত হয়ে পড়েছে, সে হচ্ছে সংস্কৃতি। চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। সংস্কৃতি সমগ্র মানুষের চিত্তবৃত্তিকে গভীরতর স্তর থেকে সফল করতে থাকে। তার প্রভাবে মানুষ অন্তর থেকে স্বতই সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করে।"[১১] যাঁরা সুনীতিকুমারের পরে আমাদের বাঙলা ভাষায় 'সংস্কৃতি' নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের অনেকেই সুনীতিকুমারের বক্তব্য থেকে খুব দূরে যাননি। কেউ 'সংস্কৃতি'কে বলেছেন "চিত্তের উর্ধ্বায়ন",[১২] কেউ বলেছেন এ হল 'দৈনন্দিন জীবনাচরণের ভিতর দিয়ে সত্য ও সৌন্দর্যের প্রকাশ'।[১৩] যে বিশিষ্ট অর্থে সুনীতিকুমার বহুদিন পূর্বে এর একটা সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, আজকের দিনে অধিকাংশ রসিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি তার বিরোধিতা করেননি। এই প্রসঙ্গে সমাজতত্ত্ববিদ ও বস্তুবাদীদের মত একটু আলোচনা করা যেতে পারে। সমাজতাত্ত্বিকেরা বলেন, কোনো জাতির জীবনাচার মাত্রই জাতির সংস্কৃতি—মানুষের খাওয়া-দাওয়া চলা-ফেরা, আচার-আচরণ বেশভূষার বিশেষত্বই হচ্ছে তার সংস্কৃতি। কিন্তু এখানেও দেখতে হয় যে আপেক্ষিক-ভাবে সেই যুগ পরিবেশেও এই বিশেষত্ব উৎকর্ষসূচক কিনা—অন্ততঃ তাতে জীবনের

গভীরতর মানস-পরিচয় মুদ্রিত কিনা—জাতির স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও তার একটা সৌন্দর্যবোধ ব্যক্ত কিনা। তা না হলে বুঝতে হবে তার বিশিষ্টতাও অনুকরণাত্মক। সেইজন্য এঁদের বক্তব্যের সঙ্গে সুনীতিকুমারের বক্তব্যের খুব বেশী অমিল নেই। কিন্তু বস্তুবাদীদের মত সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থে পাশ্চাত্ত্যের মার্কসীয় দৃষ্টিকে মুখ্যতঃ অবলম্বন করে গোপাল হালদার 'সংস্কৃতি'র কথায় লিখেছেন, 'মানুষ হিসাবে মানুষের আসল পরিচয়ই তাহার সংস্কৃতি ; এই কৃতির বা কাজের বলেই মানুষ মানুষ হইয়াছে ; ......সংস্কৃতির মূলের কথা তাই জীবিকা-প্রয়াস, শ্রম-শক্তি ; আর সংস্কৃতির মোট অর্থ মানব-প্রকৃতির এই স্বরাজ-সাধনা।' এঁদের বক্তব্য হল জীবনসংগ্রামে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারে মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টাই তার সংস্কৃতি—জীবিকা-প্রয়াসকে সহজায়ত্ত করা সংস্কৃতির উদ্দেশ্য এবং জীবিকার প্রয়োজনে মানুষের অগ্রসরণের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিরও পরিবর্তন হয়। এই দৃষ্টিতে সংস্কৃতির তিনপ্রকার অবলম্বন—প্রথম জীবন-সংগ্রামের বাস্তব উপকরণ, দ্বিতীয় সমাজযাত্রার বাস্তব ব্যবস্থা আর শেষ পরিচয় তার মানস-সম্পদ। সংস্কৃতিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করে এঁরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন।[১৩ক] মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাসে সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ধীরে ধীরে তার ক্রমোন্নতির সমস্ত প্রয়াসকেই এঁরা সংস্কৃতি বলেন। সুনীতিকুমার যাকে সংস্কৃতি বলেন এরা তাকে সংস্কৃতির একটা অংশ বলেন—অর্থাৎ তা মানস-সংস্কৃতি। আমরা আগেই বলেছি সুনীতিকুমার একটি বিশিষ্ট সীমিত অর্থেই শব্দটিকে গ্রহণের পক্ষপাতী। সাধারণ মানুষের 'কৃতি'কে সুনীতিকুমার উপেক্ষা করেননি—কিন্তু সেই কৃতির মধ্যে তিনি মানুষের মনোজীবনের পরিচয়কেই অনুসন্ধান করতে চান। নইলে বাঙলার সংস্কৃতির আলোচনায় সাধারণ মানুষের সকল বৈশিষ্ট্যসূচক সব রকম সুন্দর কাজের কথা বলেন কেন ?

'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' নামক প্রবন্ধে ইতিহাস, নৃ-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি এই তিনের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েও সুনীতিকুমার যথেষ্ট চিন্তা করেছেন। তাঁর বক্তব্য হল অতীতকালের মানুষের কথা নিয়েই লেখা হয় 'ইতিহাস'। আবার নৃ-বিজ্ঞান নামক শাস্ত্রেও মানুষের উদ্ভব এবং প্রাচীনকালের মানুষের সভ্যতা ও সমাজের বিকাশের কথা আলোচিত হয়। শুধু তাই নয়। মানুষের মাঝখানে যা কিছু ঘটছে, মানুষ একা অথবা মিলিতভাবে যা কিছু করেছে বা করে চলেছে—সে সবই ব্যাপকভাবে নৃতত্ত্বের অন্তর্গত। মানুষের দেহ ও তার পরিবেশ অনুসারে তার প্রকৃতির আলোচনা, তার সমাজ ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রতত্ত্ব, শিল্প সংস্কৃতি ধর্মতত্ত্ব—প্রভৃতি মানবধর্মের প্রকাশের ক্ষেত্রে যা কিছু জগতে আছে—সমস্তই নৃতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। এই দৃষ্টিতে ইতিহাস ও সংস্কৃতি—দুইই নৃতত্ত্বের অন্তর্গত। তাই সুনীতিকুমার বলেন, "ইতিহাসের ক্ষেত্রে এখন একটু বেশ ব্যাপকভাবেই ধরা হয়—জাতির সর্বাঙ্গীণ সংস্কৃতি বিকাশের কথা তাহার ইতিহাসের মধ্যেই আজকাল গৃহীত হইয়া থাকে।......সমগ্র-

ভাবে জাতির লোকেদের প্রগতির আলোচনা, ইহাই হইতেছে সত্যকার ইতিহাস। কোনও জাতির বা মানবসমাজের ইতিহাস হইতেছে তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস।" সুনীতিকুমারের এই সংজ্ঞা থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় মানব-জীবনঘটিত সর্বাপেক্ষা বড় শাস্ত্র 'নৃতত্ত্ব'—আর এর অন্তর্গত হল 'ইতিহাস'। আবার এই ইতিহাসের অন্তর্গত হল তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি। তাঁর এই সংজ্ঞা থেকে আরও স্পষ্ট হয়, 'সংস্কৃতি' শব্দটির এলাকা নির্দেশ করে বিশিষ্ট অর্থে কেন তিনি একে গ্রহণ করতে চান।

সভ্যতা সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে এই পরিচয় মনে রেখে এখন লক্ষ্য করা যেতে পারে বঙ্গসংস্কৃতি ও ভারতসংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা কেমন। সুনীতিকুমার বঙ্গসংস্কৃতি ও ভারতসংস্কৃতির কথা (বিশেষত প্রাচীন ও মধ্যযুগের) বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করেছেন। কিন্তু কখনোই তিনি ভারতসংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র এক বঙ্গসংস্কৃতির কথায় মুখর নন। তিনি মনে করতেন ভারতের সমস্ত প্রদেশসুলভ একটা সাধারণ ভারতীয়ত্ব আছে, বাঙালীও তার অংশীদার। আমাদের (বাঙালীর) চেহারার মধ্যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ-লভ্য ভারতীয় বৈশিষ্ট্য একটা আছেই। সেইজন্যই তিনি বলেছেন, "ভারত হইতেছে সাধারণ, বাঙ্গালা হইতেছে বিশেষ।"[১৪] আকারে ও প্রকৃতিতে বাঙালীকে তিনি ভারতীয় ছাড়া অন্য কিছু মনে করতে পারতেন না। তাই অনেকদিন আগেই তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন—"বাঙালী তাহার আধুনিক সংস্কৃতিতে হয়তো চার আনা ইউরোপীয়, তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে সে কতটা ইউরোপীয় হইবে—এবং আট আনা ভারতীয়; বাকী চার আনায় সে বাঙালী এবং এই চার আনার মধ্যে সে বাঙালী এবং এই চার আনার মধ্যে আবার অনেকটা ভারতীয়ত্বের বাঙ্গালা বিকার মাত্র—বাকীটুকু খাঁটি বাঙ্গালী অর্থাৎ গ্রাম্য বাঙ্গালী।"[১৫] ভারতের অন্যান্য প্রদেশ যে এই বাঙলার ওপর অর্থনৈতিক শোষণ চালাচ্ছে, তা অবশ্যই রোধ করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে ভারতের সঙ্গে আমাদের আধ্যাত্মিক বা সাংস্কৃতিক যোগসূত্রকে ছিন্ন করার তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনকে তাই মৃদু কটাক্ষ করে তিনি বলেছিলেন বাঙালী পল্লীগাথার মহুয়া, মদিনা মহুয়ার চরিত্র নিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের গর্ব করার আছে, কিন্তু তাই বলে সমগ্র ভারতের সীতা-উমাকে বাদ দেওয়া যেতে পারে না। আদি আর্য ভাষাকে বাদ দিলে যেমন বাঙলা ভাষাই থাকে না, তেমনি সীতা-সাবিত্রীকে বাদ দিয়ে বাঙালীর সংস্কৃতির কথাও চিন্তা করা চলে না। প্রাক্ আর্য ভারত ও বাঙলার অধিবাসীদের পরিচয় তাদের বৈশিষ্ট্য, বহিরাগত আর্যের ভারতে আগমন, এদেশের প্রাচীন অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের মিশ্রণ ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে আর্য-হিন্দুর পত্তন, বাঙালী জাতির পত্তন ও তাদের পরিচয় এবং আরও পরে মুসলমান ও খ্রীস্টান পাশ্চাত্ত্য জাতির আগমনে সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ইঙ্গিত সুনীতিকুমার সুন্দরভাবেই

দিয়েছেন। 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থের নাম প্রবন্ধেই তিনি জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সংজ্ঞা দিয়ে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে চেয়েছেন। যে জনসমষ্টি বাঙলা ভাষাকে মাতৃভাষা বা ঘরোয়া ভাষারূপে ব্যবহার করে তারাই বাঙালী জাতি। দেশের জলবায়ু ও মৃত্তিকার উপযোগী বাঙ্গালাভাষাভাষী জনগণের বিশিষ্ট জীবনযাত্রা, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় ভাবধারায় সমৃদ্ধ হয়ে যে বাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যকে গড়ে তুলেছে তাকেই তিনি বলেন 'বঙ্গসংস্কৃতি'। দেশের জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থানগত জাতির বিশিষ্ট জীবনযাত্রাকে তিনি অস্বীকার করছেন না, কিন্তু বঙ্গসংস্কৃতির মূলে যে ভারতীয় সংস্কৃতির একটা অচ্ছেদ্য যোগ আছে সেকথা তিনি বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আবার 'সাহিত্যে'র পরিচয়ে তিনি বলেছেন, যে বঙ্গসংস্কৃতি বাঙলাভাষা সৃষ্টির কাল থেকে বাঙলাভাষায় লেখা 'যে সকল কাব্যে-কবিতায় ও অন্য সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাই বাঙ্গালা সাহিত্য'। আমরা পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, সুনীতিকুমার নৃবিজ্ঞান, ইতিহাস, সভ্যতা সংস্কৃতির সম্পর্ক কিরূপ তা বিশদ করেছিলেন। এখানে দেখা গেল, জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্বন্ধ।

সে যাই হোক, আর্যদের বাঙলা দেশে আসার আগে প্রাগৈতিহাসিক কালে যারা বাস করত, তাদের কথা দিয়ে তিনি জাতি-পরিচয় শুরু করেছেন। প্রাগার্য ভারতের অধিবাসী ও পরে আর্যদের আগমন সম্পর্কে যত মূল্যবান গ্রন্থ[১৬] লিখিত হয়েছে সেগুলি গভীরভাবে অনুশীলন করে তিনি স্বকীয় পথে সে যুগের একটি চিত্রও খাড়া করেছেন। এ দেশে প্রথম আসে Negrito বা নিগ্রোবটু জাতি। এরা ছিল 'কৃষ্ণবর্ণ হ্রস্বকায়', দীর্ঘকপাল উর্ণাকেশ পৃথুনাসিক উচ্চহনু স্থূলাধর'। স্থলপথে আফ্রিকা থেকে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে এরা আসে। আমাদের বঙ্গদেশে এদের কোনো চিহ্নই আর নেই, তবে আসামের নাগাদের মধ্যে এদের কিছু চিহ্ন এখনও বর্তমান। তবে এদের ভাষা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত। এর পরেই এল Proto-Australoid 'প্রাথমিক দাক্ষিণাকার' জাতি। এরা 'মধ্যমাকার শ্যামবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ, পৃথুনাসিক দীর্ঘ-কপাল জাতি। পশ্চিম এসিয়া থেকে এসেও সারা ভারতে এরা ছড়িয়ে পড়ে। এখানে বিশিষ্টতা অর্জন করে তারা অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেসিয়া, মেলানেসিয়া, পলিনেসিয়া প্রভৃতি স্থানে চলে যায় এবং এসব অঞ্চলের আধুনিক অধিবাসীরূপে পরিণত হয়। ভারতের প্রায় সকল নিম্নশ্রেণীর জনগণের মধ্যে এরা মিশে আছে—এদের ভাষা কি ছিল তা জানা যায় না, তবে অনুমান করা হয় কোল বা মুণ্ডাশ্রেণীর ভাষা তাদেরই ভাষার পরিণতি। এরাই Austric-ভাষী অস্ট্রিক জাতি, গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিশেষভাবে উপনিবিষ্ট হয়েছিল। এরাই ভারতে প্রথম কৃষিকার্য ও সুসংবদ্ধ সুসভ্য জীবনের পত্তন করে। ধান পান কলা লাউ বেগুনের চাষ ছিল এদের। নিগ্রোবটুদের সঙ্গে এদের রক্তগত মিশ্রণের ফলে কোল বা মুণ্ডাজাতির সৃষ্টি হয়। মানুষের মৃত্যুর পর তাদের আত্মার অস্তিত্বে এরা বিশ্বাস করত; পরবর্তীকালে হিন্দু জাতি সৃষ্টি হওয়ার পর তাদের পুন-

জন্মবাদ এদেরই চিন্তার পরিণতি। উত্তর ভারতে কৃষিমূলক একটা কৃষ্টি এরা গড়ে তোলে। এরা ছিল শান্ত, নিরীহ, সরল, কামুক, ভাবুক, কল্পনাশীল দায়িত্বহীন, কতকটা অলস, উৎসাহহীন দৃঢ়তাহীন ও সংহতিশক্তিতে দুর্বল। এদের মধ্যে উন্নত ও অনুন্নত দুই দল ছিল—অনুন্নতেরা বনে জঙ্গলে শিকার করত—প্রাচীন ভারতে এরাই নিষাদ, ভিল্ল, কোল্ল নামে খ্যাত ছিল—সাঁওতাল মুণ্ডা, হো শবর ভীল তাদেরই নানা শাখা। ভারতীয় বা বাঙালী হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ধান পান হলুদ সিন্দুর কলা সুপারি প্রভৃতির স্থান অস্ট্রিক প্রভাবেরই ফল। এরপর উত্তর পশ্চিম থেকে এল শ্যাম বা শ্বেতাভ-বর্ণ মধ্যমাকার দীর্ঘকপাল সরলনাসিক ভূমধ্যসাগরীয় জাতির লোক—দ্রমিড় বা দ্রাবিড় ভাষা এরাই ভারতে আনে। ভারতে এরাই দ্রাবিড়গোষ্ঠী নামে পরিচিত এবং এখানে তারা নাগরিক সভ্যতার পত্তন করে। এরা অস্ট্রিকদের থেকেও সভ্য ও সংঘবদ্ধ ছিল। মোহেন-জো-দড়ো ও হড়প্পার নাগরিক সভ্যতা এদেরই। এরা চাষ করত, যব ও গম ভারতের বাইরে থেকে এরাই আনে। এরা গো-পালন করত এবং শিব উমা বিষ্ণু শ্রী প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতা এদেরই। তাছাড়া যোগসাধনাও এদের অধ্যাত্ম-সাধনার পথ ছিল। এরা ছিল কর্মঠ, ভাবপ্রবণ, রহস্যবাদী আধ্যাত্মিক বিশ্বাসযুক্ত, শিল্পী ও সংঘশক্তিযুক্ত জাতি। ভারতের সর্বত্রই অস্ট্রিকদের সঙ্গে এদের মিশ্রণ ঘটে। গঙ্গার উপত্যকায় এই মিশ্রণ খুব বেশী হয়েছিল। এর পরই আসে পাশ্চাত্ত্য হ্রস্বকপাল জাতি।[১৭] এদের তিনটি শাখা এবং Nordic বা উদীচ্য নামে একটি জাতি আর্যভাষা নিয়ে ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের পরে ঈরাণ ও আফগানিস্থানের মধ্য দিয়ে এসিয়া মাইনর ও মেসোপোতামিয়া থেকে ভারতে আসে। পাশ্চাত্ত্য হ্রস্বকপাল জাতি ও উদীচ্য জাতির মধ্যে ভাষা এক হলেও জাতিগত পার্থক্য ছিল দুস্তর। অনুমান হয় যে উদীচ্যেরই ভাষা ছিল আর্য। উদীচ্যেরা ছিল 'দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ, ঋজুনাসিক হিরণ্যকেশ ও নীলচক্ষু'। বৈদিক সভ্যতা ধর্ম ও সাহিত্য এরাই এদেশে আনে। এই পাঁচ জাতিই এসেছিল পশ্চিম থেকে—পরে পূর্ব উত্তর ও থেকে আসে হিমালয় অতিক্রম করে Mongoloid বা মোঙ্গোলাকার জাতির মানুষ—এরা পীতবর্ণ পৃথুনাসিক উচ্চহনু সূক্ষ্মনেত্র, কৃষ্ণকেশ। য়াং-ৎসে কিয়াং নদীর উৎপত্তিস্থলে ছিল এদের আদিবাস। খ্রীঃ পূঃ প্রথম সহস্রকের মাঝামাঝি এরা ভারতে আসে, আর এখন থেকে দু হাজার বছর আগে এরা বাংলার উত্তর ও পূর্বসীমান্তে আসে। এরা প্রকৃতিতে প্রফুল্লচিত্ত, কর্মঠ, পরিশ্রমী ও কল্পনাবিহীন ছিল। চীনদেশে এরা বিরাট সভ্যতা গড়ে তুললেও এদেশে এদের দান নগণ্য। বঙ্গদেশে এরা অবশ্য অস্ট্রিক-দ্রাবিড়দের সঙ্গে মিশে গেছে। ভারতীয় জনগণের মধ্যে অস্ট্রিক দ্রাবিড় পাশ্চাত্ত্য হ্রস্বকপাল ও উদীচ্য বা আর্যজাতি এবং মোঙ্গলয়েড জাতির মিশ্রণ ঘটেছে। তাই সুনীতিকুমার বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—"ভারতবর্ষের সংস্কৃতি কয়েকটি বিভিন্ন এবং স্বতন্ত্র জাতির নিজ নিজ বিশিষ্ট সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফল।"

আর্যেরা সভ্যতায়, নগরগঠনে বাস্তুশিল্পে ও অন্যান্য শিল্পে খুব উন্নত ছিল না। কিন্তু তারা ছিল কল্পনাপ্রবণ ও কৃতকর্মা। 'তাদের সভ্যতা ছিল মুখ্যত যাযাবর ও অংশতঃ গ্রামীণ সভ্যতা' আর অস্ট্রিকজাতির সভ্যতা ছিল মুখ্যত গ্রামীণ। আর্য, দ্রাবিড় আর অস্ট্রিক—এই তিনজাতির মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান ও রক্তগত মিশ্রণ ঘটল। আর্যদের জোরালো ভাষা প্রতিষ্ঠালাভ করল। তাদের ধর্মের কতকগুলি অনুষ্ঠান ও তাদের কতকগুলি দেবতাকে অনার্যেরা মেনে নিল। তারপর ধীরে ধীরে অনার্যদের দেবতা, ধর্মানুষ্ঠান, দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞান ও সর্বোপরি ভক্তিবাদ আর্যদের আকৃষ্ট করল। অনার্য রাজা ও পুরোহিত আর্যভাষা গ্রহণ করলেই আর্যসমাজে তারা প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় দেবতাদের লীলাকথা, তাদের রাজা-রাজড়াদের কাহিনী ধীরে ধীরে সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হয়ে আর্যদের দেবকাহিনী ও রাজকাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণের মধ্যে স্থান পেল। আর্যদের বিশেষ উপাসনা ছিল 'হোম'। ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, অগ্নি, অশ্বিদ্বয় উষা, মরুদ্‌গণ প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে দুধ, ঘি, মাংস, রুটী, সোমরস প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য আহুতি দেওয়া হত আগুনের মাধ্যমে—কারণ অগ্নি দেবতাদের মুখপাত্র। কিন্তু পূজোর রীতি তাদের মধ্যে ছিল না—প্রতিমা বা দেবপ্রতীকের গায়ে ফুল, পাতা চন্দন সিন্দুর প্রভৃতি দেওয়া, চাল ফলমূলের নৈবেদ্য, বলিদানের পশুর মুণ্ড বা পাত্রে করে রক্ত নিবেদন করা—এ সবই অনার্য অনুষ্ঠান—কালক্রমে আর্য-অনুষ্ঠানে প্রবেশ করেছে। মোটকথা এইভাবে বিভিন্ন জাতির মিশ্রণে ভারতে হিন্দুসভ্যতার পত্তন হয়েছে।[১৮]

বাঙালাদেশে যখন ঐ আর্য এল তখন খাঁটি আর্য বলতে আর কিছুই নেই—তারা তখন অনার্যদের সঙ্গে মিশে মিশ্র হয়ে গেছে। মৌর্য বিজয় থেকে, খ্রীঃ পূঃ ৩০০ থেকে খ্রীঃ ৫০০ অর্থাৎ ৮০০ বছর ধরে বাঙলাদেশে আর্যীকরণ চলল। বাঙলাদেশেও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো যে সব অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতি বাস করত তারা ক্রমশঃ মগধের 'প্রাকৃত' ভাষা গ্রহণ করল ; উত্তরভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকার হিন্দুদের (অর্থাৎ মিশ্র হিন্দুদের) ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সভ্যতা ও ব্রাহ্মণ্য-ঐতিহ্য অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় লেখা উত্তর ভারতের আর্য-অনার্যের ইতিহাস ও পুরাণ বঙ্গদেশের অধিবাসীরা গ্রহণ করল। বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ এল, তাও এখানে গৃহীত হল। এইভাবে সভ্য অস্ট্রিক জাতি, দ্রাবিড় ও উত্তর ভারতের মিশ্র আর্য জাতি মিলে বাঙালী জাতির সৃষ্টি হল। আর্যভাষা বাঙালীকে disciplined করে তাকে একটা চরিত্র-বৈশিষ্ট্য দিল। বাঙালী জাতির গঠনকালে বাঙালীর নিজস্ব অনার্য-সংস্কৃতির দিকে তেমন দৃষ্টি পড়ল না[১৯]—যেন বাঙালীর মন, সমাজ, ঐতিহ্য রীতিনীতি শিল্প-সাহিত্যে সব কিছুই উত্তর ভারতের হিন্দু আদর্শের ছাঁচে ঢালাই করা হল। সুনীতিকুমারের কথায় "পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাঙ্গালী সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হইল, ইহার মূল সুর বাঁধা হইল"[২০]। এরপর তুর্কী আক্রমণ ও বিজয়ের ঝড় শুধু বাঙলাতেই নয় কাবুল থেকে বিহারেও বয়ে গেল। কিন্তু মুষ্টিমেয় তুর্কী বিজেতা ও তাদের পারসীক পাঠান ও পাঞ্জাবী

মুসলমানেরা কয়েক পুরুষের মধ্যে বাঙালী বনে গেল। তখন থেকেই বাঙালীর সঙ্গে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক সহযোগিতার সূত্রপাত। বাঙলাদেশে খাঁটি শারিয়তী বা কোরাণ-অনুসারী ইসলামধর্ম প্রচারিত তেমন হয়নি—এ ধর্ম অন্য কোনো ধর্মকে মেনে নেয় না। এদেশে ইসলামের সুফী মতই প্রসার লাভ করে। সুফীমতের ইসলামের সঙ্গে বাঙলার সংস্কৃতির মূল সুরের কোনো বিরোধ নেই। বাঙলায় প্রচলিত যোগমার্গ ও আরও কিছু কিছু আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের সঙ্গে সুফী মত রফা করে নিয়েছিল। সে যাই হোক এই ইসলামধর্মের পেছনে ছিল রাজশক্তি। তাই হিন্দুরা সচেতন না হয়ে পারলেন না। ব্রাহ্মণ তখন প্রধান চিন্তানেতা—বৈদ্য ও কায়স্থরা তার সহযোগী, বাঙলা ভাষা তখন লোকভাষা হয়ে উঠেছে—সুতরাং উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সাধারণের কাছে হিন্দুশাস্ত্রকে উন্মুক্ত করে দিতে চাইলেন। শুধু বাঙলায় নয়, সমস্ত উত্তর ভারতেই লোকভাষায় হিন্দুর ধর্ম প্রচারের সাড়া পড়ল। হিন্দী, মারাঠী, বাঙলা প্রভৃতি ভাষায় লেখা আমাদের সাহিত্যের মূল প্রেরণা এখানেই।

এই মুসলমান আক্রমণের পর বাঙালী যখন আত্মরক্ষায় উদ্যোগী হয়, তখন শুধু সাহিত্যই নয়, বাইরের রাজশক্তি ও ধর্মের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করারও স্বপ্ন দেখেছিল। ফলে এসেছিলেন মহারাজ দনুজমর্দন দেব—যিনি ছিলেন সমগ্র বাঙলার স্বাধীন হিন্দুরাজা—মুসলমান বিজয়ের পর উত্তর ভারতে কোনো হিন্দুরাজাই এ গৌরব লাভ করতে পারেননি। নিজ নামে দেশভাষায় তিনি মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন—এঁকে অনেকে কাঁশ বা কংশ মনে করেন—ইনিই ছিলেন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদের পৃষ্ঠপোষক। শিক্ষিত বাঙালী সেদিন সংস্কৃত ভাষার পুরাণগুলি অনুবাদ করেছিলেন। লোকভাষায় এবং স্থানীয় পুরাণ কথাগুলি মঙ্গলকাব্য আকারে প্রচারিত হয়েছিল, কথকতা এবং ভারত-পুরাণ পাঠ হিন্দু-সংস্কৃতি-প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হল; সংস্কৃত-বৌদ্ধ অনেক পণ্ডিত তুর্কী আক্রমণে নিহত হন, অনেকে পুঁথিপত্তর নিয়ে নেপালে বা পূর্ববঙ্গে চলে যান—তখন হিন্দুরাজা-অধ্যুষিত মিথিলার দিকে বাঙালী তাকায়; ন্যায় ও স্মৃতি পাঠের জন্যে বাঙালী সেখানে যায়—বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক শ্রেষ্ঠ পদ বাঙালী এদেশে নিয়ে আসে—বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষা বাঙালীর কণ্ঠে বদলে যায়—বাঙলা ও মৈথিল ভাষার মিশ্রণে কৃত্রিম ব্রজবুলি ভাষার সৃষ্টি হয়। দুদিক থেকেই বাঙালী পণ্ডিতেরা এদেশের সংস্কৃতিকে পুষ্ট করতে থাকে। সংস্কৃত বিদ্যার আশ্রয়ে মস্তিষ্ক এবং কাব্যকবিতার আশ্রয়ে হৃদয়ের সাধনা চলে। মুসলমান ভাবজগতের প্রতাপ ও আধিপত্যের প্রতিক্রিয়ায় শুধুই বাঙলা দেশে নয়, সারা ভারতে সহজ ভক্তিমার্গের অভ্যুদয় ঘটে। নামধর্মের প্রসার ও নামধর্মের বহু সাধক দেখা দেন। রামানন্দ কবীর প্রমুখ উত্তর ভারতের সন্তমার্গী সাধুগণ, বাঙলার শ্রীচৈতন্য ও পাঞ্জাবে গুরু নানক ও তাঁর শিষ্যদের অভ্যুত্থান হয়। সুতরাং বাঙলা দেশে শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ভক্তি ধর্ম নিয়ে আবির্ভাব একটা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়—উত্তর ভারতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তাঁর আবির্ভাব। চৈতন্যদেব সংস্কৃত-বিদ্যার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেননি।

তাঁর শিক্ষা ও জীবনী বাঙলা সংস্কৃতিতে কতকগুলি নতুন ধারার সৃষ্টি করে। শ্রীচৈতন্যকে আশ্রয় করে বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের সংস্কৃত ভাষার দার্শনিক বিচার, রসশাস্ত্র প্রণয়ন ও টীকা রচনা বাঙালী সংস্কৃতির অপরূপ সৃষ্টি। বাঙালীর বুদ্ধির প্রকাশ ঘটল নব্যন্যায় ও স্মৃতিবিষয়ক গ্রন্থ রচনায়, তন্ত্রশাস্ত্র রচনা ও সংকলনে ও রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীর পাণ্ডিত্যে। কীর্তন আর বৈষ্ণব পদাবলীতে ঘটল বাঙালীর হৃদয়ের প্রকাশ। ঘরমুখো বাঙালী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পদার্পণ করল —তার মনের সংকীর্ণতা কেটে গেল—ষোড়শ সপ্তদশ শতকে বাঙালী বৃহত্তর বঙ্গের প্রতিষ্ঠা করল। বাঙলার মধুসূদন সরস্বতী শংকরাচার্যের মতকে উত্তর ভারতে ছড়িয়ে দিলেন, বাঙলার বিদ্যাধর পণ্ডিত অষ্টাদশ শতকে জয়পুর নগর স্থাপনে সাহায্য করলেন, বাঙলার ঢাকাই মসলিনের ভারত ও ভারতের বাইরে নানা স্থানে চাহিদা বাড়ল, বাংলার বাঁশে তৈরী কুঁড়ে ঘরের বাঁকা, খাঁচা ও 'রেউটি' নামে রাজপুত-মোগল বাস্তু শিল্পেও স্থান পেল। উত্তর ভারতের লোকভাষা হিন্দী থেকে নাভাজী দাসের ভক্তমাল এবং মালিক মহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' বাঙলাভাষায় অনূদিত হল। সুনীতিকুমার মনে করেন বাঙালী সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল। যে মিশ্র আর্য বাঙলা দেশে এসে এদেশের অনার্যদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে, তাদের সংস্কৃতির বহু উপকরণ সে স্বাঙ্গীকৃত করেছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ধর্মপূজার কথা বলেছেন। এর অন্তর্নিহিত ভাবাবলী ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের কোনো যোগ নেই—এ একটি স্বতন্ত্র cult, এদেশে আদিম অস্ট্রিক জাতির মধ্যে যে ধর্ম প্রচলিত ছিল তারই ব্রাহ্মণানুমোদিত রূপান্তর এতে দেখা যায়। এই অস্ট্রিকদের ধর্মানুষ্ঠান পূজাপদ্ধতি ও বহু দেবতাদের বাঙালী-সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। সুফী মতবাদী ইসলাম ধর্মের কোমলতা, উদারতা, মানবতা, ঐহিকতা, যোগসাধনা বা অধ্যাত্ম সাধনাকেও নানাভাবে সে গ্রহণ করেছে। গত হাজার বছর ধরে বাঙলাদেশের সংস্কৃতি যে যে বস্তু, অনুষ্ঠান অথবা মনোভাবকে আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করেছে, তার যে তালিকা তিনি দিয়েছেন তা অত্যন্ত সুচিন্তিত ও মূল্যবান। বাঙালীর খাদ্যদ্রব্য, পরিধেয় পোশাক পরিচ্ছদ, নিজস্ব কৃষিশিল্প, তার হাতের নানা কাজ, বেত ও বাঁশের কাজ, কাষ্ঠশিল্প, চিত্রশিল্প পাথর ও ইটের ওপর নানা কাজ, মৃৎশিল্প, হাতীর দাঁতের কাজ, শাঁখ ও সোনার কাজ, রূপার তারের কাজ, স্বর্ণশিল্প, বাসন, পিতল, কাঁসা ও ইস্পাতের কাজ কোন্ কোন্ স্থানে বা অঞ্চলে একদা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল এবং কোন্ শিল্পগুলি এখন লুপ্ত তার একটি চমৎকার তালিকা তিনি দিয়েছেন।

তাঁর আলোচনায় বাঙালীর নানা অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতিরও একটা বিস্তৃত তালিকা আছে, আর আছে বাঙালীর মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির ইঙ্গিত।[২১]

তারপর অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে ও উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে এক অতি প্রবল সভ্যতা আর সংস্কৃতি নিয়ে এল ইংরেজ। তাদের বিশ্বগ্রাসী নাগরিক সভ্যতা বাঙলার গ্রামীণ সভ্যতাকে নাড়া দিল।[২২] উনিশ শতকের প্রায় তিনভাগ সময়

লেগে গেল এই নবাগত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। বাঙালী তথা ভারতবাসীর বড় সৌভাগ্য এই যে এই বোঝাপড়া করার গুরুদায়িত্ব নেবার জন্যে রামমোহনের আবির্ভাব হল। বাঙলা ও ভারতের সেই ঘোর দুর্দিনে সংস্কৃত ভাষায় লেখা প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতিকে নতুন করে আহ্বান করা হল; এই সংস্কৃতি সেই মহানিশায় বাঙালী ও ভারতকে রক্ষা করল। ইয়ং বেঙ্গলী হাওয়া ক্রমশঃ শান্ত হল— এলেন বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র। এঁরা ভারত-সংস্কৃতির মধ্যে যা শাশ্বত ও সার্বজনীন তাকে বর্জন করলেন না—সেগুলিকে আশ্রয় করে ইউরোপীয় সংস্কৃতির যা শ্রেষ্ঠবস্তু সেগুলি আত্মসাৎ করার জন্যে উপদেশ দিলেন। তাঁদের রচিত সাহিত্যের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পথ দেখা গেল। যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারত-সংস্কৃতি একটা নূতন পথ গ্রহণ করল, কিন্তু এদেশের মুসলমান সমাজ এই সাংস্কৃতিক মিলনের প্রচেষ্টা সম্পর্কে আগ্রহী ছিল না। ইংরেজদের ভাষা, শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতিকে তারা বর্জন করল। গৌরবময় অতীতকে স্মরণ করে ধর্মকে আশ্রয় করে তারা সংহত হতে থাকল। ওয়াহবী আন্দোলন দেখা দিলেও সিপাহী-বিদ্রোহের রক্তস্রোতে মোগল রাজপাটের স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে তোলার জন্য ইংরেজ সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে থাকল। ফলে এল হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। শরিয়তী আদর্শে বাঙালী মুসলমানকে প্রাণিত করা হতে থাকল, যা তাদের প্রাণের অনুকূল নয়। কিন্তু যদি তাই হয়, তাহলেও বাঙালী হিন্দু তার সঙ্গে একটা বোঝাপড় করবেই। কিন্তু-এইখানেই শেষ নয়। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে সুনীতিকুমার বাঙালীর সংস্কৃতিতে একটা শোচনীয় সংকট লক্ষ্য করেছিলেন। ক্রান্তিকারী মহাযুদ্ধ বাঙালীকে অনেকখানি বিপন্ন করলেও ১৯৪৩-এর (১৩৫০ বাঙলা সাল) দেশব্যাপী ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মতো তা মারাত্মক নয়। এতে হিন্দু বাঙালীর মধ্যবিত্ত কৃষক শিল্পী ও শ্রমজীবী শ্রেণীগুলি প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এর ফলে বাঙালীর সংস্কৃতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা অনিশ্চিত। তথাপি আশাবাদী সুনীতিকুমার জাতিকে আত্মস্থ হয়ে ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারা নিজেদের জীইয়ে তুলে পথ চলতে বলেছেন। 'জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য' গ্রন্থে উপস্থিত সংকটকালে তাঁর নির্দেশ আরও ভালভাবে আমরা লক্ষ্য করি। সেখানে তিনি বলেছেন যে বাঙালী হিন্দুর ঘরে এখন আগুন, রসচর্চায় মাতামাতি করা চলবে না, বাঙালীর জীবনে—ভিতরে ও বাইরে নানা সংগ্রাম দেখা দিয়েছে—এখন ব্যক্তিত্ব প্রসারের সময় নয়, সমাজ সংঘ ও জাতিকে ব্যষ্টির উর্ধ্বে স্থাপন করতে হবে। দেশকালের উপযোগী ভাবে নিজ জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি থেকে বিচ্যুত না হওয়াই কার্যকর রক্ষণশীলতা—আর তার জন্যে দরকার জ্ঞান, আলোচনা ও অনুশীলন। বাঙালীকে নূতন করে শ্রমী ও কর্মী হতে হবে—ভাবপ্রবণ জাতিরূপে পরিচয়টাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। মনে রাখতে হবে ভারতের আর পাঁচটি জাতির মতই একটি প্রধান জাতি সে। ভারতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে বাঙালীর

দানও অনেক—কিন্তু তাই বলে বাঙালীয়ানাকে নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি করাও এখন ঠিক নয়।

বলা বাহুল্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালীর সংস্কৃতিও, সুনীতিকুমারের আলোচনায় বোঝা গেল, এক মিশ্র সংস্কৃতি ; বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি এক বাঙালী হিন্দু-সংস্কৃতিকে এখানে গড়ে তুলেছে। মুসলমান ও ইংরেজদের আগমনে সে সংস্কৃতি কিভাবে বোঝাপড়া করে সজীব ও সচল থেকেছে তার ইতিবৃত্ত তিনি আমাদের শুনিয়েছেন। স্বাঙ্গীকরণ, বিরোধের মধ্যেও ঐক্য[২২ক] সমন্বয়সাধন[২২খ] এই মূল সূত্রটিকে তিনি বাঙালীর সংস্কৃতির ধারাবাহিক আলোচনায় অনুসরণ করেছেন। আর যে সমস্ত বস্তু অনুষ্ঠান ও মনোভাবকে আশ্রয় করে বাঙালীর সংস্কৃতির প্রকাশ, তার যে তালিকা দিয়েছেন তাতে বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য বা বিশিষ্টতা কোথায় তা দেখা যাচ্ছে। সুনীতিকুমারের ঐ তালিকা থেকে বাঙালী-সংস্কৃতির বহু লক্ষণ উদ্ধার করার অবকাশ আছে। তবে তিনি যে মূলসূত্রকে অনুসরণ করেছেন তা ভারত-সংস্কৃতিরই একটা মূল লক্ষণ—আর এইখানেই দুই সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কের নৈকট্য। আধুনিক কালে ইংরেজদের আগমনের পরে ও তাদের বিদায়ের পরেও তিনি যে যে বস্তু বা বিষয়কে অবলম্বন করে বাঙালীর সংস্কৃতি প্রকাশমান তারও উল্লেখ এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা না করে পারেননি। ব্রাহ্মধর্ম, হিন্দুধর্মের নবজাগরণ, আধুনিক বাঙালীর (উনিশ শতকের) সংস্কৃতচর্চা, সাহিত্য, নতুন শিল্পপদ্ধতি—ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের উদ্ধারচেষ্টা—অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল ও তাঁর শিষ্যগণ, রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বাঙলার সঙ্গীতের নতুন ধারা, রবীন্দ্রপ্রেরণায় শান্তিনিকেতনে ও অন্যত্র উদয়শঙ্করের দ্বারা নৃত্যকলায় ভারতীয় নতুন ধারা, সমাজ সংস্কার ও সংরক্ষণ প্রয়াস, রাজনৈতিক আন্দোলন ও ভারত মাতার কল্পনা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে পণ্ডিতদের নানা গবেষণা, প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক গবেষণা—এগুলির মধ্য দিয়ে বাঙালীর আধুনিক সংস্কৃতি উনিশ শতক থেকে বহমান।

প্রাচীন ভারতীয় ভাষা ও জাতিগুলির পরিচায়নের মধ্য দিয়ে সুনীতিকুমার দেখিয়েছেন যে বঙ্গসংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতির উদ্ভব-ইতিবৃত্ত প্রায় এক। ভারত সংস্কৃতির লক্ষণগুলি বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে কতকগুলি ভাবপুঞ্জের মধ্যেই এর মর্মকথাটি[২৩] ধরা যায়। হিন্দুসভ্যতার প্রথম থেকেই একটা সাংস্কৃতিক সূত্র প্রকট হয়েছিল, তা হল সমন্বয়। বিভিন্ন ধর্মমত বা বিচার একই সত্যে পৌঁছবার বিভিন্ন পথমাত্র—এই বোধ ভারতীয়দের মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হল। তাই পরমত-সহিষ্ণুতা ভারতীয় সংস্কৃতির সবচেয়ে প্রধান কথা। এর দ্বিতীয় কথা হল তত্ত্বানুসন্ধিৎসা। জীবনের অন্তরালে শাশ্বত সত্য বা সত্তার অনুসন্ধানই হল মানুষের প্রধান কাজ। আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ত্রীমন্ত্রের প্রার্থনায় একদিনে জগৎস্রষ্টার অনুধ্যান ('তৎ-সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি') ও অন্যদিকে তাঁরই দ্বারা আমাদের ধী-শক্তি চালিত হোক ('ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ')। এর তৃতীয় কথা হল অহিংসা। এর

পেছনে রয়েছে করুণা আর মৈত্রী, ন্যায়দৃষ্টি আর সহানুভূতি। ন্যায়দৃষ্টি থাকার জন্য ক্ষেত্র-বিশেষে হিংসার মূর্তিধারণেও বাধা নেই। এ ছাড়া ভারত-সংস্কৃতির আরও কতকগুলি লক্ষণ[২৫] আছে—যেমন দম বা আত্মদমন, ত্যাগ বা শাশ্বত সত্তার দিকে দৃষ্টি রেখে নশ্বর জগতের প্রতি উপেক্ষা, অপ্রমাদ অর্থাৎ বুদ্ধিকে প্রমত্ত বা ঘোলাটে না করা, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সত্য, শিব আর সুন্দরের আরাধনা। কিন্তু এর পরেই তিনি জানিয়েছেন, সংস্কৃতির সঙ্গে আছে জীবনের নিগূঢ় যোগ—সেইজন্য এর চরমরূপ চিরকালের জন্য বলা যায় না। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গতিশীল ব্যাপার। ভারত সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলামী সংস্কৃতির সংযোগের কথায় তিনি বলেছেন "ঝড়ের পরে মৃদু সমীরণের মতো সুফী মতবাদের আর ভারতীয় ভক্তিবাদের সমীকরণই হচ্ছে ভারতে ইসলামী আর হিন্দু সংস্কৃতির সংযোগ বা সংস্পর্শের কথা।" এই মিশ্র সংস্কৃতিতে আবার আধুনিক ইউরোপের স্থূল সূক্ষ্ম নানা ভাবধারা এসে মিশেছে—নানা রকম খ্রীস্টান মত ও সাধনা, জনসেবা নানা দার্শনিক মত আর সাহিত্যিক প্রকাশ নানা নতুন নতুন শিল্পসৃষ্টি, সম্পত্তিসাম্য প্রভৃতি নানা সমাজ সংস্কারের পরিকল্পনা।

ভারত সংস্কৃতির এইসব লক্ষণ বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল। এর ঔদার্য ও গভীরতা সুনীতিকুমারকে খুবই আশ্বস্ত করেছিল। এই ঔদার্যের জন্যই এই সংস্কৃতির প্রভাব বৃহত্তর ভারত বা দ্বীপময় ভারতে সঞ্চারিত হয়েছে। তাই তিনি 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৃহত্তর ভারত' প্রবন্ধে বলেছেন—'ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শন যেখানেই গিয়াছিল, সেখানেই ধ্বংস করিতে যায় নাই, গিয়াছিল পূর্ণতা আনিয়া দিতে।' 'ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ বিহার' প্রবন্ধে ও ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক যোগের কথাই সুনীতিকুমার চিন্তা করেছেন। 'হিন্দুধর্মের স্বরূপ' নামক প্রবন্ধেও তিনি হিন্দুধর্মের যে ছয়টি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন তার মধ্যে চতুর্থ বৈশিষ্ট্যটি হল 'বিশ্বাত্মানুভূতিমূলক' ও ষষ্ঠটি হল 'বিশ্বম্ভর'— এখানেই সেই ঔদার্য।

একদিকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপনা আলোচনা গবেষণায় বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সুদূর অতীতে ঐক্য, আবার ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনায় ও হিন্দু-ধর্মের চর্চায় এমন একটি বিশ্বাত্মীয়তাবোধের ভাব সুনীতিকুমার লক্ষ্য করেছিলেন যাতে তাঁর মন সকল ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে একটি বিশ্বমানব-সমাজের সঙ্গে নিত্য যোগ অনুভব করত। আবার বিশ্ব-মানব সভার বিশ্বপ্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তাঁকেও বিশ্বপ্রেমিকে পরিণত করেছিল। বহু পূর্বে লেখা রবীন্দ্রনাথের ভারত-ইতিহাস ও ভারত-সংস্কৃতি সম্পর্কে বক্তব্যের মিল সুনীতিকুমারের রচনায় লক্ষ্য করলে তাই বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই। সুনীতিকুমারের মনের রাজ্যে বিশ্বের তাবৎ বিভিন্ন দেশ ও জাতির দূরত্ব ছিল না। তাই বাঙালীয়ানা নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তিনি ক্ষুণ্ণ হতেন। ভারতকে বাদ দিয়ে বাঙলার অস্তিত্বের কথা তিনি ভাবতে পারতেন না। 'বৃহত্তর বঙ্গ'কে আধুনিককালে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসকে তিনি

অভিনন্দন জানাতে পারেননি।[২৬] 'বৃহত্তর বঙ্গ' প্রবন্ধে তিনি বাঙ্গালাদেশ, বাঙালী জাতি ও বাঙলার সংস্কৃতিকে ভারত, ভারতীয় জাতি ও ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্গত বলেই রায় দিয়েছেন, যদিও বাঙলার সংস্কৃতিতে লক্ষণীয় কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্যকে তিনি অস্বীকার করেননি।

কিন্তু বঙ্গ-সংস্কৃতিকে[২৭] ভারত-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই তিনি ক্ষান্ত হন নি—তাঁর লক্ষ্য ছিল আরও দূরে। 'সংস্কৃতি' নামক প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলেছেন, "আমাদের মৌলিক আদর্শ হওয়া চাই এক মৌলিক বিশ্বসংস্কৃতি, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী অনুসারে, বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্য ভাষা প্রভৃতির বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করে বহুরূপ হয়ে যা বিরাজ করবে, আর পৃথিবীর তাবৎ মানবজাতি বা মানব-সমাজকে তাদের সহজ সাধারণ মানবিকতার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত করে এক করে তুলবে।" 'হিন্দু আদর্শ ও বিশ্বমানব' প্রবন্ধেও তাঁর ঐ একই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। "পৃথিবীর সব দেশের সব জাতির মানুষ একই সার সত্যের পথে যাত্রী; এই যাত্রাপথে পরমত-সহিষ্ণু হিন্দু আদর্শ যতটা সহায়ক হইতে পারিবে, পরমতকে না বুঝিয়া তাহাকে 'নস্যাৎ' করিয়া বর্জন বা বিনাশ করিবার মতন আদর্শ বা মনোভাব ততটা পারিবে না;······Harmony বা সংগতির সাহায্যে, এক নূতন বিশ্বসংস্কৃতি গড়িয়া তুলিবার কথা সকল দেশের মনীষীরা চিন্তা করিতেছেন····· হিন্দু আদর্শ বিশ্বসংস্কৃতি গঠনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।"

সাধারণের কাছে দুরূহ ও নীরস ভাষাতত্ত্বের বিষয় সুনীতিকুমারের কাছে ছিল কতো আনন্দদায়ক। এই বিষয়ের গভীরে অবগাহন করে তিনি লাভ করলেন বিশাল পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে সাম্প্রতিককালে হারিয়ে যাওয়া ঐক্যতত্ত্বকে। উৎসাহী হলেন ভাষা ও জাতি-পরিচয়ে। সেই সঙ্গে জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতির চিন্তায় মগ্ন হলেন। জন্মভূমি থেকেই যাত্রা সুরু হল—দেখলেন জন্মভূমি ও ভারতভূমিতে কোনো পার্থক্য নেই। তখন ভারতের সংস্কৃতি প্রবলভাবে তাঁর চিত্তকে নাড়া দিল—তিনি ভারতভূমিকে আশ্রয় করে বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিভাবে সর্বমানবের মিলন ভূমি রচিত হতে পারে তার ইঙ্গিত করলেন। ভাষাচার্য সুনীতিকুমারকে প্রণাম।

পাদটীকা:

১. সুনীতিকুমার প্রায়ই বলতেন, 'আমি ভাষাতত্ত্বের কারবারী, সাহিত্যরস বা কাব্যরসের রসিক নই, তবে কেউ যদি কাব্যের রসলোকের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেন, তখন মহা উৎসাহে সে-রাজ্যে যেতে পারি।' (দ্বারভাঙ্গা হলে মোহিতলালের স্মরণসভায় সভাপতির ভাষণ)

২. সংস্কৃতির রূপান্তর গ্রন্থের (৩য় সং ১৯৪৯ গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠায় সুসাহিত্যিক গোপাল হালদার বলেছেন পাদটীকায়, "যতদূর জানি শব্দটি নূতন গঠিত। ইহার বয়স পঁচিশ বৎসরের বেশী নয়।" তাঁর হিসেব অনুযায়ী শব্দটির প্রয়োগ ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে। মোট কথা সুনীতিকুমারের প্রদত্ত তারিখই এতে সমর্থিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাদটীকায় সুনীতিকুমারের নাম উল্লেখ করেননি।

৩. 'সংস্কৃতি-শিল্প-ইতিহাস' গ্রন্থে 'সংস্কৃতি' প্রবন্ধ।

৪. মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বাংলা ১৩২৮-৩১ সালে 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় 'বাংলার নবযুগের কথা' নামে ১৬টি প্রবন্ধ লেখেন। তারমধ্যে ১৩২৮এ লিখিত ইং ১৯২১এ 'প্রথম কথা—বাংলার বৈশিষ্ট্য'এ ৩ পৃষ্ঠায় 'এক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত' বাক্যাংশটি ব্যবহার করেন। অবশ্য তিনি culture এর বদলে 'বৈশিষ্ট্য ও সাধনা' কথা দুটি বেশী ব্যবহার করেছেন। 'সংস্কৃতি' কথাটি যে তাঁর প্রিয় ছিল না, তা বেশ বোঝা যায়।

৫. ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল ৪র্থ সূক্তেই 'কৃষ্টয়ঃ' শব্দটি আছে। সায়ণ এর অর্থ করেছেন—'মনুষ্যা অস্মিন্মিত্রভূতাঃ' কৃষ ধাতুর অর্থ চাষ করা এবং আর্যরা ছিলেন কৃষিজীবী তাই কৃষ্টয়ঃ অর্থে মনুষ্য। কিন্তু ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি' ১ম ভাগ-এ বলা হয়েছে—কৃষ্টি শব্দের মূল বৈদিক অর্থ ছিল 'সমুদায় কৃষক দল'।

৬. সুনীতিকুমারের ছাত্র অধ্যাপক দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখিয়ে ছিলেন যে বৌদ্ধ সংস্কৃতে সভ্যতা বা সংস্কৃতি অর্থে 'কৃষ্টি' শব্দের প্রয়োগ ছিল।

৭. ঋক্ সাম যজুর্বেদ সংস্কৃত ও সংস্কৃতি দুটি একই অর্থবহ; সংস্কৃতি' শব্দটি প্রথম যজুর্বেদে পাই। সপ্তম অধ্যায় মন্ত্র ১৪তে—'সা প্রথমা সংস্কৃতির্বিশ্ব দ্বারা স প্রথমো বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ।"—এখানে 'সোম-সংস্কার' অর্থে ব্যবহৃত সংস্কৃতি শব্দটি।

৮. বিশ্বভারতী পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ কার্তিক—পৌষ, ১৩৫৩ 'কোলজাতির সংস্কৃতি', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৮ক. সত্য-সুন্দরের উপাসনা, পরমত-সহিষ্ণুতা, ভাল-মন্দ, বিচারের সূক্ষ্মতা, শিষ্টাচার, রসিকতা, অনুসন্ধিৎসা, কুসংস্কারমুক্তি, আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীন শিক্ষালাভের আগ্রহ, ভোগবস্তুর প্রতি বিরাগহীনতা প্রভৃতি।

৮খ. 'Anarchy and Culture', Chap. I, Sweetness and Light, page 45.

৮গ. ঐ Page 69.

৮ঘ. ঐ Page 68.

৯. T. S. Eliot-এর Selected Prose গ্রন্থের Defination of Culture. Page 245.

১০. ধর্মতত্ত্ব, প্রথম অধ্যায়ে গুরুর উক্তি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১০ক কৃষ্ণচরিত্র। এর উপক্রমণিকায় বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলেছেন, "(১) মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব। (২) তাহাই মানুষের ধর্ম। (৩) সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য (৪) তাহাই সুখ।"

১০খ. শারীরিকী, কার্যকারিণী. জ্ঞানার্জনী ও চিত্তরঞ্জিনী—এই চার বৃত্তির সুসমঞ্জস ও পূর্ণ স্ফূর্তি যে কোনো মানুষে সম্ভব নয় একথাও বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়ে বলেছেন যে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রেই তা সম্ভব হয়েছিল। তবু মানুষকে এই আদর্শ মনে রাখতে হবে। পরবর্তীকালে টি. এস. এলিয়ট বলেন "We shall come to infer that the wholly cultured individual is a Phantasm'—যেন অনেকখানি বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়।

১০গ. তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের এই cultured man এর সংজ্ঞা সাধারণ ভাবেই গ্রহণ করতে হবে।

১১. 'শিক্ষা' গ্রন্থের শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রবন্ধ, পৃঃ ৬৯৮ রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্ম-শতবার্ষিক সং।

১২ 'নিরীক্ষা' গ্রন্থের 'সংস্কৃতি' প্রবন্ধ—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

১৩. বিশ্ববিদ্যা গ্রন্থমালার 'প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন' গ্রন্থে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

১৩ক, J. Dover Wilson আর্নল্ডের 'Culture and Anarchy' গ্রন্থে তাঁকে একটু কটাক্ষ করে বলেছেন, যে সহানুভূতির একটু অভাবের জন্য আর্নল্ড দেখতে পাননি আরও এক রকম culture আছে। "It is the culture that springs from the common life of the people, the culture which means cultivation of the ordinary soil of the human spirit."(Page XXXVI)

১৪. জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য গ্রন্থের নাম প্রবন্ধ।

১৫. তদেব।

১৬. সুনীতিকুমার প্রাগৈতিহাসিক যুগের বা আর্য-পূর্বযুগের ভারত ও বঙ্গের অধিবাসীদের পরিচয় দিতে গিয়ে শরৎচন্দ্র রায়, Verrier Elwin, আমরাও হিবলে, W.G. Archer এবং বিশেষ করে নৃতত্ত্ববিদ ডাক্তার বিরজাশঙ্কর গুহ প্রভৃতি লেখকদের গ্রন্থ থেকে অন্তের উপাদান গ্রহণ করেছেন।

১৭. 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' গ্রন্থে বা অন্য অনেক প্রবন্ধে সুনীতিকুমার বিভিন্ন জাতির দেহ-গঠনের কথা বিশেষ বলেননি—এবং পাশ্চাত্ত্য হ্রস্বকপাল ও উদীচ্যদের কথাও বলেননি। বিরজাশঙ্করের 'The Racial Elements in the Indian Population' নামক ক্ষুদ্র পুস্তক অবলম্বনে পরে এই বিভাগ করেছেন।

১৮. 'ভারত সংস্কৃতি' গ্রন্থের 'হিন্দু সভ্যতার পত্তন' প্রবন্ধ।

১৯. যাঁরা বাঙলার লোক-সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন, তাঁরা কিন্তু বাঙালীর ঐ নিজস্ব অনার্য সংস্কৃতিটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং কালে কালে নানা সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করে ও কিভাবে তার ধারা প্রবহমান তা দেখাতে চেষ্টা করেন।

দ্রঃ 'বাংলার লোকসংস্কৃতি' প্রবন্ধ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য—সম্পাদিত ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ ১৯৭৫ জুন।

২০. 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' গ্রন্থের নাম প্রবন্ধ।

২১. 'বাঙালীর বিশিষ্টতা' প্রবন্ধে বাঙালী-কৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিভিন্ন বিষয়ে বাঙালীর বিশিষ্টতার উল্লেখ করেছিলেন। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেও সমষ্টির সঙ্গে যোগযুক্ত থাকার ভারতীয় প্রকৃতিকে নির্দেশ করে বাঙলার সমন্বয় সাধন, মানবতা-সাধন ও স্বাধীন চিন্তা এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার একটু বেশী রকম বাঙালীয়ানার কথায় মুখর হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন এঁরা দুজনেই ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙলার যোগসূত্রের কথা মনে রেখেও বাঙালীর বিশিষ্ট সাধনার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছিলেন।

২২. রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালান্তর' গ্রন্থের কালান্তর প্রবন্ধেও মুসলমান ও ইংরেজদের বাঙালী-চিত্তের সংস্রবের অপরূপ মূল্যায়ন করেছেন। মুসলমান-সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্পর্শে বাঙালী-হিন্দুর চিত্তোন্নতির বিষয়টিকে তিনি মোটেই গুরুত্ব দেননি।

২২ক. রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এই বৈচিত্র্যের মধ্যে সুরসংগতির (harmony) সাধনাই হল ভারতের বিশেষ সাধনা।" (বাংলার সাধনা—ক্ষিতিমোহন সেন 'নিবেদন')

২২খ. কবীর ভারতীয় সাধনাকে সমন্বয় সাধনাই বলেছেন এবং তাই এর নাম দিয়েছেন "ভারতপন্থ" (বাংলার সাধনা—ক্ষিতিমোহন সেন পৃঃ ১৮) আর এখানেই বাংলা ও ভারতের ঐক্য।

২৩. 'সংস্কৃতি' প্রবন্ধ।

২৪. ক্ষিতিমোহন সেন একে হিন্দুধর্ম না বলে ভারতবাসীর জন্মভূমির ভৌগোলিক নামে একে 'ভারতীয় ধর্ম' বলতে চান। 'ভারতের সংস্কৃতি'—বিশ্ববিদ্যা গ্রন্থমালা পৃঃ ৬।

২৫. 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে সুনীতিকুমার বলেছেন যে দু'হাজার বছর আগে শিক্ষিত এক গ্রীক ভাগবত ধর্মের তিনটি দিকে আকৃষ্ট হয়ে অনুশাসনে যা লিখে গেছেন তা হল আত্মদমন, নিঃস্পৃহতা ও শুভবুদ্ধিকে পরিহার না করা। এই গ্রীক পণ্ডিত হচ্ছেন হেলিওদোর।

২৬. এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—"'বৃহত্তর বঙ্গ বৃহত্তর বঙ্গ বলিয়া চীৎকার করিয়া কোনও লাভ নাই। ইংরেজদের Middleman হইয়া ইহাদের ফড়িয়াগিরি করিয়া যে বৃহত্তর বঙ্গের প্রতিষ্ঠা, তাহার কোনও স্থায়ীফল দেখা যাইতেছে না।" পৃঃ ১০৯

২৭. সুনীতিকুমারের পরবর্তীকালে বঙ্গসংস্কৃতি সম্পর্কে অনেকেই মূল্যবান আলোচনা করেছেন। সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব উভয় দিক থেকে আমাদের বাঙলা ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ চর্যাগীতিকার মূল্যায়ন করেছেন ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য। আবার 'বঙ্গ-সংস্কৃতি বৈচিত্র্য ও ঐক্য' এই নামে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গ সস্কৃতি সম্পর্কে অতিবিস্তৃত আলোচনা করেছেন ডঃ অসিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আধুনিক কালে 'বঙ্গসংস্কৃতিতে রঙ্গমঞ্চের ভূমিকা' নিয়েও একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন ডঃ অজিতকুমার ঘোষ। বাঙলার প্রবহমান লোকসংস্কৃতি কিভাবে কালে কালে উচ্চকোটির সংস্কৃতির দ্বারা পুষ্ট হয়েছে, বিশেষত ছৌ-নৃত্যে, তা চমৎকার দেখিয়ে দিয়েছেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। বাঙলার শব্দভাণ্ডারে ইংরাজি ভাষার প্রচণ্ড প্রভাব, বাংলার সঙ্গীত চিন্তা, রবীন্দ্রসংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়েও ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক ভাস্কর মিত্র, ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ প্রভৃতি চিন্তাপূর্ণ ও মৌলিক আলোচনা করেছেন। দ্রঃ 'বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য' ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ সম্পাদিত জুন ১৯৭৫।

জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও সুনীতিকুমার

১.

সেটা বোধ হয় ১৯৩৩-৩৪ সালের কথা। তখন আমরা স্কুলের নিম্নের সোপান আঁকড়াইয়া আছি, বয়স বারো-তেরোর বেশী নহে। আমাদের অগ্রজেরা আই. এ. পাস করিয়া বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হইয়াছেন। তাঁহাদের কথাবার্তা হইতে আমরা কলেজ-জীবনের বিচিত্র মুক্তির স্বাদ পাইতাম। ভাবিতাম, কবে সেই বাঞ্ছিত ধামে প্রবেশাধিকার পাইব।

একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। বৈঠকখানায় আমাদের অগ্রজেরা ঘনীভূত হইয়া বসিয়া কী যেন একটা ব্যাপার লইয়া চাপা উত্তেজিত স্বরে আলাপ করিতেছেন। তাঁহারা বি. এ. ক্লাসে ক্লাসিকাল বেঙ্গলি (এখনকার ইলেকটিভ বাংলা) লইয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ যেন তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতেছে, এইরূপ একটা ভাবে ভাবিত হইয়া তাঁহারা বৈষ্ণব পদাবলী, কবিকঙ্কণ, মৈয়মনসিংহ গীতিকা, মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ লইয়া বিজ্ঞের মতো আলোচনা করিতেন। একদিন নাকি কী একটা বিষয় লইয়া বাংলার অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সহিত তাঁহাদের একহাত কথা-কাটাকাটি হইয়া গিয়াছিল। সেদিন আমাদের বৈঠকখানায় তাহারই জের চলিতেছিল। ক্লাসে বাংলা ভাষার ইতিহাস পড়াইতে গিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় বেশ জোরের সঙ্গে রায় দিয়াছিলেন—প্রয়াগের পূর্বপ্রান্তে কাহারও শরীরে আর্য রক্তের ছিটেফোঁটাও নাই, বাঙালীর তো নাই-ই। এই ব্যাপারে আমাদের দাদাদের ব্রাহ্মণত্বে বিলক্ষণ আঘাত লাগিয়াছিল। তাঁহাদের একজন ক্লাসের মধ্যে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অধ্যাপকের মন্তব্যের মৃদু প্রতিবাদ করেন এবং আদিশূরের দোহাই পাড়িয়া ভক্তিভাজন অধ্যাপক মহাশয়কে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, অব্রাহ্মণ সম্পর্কে তাঁহার সিদ্ধান্ত ঠিক হইলেও হইতে পারে, কিন্তু বাঙালী ব্রাহ্মণদের শিরাধমনীতে আর্য-শোণিত বহিতেছে না, নৈকষ্যকুলীন ব্রাহ্মণসন্তানগণ, যাঁহারা এতদিন শাণ্ডিল্য-কশ্যপ-ভরদ্বাজের খুঁট ধরিয়া সযত্নে আর্যত্বের উত্তরীয় বহন করিতেছিলেন, তাঁহারা কোন্ প্রাণে এ-সমস্ত অশাস্ত্রীয় কথা হজম করিবেন? যাহা হউক, তাঁহারা একগুঁয়ে অধ্যাপককে টলাইতে পারিলেন না। রবীন্দ্রনাথের 'তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত' বা খেতুরী উৎসবে নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র যাহা বলিয়া ("হৃদে যার পৈতা আছে সেই তো ব্রাহ্মণ") কায়স্থসন্তান নরোত্তমকে ব্রাহ্মণের পংক্তিতে বসাইয়া দিয়াছিলেন, সে সমস্ত ঐতিহাসিক উক্তিতে তাঁহাদের হৃদয়ের ব্যথা ঘুচিল না। সে দিন তাই তাঁহারা বৈঠকখানায় বসিয়া পূজনীয় অধ্যাপকের মতামতের কঠোর সমালোচনা করিতে-ছিলেন। একজন বলিলেন যে, কায়স্থ বিদ্যাভূষণের স্বাভাবিক ব্রাহ্মণবিদ্বেষই ঐরূপ সাংঘাতিক মন্তব্য প্রকাশের দুঃসাহস জোগাইয়াছে। কারণ পঞ্চকায়স্থ পঞ্চব্রাহ্মণের

তল্পি বহন করিয়া কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ভূমিতে হাজির হন, সে হীনমন্যতা বিদ্যাভূষণ বোধহয় আজও ভুলিতে পারেন নাই। দাদারা সিদ্ধান্ত করিলেন, কোথা হইতে এমন অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে যাহাতে বাঙালী, বিশেষতঃ বাঙালী ব্রাহ্মণেরা যে অরাণ্যক ঋষিদের সাক্ষাৎ বংশাবতংস তাহা সহজেই স্বিরীকৃত হইবে, এবং তাহা হইলেই বিদ্যাভূষণের 'ঘোষযাত্রা' (অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 'ঘোষ' উপাধিক কায়স্থ) হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িবে—সেই সঙ্গে তিনিও। তখন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ODBL ছাপাইয়া বিদ্বৎমহলে খুবই পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, নানা সাময়িকপত্রে ইংরেজী ও বাংলায় ভাষাতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব বিষয়ক তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং আমাদের ব্রাহ্মণ-বটু দাদারা তাঁহার বিশাল গ্রন্থের দুইখণ্ড আনাইয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেন কোথাও বাঙালী ব্রাহ্মণের খাঁটি আর্যত্ব সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত আছে কিনা। তাঁহাদের মুখের অবস্থা দেখিয়া আমরা, বালকেরা বুঝিলাম এ সঙ্কট হইতে সুনীতিকুমার তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। কথাটা সেই বালকবয়সেই মনে গাঁথিয়া গিয়াছিল। হা হতোঽস্মি, আমরা তাহা হইলে আর্যসন্তান নহি? এই যে কুস্তির আখড়ায় গিয়া ডন বৈঠক দিয়া গুড়-আদা সহযোগে ভিজানো ছোলা চিবাইয়া আয়নার সামনে খাড়া হইয়া বক্ষের মাংসপেশীর স্ফীতি মাপি, আর আর্যগর্বে ফুলিয়া উঠি, এ-সব বৃথা হইল! এ-দেহের শিরায় শিরায় মনু-পরাশর-যাজ্ঞবল্ক্যের রক্তের জোয়ার বহিতেছে না? অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ নাকি ব্রাহ্মণত্ব-অভিমানী ছাত্রদের সব্যঙ্গে বলিয়াছিলেন, বাঙালীর শিরা-ধমনীতে বহিতেছে দাস-দস্যু, নিষাদ-কিরাতের রক্ত। এ জাতি বর্ণসংকর,ব্রাত্য, বন্য। এই জন্য সংস্কৃত নাটকে চোর-ছ্যাচোড়, চুয়াড়, গ্রন্থিচ্ছেদক-নীবিচ্ছেদকদের মুখে মাগধী প্রাকৃত দেওয়া হইয়াছে। বড়ো হইয়া সুনীতিকুমারের অধিকাংশ ইংরেজী ও বাংলা গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ পড়িয়া ফেলিয়াছি, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়াছি। সত্যই কি বাঙালী প্রাগ্‌বৈদিক কৃষ্ণকায় দাস-দস্যুর বংশধর, উত্তর-বৈদিক পাথুরে কালো কোলগোষ্ঠীভুক্ত নিষাদ ও পীতাভ মঙ্গোলজাতির (কিরাত) সংমিশ্রণে সাড়ে বত্রিশ ভাজার মতো একটি মিশ্র জাতি?

কলেজে প্রবেশ করিয়া দেশী-বিদেশী লেখকদের নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব-বিষয়ক কয়েকখানি কেতাব পড়িয়া ফেলিলাম। কিন্তু নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের টানাটানির ফলে ব্যাপার ক্রমেই ঘোলা হইয়া উঠিতে লাগিল। সুতরাং শেষ পর্যন্ত সুনীতিকুমারেরই শরণ লইলাম। তাঁহার রচনা পড়িয়া একটু আশ্বস্ত হইলাম, কারণ তাঁহার বক্তব্য কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম। সুনীতিকুমার বাঙালীর ব্রাত্য সংস্কার, কোল (নিষাদ) ও মঙ্গোলগোষ্ঠীর (কিরাত) সংমিশ্রণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের মতো অব্যাপারীর পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের এই সম্পর্কিত স্বল্প জ্ঞান তাঁহারই ভাণ্ডার হইতে আহরিত হইয়াছে। এই স্মরণসংখ্যায় একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সারিয়া লই।

বাঙালীর কিরাত সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে সম্প্রতি তাঁহার যে পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে ('Kirāṭa-Jana-Kṛti', The Asiatic Society, 1974), তাহার কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া গেলেই বুঝা যাইবে, একটি প্রায়-অনালোচিত বিষয়ের জটিলতা মোচন করিতে গিয়া তিনি কী বিপুল পরিশ্রম করিয়াছেন। গ্রন্থটি পড়িতে পড়িতে বহু পূর্বে তাঁহার পুস্তক-পুস্তিকা হইতে সংগৃহীত ভারতীয় জাতিতত্ত্ব ও ভাষা-তত্ত্ব সম্পর্কিত নানা কথা মনে পড়িয়া গেল। এখানে তাহারই দুই একটি তথ্য আলোচনা করিয়া তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করি।

২.

ভক্তিভাজন ডক্টর চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধ, আলোচনা ও গ্রন্থে বাঙালীর জাতিগত পূর্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহার অধিক জানা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার রচনা হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া বাঙালীর জাতিতত্ত্বটি আর একবার ঝালাইয়া লওয়া যাক। বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয় একখানি চটি-আকারের পুস্তিকায় (*Racial Elements in the Population*, No. 22 Oxford Pamphlets on Indian Affairs) ভারতের জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে যাহা বুঝাইয়াছেন, সিলভাঁ লেভি, রমাপ্রসাদ চন্দ, নির্মলকুমার বসু, মীনেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বাঙালীর জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কিছু কিছু মতান্তর থাকিলেও তাহা হইতে স্বল্প কথায় বাঙালীর জাতিতত্ত্ব বুঝিয়া লওয়া যায়।

শুনা যায়, বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষে নিগ্রোদের মতো একটি জাতি বাস করিত। হয়তো আদিনিবাস আফ্রিকা হইতে যাত্রা করিয়া তাহারা ইরান ও আরবের মধ্যদিয়া ভারতে আসিয়া পৌছায় এবং প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষেই ছড়াইয়া পড়ে। আসামের পূর্বভাগের নাগা জাতি এবং দক্ষিণভারতের আদিবাসীদের মধ্যে তাহাদের কিছু কিছু চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়। তাহারা হয়তো আকারে-আকৃতিতে বামনদেবের মতো ছিল, মাথার কেশরাজি মেষরোম সদৃশ, উচ্চ হনু, কোটরাগত চক্ষু, গাত্রত্বক ঘন কৃষ্ণবর্ণ—এই দিব্য তনুকান্তি লইয়া তাহারা সমাজ ও সভ্যতার নিম্নতম সোপানে অবস্থান করিত। ভাষা তাহাদের নিশ্চয় কিছু-একটা ছিল, কিন্তু তাহার স্পষ্ট কোন নমুনা পাওয়া যায় না। ভারতে অল্পস্বল্প এবং আন্দামান, মালয় উপদ্বীপ, আরও পূর্বে পপুয়া বা নিউ গিনিতে ইহাদের যৎসামান্য চিহ্ন এখনও দেখা যায়। এদেশে কখনও কখনও এমন দু'একজন চোখে পড়িয়া যায়, যাহাদের আকৃতি কতকটা নিগ্রোদের মতই। ইহারাই কি পূর্বেকার নিগ্রোবটুদের উত্তর-পুরুষ? এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য অতি অল্প তথ্যই পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং অন্ধকার কক্ষে অনুপস্থিত কালো বিড়াল খুঁজিয়া কী হইবে? তবে সুনীতিকুমার দেখাইয়াছেন, আমাদের এই বামন পিতামহেরা খাবার উৎপাদন করিতে জানিত না, খুঁটিয়া খাইত। আমমাংস ও

অনায়াসলভ্য ফলমূলেই উদর পূর্তি করিত, ডুমুর জাতীয় বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিত। ইহাদের বৃক্ষ ও শিলাখণ্ড উপাসনাই পরবর্তীকালে আর্যসভ্যতায় টটেম আকারে প্রবেশ করিয়াছে। ঈশ্বরের অনুরূপ কোন প্রবল ব্যক্তিকে ইহারা মান্য করিত। বোধহয়, আত্মা অবিনাশী এইরূপ একটা ধোঁয়াটে ধারণাও তাহাদের মস্তিষ্কে বাসা বাঁধিয়াছিল। অবশ্য একথাও প্রণিধানযোগ্য, সভ্যতার আদিম প্রত্যূষে, যখন তাহাদের ভাষাই ভালো করিয়া ভাবপ্রকাশক্ষম হইতে পারে নাই, তখন কি নিগ্রোবটুর দল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরতত্ত্ব মগজজাত করিতে পারিয়াছিল? বহুকাল পরে আত্মার অবিনাশিতা লইয়া বহু যুনানী ও ভারতীয় পণ্ডিত অনেক কাজিয়া করিয়াছেন। কিন্তু বেশ কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে কৃষ্ণকায় নিগ্রোবটুরা আত্মার স্বরূপ এত সহজেই হস্তগত করিতে পারিয়াছিল, এইটুকুতেই আমাদের কিঞ্চিৎ সংশয় আছে।

ইহার পরে উল্লেখ করিতে হয় আদি অস্ট্রোলয়েড জাতির, যাহারা এখনও ধ্বংস হয় নাই, ভারত ও ভারতের বাহিরে বিচিত্র ভাষা ও অশনবসন লইয়া দিব্য বাঁচিয়া আছে। ইহাদের এক শাখা খুব সম্ভব ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল হইতে যাত্রা করিয়া ভারতের দিকে আসিতে আরম্ভ করে। জলপাই-বনে-ভরা এই অঞ্চল বহু সভ্যতা ও ভাষার নীড় স্বরূপ। সুতরাং এখান হইতে মধ্যম মাপের লম্বামুণ্ড একজাতি যদি ভারতের দিকে আসিতেই শুরু করে তবে তাহাতে আর আশ্চর্যের কি আছে। ইহাদের সভ্যতা বোধ হয় প্রত্নপ্রস্তর যুগ পার হইতে পারিয়াছিল। প্রথম প্রথম ইহারা নিগ্রোবটুদের মতো ভূমি হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিত, পশু মারিত—শস্য উৎপাদন করিতে জানিত না। কিন্তু ভারতে পশিয়া তাহারা আর্দ্র মাটিতে শস্য ফলাইতে আরম্ভ করিল, হাতী পাকড়াও করিয়া বশ মানাইল। গাছ-পাথরে ঈশ্বরত্ব আরোপ পুরাদমে চলিতে লাগিল। বোধ হয় তাহারা পুনর্জন্ম ও কর্মবাদের মোদ্দা কথাটা জানিত। আর্যেরা পরবর্তীকালে হয়তো ইহাদের নিকট ঐ সমস্ত আইডিয়া ধার লইয়া থাকিবে। অতঃপর অনেক পরে (কত পরে, মাতা বসুন্ধরাই জানেন) তাহাদের নানা শাখাপ্রশাখা ভারত ছাড়িয়া দক্ষিণে ও পূর্বে মেলানেসিয়া (কৃষ্ণ দ্বীপপুঞ্জ)[১] পলিনেসিয়া (বহু দ্বীপপুঞ্জ)[২] ও মাইক্রোনেসিয়ার (অণুদ্বীপপুঞ্জ)[৩] নানা দ্বীপে কৃষ্ণ ও তাম্রবর্ণ গ্রহণ করিয়া এই দ্বৈপায়ন জাতি বাস করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের বিচিত্র ভাষাগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। মূল ভাষা প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড বা প্রাচীন অস্ট্রোলয়েড। তাহার দুই শাখা—অস্ট্রো-এশীয় ও অস্ট্রোনেসীয়।

ভারতে, ব্রহ্মে ও ইন্দোচীনে প্রচলিত অস্ট্রো-এশীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এই ভাষাগুলি নির্দিষ্ট হইয়াছে—কোলগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সাঁওতালি, মুণ্ডারী, হো, কুর্কু, শবর, গড়ব, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের 'মন' ও 'মের' ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নিকোবরী ভাষা, আসামের খাসি ভাষা, ব্রহ্মের পালোং এবং ওয়া ভাষা, দক্ষিণ ব্রহ্ম ও দক্ষিণ শ্যামের 'মন' বা তালাইং ভাষা, কামবোডিয়ার মের, কোচিন-চীনের চাম, ইন্দোচীনের স্তেইং, রাহ্‌নার এবং মালয়ের আকাই ও সেমাং ভাষাসমূহ।

অস্ট্রোনেসিয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে তিনটি উপগোষ্ঠী পরিকল্পিত হইয়াছে :—

(ক) ইন্দোনেসীয়, মালয়ী, যবদ্বীপীয়, সুদানীয়, মাদুরেজীয়, বলীদ্বীপীয়, সাসানীয়, সেলিবিস দ্বীপের ভাষাসমূহ, ফিলিপাইনের তাগালোগা, ইলোকোনা-বিসয়ন, ম্যাডাগাস্কারের মালাগাজি ভাষা।

(খ) মেলানেসিয়ার সলোমন দ্বীপপুঞ্জের ভাষা, নিউ ক্যালিডোনিয়া, নিউ হেব্রাইডিস, ভিটি ও ফিজি দ্বীপের ভাষা।

(গ) পলিনেসিয়ার সামোয়া দ্বীপপুঞ্জের ভাষা, টংগান, টাহিটি, তুয়ামতুয়া, মার্কুইসার ভাষা, নিউজিল্যাণ্ডের মাওরি ভাষা ও হাওয়াই দ্বীপের ভাষা।

আদি-অস্ট্রিক ভাষার আকার-আকৃতি বোধ হয় সর্বপ্রথম ভারতেই সংগঠিত হয়, পরে দুই হাজার বৎসরের মধ্যেই ব্রহ্ম, ইন্দোচীন, মালয় উপদ্বীপ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ সমূহে এই ভাষার নানা প্রকারভেদ সম্প্রসারিত হয়।

প্রাচীন ভারতে অস্ট্রিক শাখার কোল-মুণ্ডা জনকে 'নিষাদ' বলা হইত। ইহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল নিষাদ, শবর, পুলিন্দ, ভিল্ল, কোল্ল। নিরুক্তে নিষাদকে পাপের আধার বলা হইয়াছে। মনু-যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রার সংযোগে ইহাদের উৎপত্তি। মাছ ধরাই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। রামায়ণে ইহাদিগকে ব্যাধ বলা হইয়াছে। অত্রিসংহিতায় বলা হইয়াছে, ইহারা একশ্রেণীর অধঃপতিত ব্রাহ্মণ—চৌর্য, দস্যুতা ইহাদের উপজীবিকা। ইহারা কটুভাষী ও মৎস্যমাংসলোভী। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের উল্লেখ হইতে দেখা যাইতেছে, ইহারা এমন সমস্ত আচার-আচরণে অভ্যস্ত ছিল যাহার জন্য আর্য পিতামহগণ ইহাদিগকে কষিয়া গালি দিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রাদি হইতে যেটুকু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হইতেছে, সেকালের কোন কোন ব্রাহ্মণসন্তান নিষাদগোষ্ঠীর কৃষ্ণা নারীর প্রবল আকর্ষণে অথবা দড়ি-ছেঁড়া বোহেমিয়ান ব্রাত্যজীবনের প্রলোভনে ভিল্ল-কোল্লের দলে ভিড়িয়া গিয়াছিল। এই নিষাদ বা অস্ট্রিক জাতির বংশধরগণ পরবর্তীকালে দ্রাবিড়-আর্য-মঙ্গোলভাষী জনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। অবশ্য কোল-মুণ্ডাগোষ্ঠীর অধিবাসীরা তাহাদের আদিম জীবনযাত্রা ও ভাষা লইয়া ঝোপজঙ্গল ও পাহাড়ে এখনও কোনও প্রকারে টিকিয়া আছে। ইদানীং ইহাদের নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে অনেকে গবেষণা করিতেছেন, টাটকা খবর আদায় করিবার জন্য দেশী ও বিলাতী পণ্ডিতের দল পর্বত-কান্তার চষিয়া ফেলিতেছেন। নিষাদগোষ্ঠীর অনেক চমকপ্রদ সংবাদ, তাহাদের, ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত অনেক তথ্য আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা দিয়াছে।

৩.

অস্ট্রিক বা নিষাদের পরেই বোধ হয় দ্রাবিড়ভাষী ('দ্রবিড়', 'দ্রমিড়') ভূমধ্যসাগরীয় জন ভারতে প্রবেশ করে। ভূমধ্যসাগর হইতে ইরান (তখন ইরানের

কী নাম ছিল জানি না), এবং ইরান হইতে ভারতে সরিয়া আসে। তাহারা সঙ্গে আনিয়াছিল নাগরিক সভ্যতা ও ভূমধ্যসাগরীয় কোন অনগ্রসর ভাষা। তাহাদের প্রাচীন ভাষা কি ফিন্নো-উগ্রীয় ধরনের ছিল ? সে ভাষা ভারতের প্রাচীনতম তামিল ভাষারও ('চেন-তামিজ') অনেক পূর্ববর্তী। পরবর্তীকালে আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া ইহাদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ভূমধ্যসাগরীয় দ্রাবিড় জন নাগরিক সভ্যতায় বেশ উন্নত ছিল, তাহা ভারতে নানা অঞ্চলের খননকার্য হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। ময়দানব ও রাবণ যদি দ্রাবিড়গোষ্ঠীসম্ভূত হন, তাহা হইলে তাঁহারা যে পাকা দালানকোঠা নির্মাণে এবং নাগরিক সভ্যতার উচ্চ মান নির্ধারণে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাভারতে পাণ্ডবদের সভানির্মাণে ময়দানবের ডাক পড়িয়াছিল। তিনি এমন দক্ষতার সহিত পাণ্ডবদের রাজসভা বানাইয়া দিয়াছিলেন যে তাহা দেখিয়া দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতারা উজবক বনিয়া গিয়াছিলেন। রাবণ তো সোনারূপা মণিমাণিক্য-খচিত সাতমহলা অট্টালিকায় মহানন্দে বাস করিতেন। এ কালে ভারতের নানা স্থানে খননকার্য চালাইয়া যে সমস্ত লুপ্ত নগর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দ্রাবিড় সভ্যতার চিহ্ন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং প্রাগার্য দ্রাবিড় সভ্যতা যথেষ্ট ঐশ্বর্যশালী ও সুগঠিত ছিল। ইহাদের গাত্রবর্ণ মসীকৃষ্ণ, সুতরাং গৌরাঙ্গ আর্যেরা ইহাদিগকে ঘৃণাই করিতেন। ইহাদের নাগরিক সভ্যতা কৃষিজীবী ও অরণ্যচর আর্যদের উপরে টেক্কা দিয়াছিল। যুদ্ধে ইহারা সংহতশক্তি আর্যদের নিকট পরাভূত হইলেও তাঁহারা ইহাদিগকে লইয়া সদাই বিব্রত হইয়া পড়িতেন, তাই তাঁহারা নিজ নিজ গ্রন্থে ইহাদিগকে দাস ও দস্যু বলিয়া গালি দিয়াছেন। প্রাচীন ইরানে পুরাতন পহ্লবী ভাষায় তাহা যথাক্রমে হইয়াছে দাহ্ ও দহ্যু। দ্রাবিড়দের ভারতে প্রাপ্ত প্রাচীন লিপির এখনও পাঠোদ্ধার হয় নাই। কিন্তু ইহাদের বর্ণমালাতেই লিপিচিত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে, অক্ষর ও সিলেব্‌ল্ এই আদিম ভাষায় সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল, ইহাও অনুমিত হয়। পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, শিব-শক্তি, বিষ্ণু-লক্ষ্মীর উপাসনা ইহাদের মধ্যেই শুরু হয়, যোগদর্শনও নাকি তাহাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

পরবর্তীকালে আর্যদের সংহত শক্তির কাছে ইহারা নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, পাঞ্জাব ও উত্তরাপথের সমভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া এই দ্রাবিড়ভাষী জন বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে সরিয়া গেল। হয়তো আর্যদের অন্যতম নেতা অগস্ত্য ঋষি কেরলের তাম্রপর্ণী নদীর তীরে কুটীর বানাইয়া দ্রাবিড় সমাজে আর্য আচার-বিচার ও ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। হয়তো রামচন্দ্রের সঙ্গে রাবণের সংঘর্ষ আর্য ও দ্রাবিড়দের শ্রেণী ও জাতিগত সংঘাতের রূপক। সে যাহা হউক, পাঁচ-সাত শত বৎসরের মধ্যেই কৃষ্ণবর্ণ দ্রাবিড়ভাষী জন এবং গৌরবর্ণ আর্যভাষীদের 'জান পহ্চান' হইয়া গেল। ইহাদের উপর আর্যগণ যতই চটিয়া যান না কেন, দ্রাবিড়দের ভালো

ভালো জিনিসগুলিকে ফেলিয়া দিবেন, আর্যেরা এমন মূঢ় ছিলেন না। দ্রাবিড়রাও আর্যদের ভাষা, ধর্ম, আচার-আচরণ গ্রহণ করিয়াছে, ক্রমে পুরাতন বিরোধিতাও লোপ পাইয়া গিয়াছে। অবশ্য একালে রাজনৈতিক অবতারদের অঙ্গুলি সঙ্কেতে পুরাতন আর্য-দ্রাবিড় কলহ আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে।

অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তাঁহার ব্রাহ্মণ্য-গর্বী ছাত্রদের ওপর চটিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন যে বাঙালী আবার আর্য কিসের? তাহারা তো দাস-দস্যু, নিষাদ-কিরাতের বংশধর। কথাটা বেখাপ্পা লাগিলেও নিতান্ত মিথ্যা নহে। তবে আমরা গালির ভৌগোলিক সীমা আর একটু বাড়াইয়া কিঞ্চিৎ নম্র স্বরে বলিতে চাহি যে, ভারতের উত্তরাখণ্ডের 'আর্য বাবাগণ' বিশুদ্ধ রক্তের যতই জাঁক করুন না কেন, আসলে আমরা সকলেই বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। গণ্ডা খানেক ব্রাত্য-স্তোম যজ্ঞ করিলেও সে কালি ধুইবে না। রবীন্দ্রনাথের 'শক-হূনদল পাঠান-মোগল'-এর সঙ্গে রাঢ়-চুয়াড়-নিষাদ-কিরাতদেরও জুড়িয়া দিতে হয়। সুতরাং ভারত-ধর্ম-মহামণ্ডলের যজ্ঞসত্রে আমরা নিষাদ-কিরাতদেরও চৌকি আগাইয়া দিতে বাধ্য। বিরাট 'জাতীয়' কটাহে যে মিশ্র ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে আর্য-দ্রাবিড়-কোল-ভিল-সাঁওতাল-কিরাত— সকলেই সুসিদ্ধ হইয়াছে, এবং সেই ব্যঞ্জনের নামই 'মহা-ভারত'। আমাদের শিক্ষাগুরু আচার্য সুনীতিকুমার সেই শিক্ষাই দিয়াছেন।

৪.

দ্রাবিড়ভাষীদের পরে পশ্চিম হইতে গোলমুণ্ডযুক্ত যাহাদের আবির্ভাব হয় তাহাদিগকে আলপীনীয়, দিনারীয় ও আর্মিনীয়, এই তিন শাখায় বিভক্ত করা হয়। ইহারা কবে এদেশে হাজির হয়, বা ইহাদের ভাষাই বা কী ছিল তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। তবে এইটুকু মনে হয় যে, ইহারাও ভূমধ্যসাগরীয় জন। বোধহয় দ্রাবিড়ভাষীদের কিছু পরেই ইহারা এদেশে আবির্ভূত হয়। কল্পনাকে আর একটু আগাইয়া লইয়া বলা যাইতে পারে। ইহারা আর্যদের সঙ্গেই আসিয়াছিল, বা সামান্য পরে। ভারতে প্রবেশের পূর্বেই তাহারা আর্যদের সংস্পর্শে আসে এবং আর্যভাষা গ্রহণ করে। নৃতত্ত্বের বিচারে তাহারা আর্য না হইলেও ভাষা ও সংস্কৃতির বিচারে তাহারা আর্য বনিয়া গিয়াছিল, কালা আদমির সাহেব সাজিবার মতো বোধহয়। একালে গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জনসমূহের মাথার খুলি মাপজোখ করিয়া দেখা গিয়াছে, এই অঞ্চলের অধিবাসীরাই বোধহয় সেই গোলমুণ্ড আর্য-বনিয়া যাওয়া জাতির বংশধর। যাক, আপাতত বাঁচা গেল, বাঙালী নিতান্ত কোল্ল-ভিল্ল-কিরাতের বিশুদ্ধ বংশধর নহে। ইহারা কি গ্রীয়ার্সন কথিত 'অন্তেবাসী' আর্য? ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, তন্ত্রমন্ত্রের ছিটেফোঁটা, স্থূল-সূক্ষ্ম কায়াসাধনা—এ-সব কি ইহাদের 'অবদান'? ভৈষজ্য বিদ্যায় পারঙ্গম অথর্ব এবং মন্ত্রেতন্ত্রে পারদর্শী অঙ্গিরা যাঁহারা অথর্ব বেদের সংকলক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন[৪], তাঁহাদের সঙ্গে এই গোলমুণ্ডওয়ালাদের কোন

যোগাযোগ ছিল কিনা বলা যায় না। বাংলাদেশে তো মন্ত্রতন্ত্র, বিশেষত তন্ত্র ও শাক্ত মতের প্রবল প্রভাব অতি প্রাচীন কাল হইতেই লক্ষ্য করা গিয়াছে।

৫.

এবার আর্যদের কথা। এই অংশের আলোচনায় বড়োই গোলে পড়িয়াছি। আমরা বাঙালীরা প্রাচীন মহর্ষিদের প্র-পরা অপ্-সম্ বংশধর বলিয়া ফুলিয়া বসিয়া আছি। আমাদের গাত্রবর্ণ বেশ ফর্সা-ফর্সা, এমন অপবাদ পরম শত্রুও দিতে পারিবে না। আকারটি কিঞ্চিৎ খর্ব, মাথাটিও ক্ষুদ্র এবং গোলাকার, দেহে তথাকথিত 'নর্ডিক'ত্বের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। 'অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব', 'মাথায় ছোটো বহরে বড়ো বাঙালী সন্তানগণ' নিজেদের আর্য বংশধর বলিয়া ধরিয়া লইয়া বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেই ছিলাম। হঠাৎ নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব নামক দুইটি ভীমাকার মুষল আমাদের আর্যামির শিরে নিক্ষিপ্ত হইল, তাসের ঘর যে ভাঙিয়া যায় যায়। যাহা হউক, য়ুরোপীয় আর্যজাতি, যাহারা য়ুরাল পর্বতের তুষারাবৃত বন্ধুর পথ ও তৃণময় শুষ্ক প্রান্তর পার হইয়া, নানা স্থানে ডেরা বাঁধিয়া ও তাম্বু তুলিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের রক্তের ছিটেফোঁটাও কি বঙ্গবাসীর শরীরে নাই?

প্রায় শ' খানেক বৎসর ধরিয়া য়ুরোপে 'নর্ডিক' শ্রেষ্ঠত্বের অনেক গাল-গল্প জমিয়া উঠিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে য়ুরোপের কোন কোন সমাজ-তাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক আর্যদের মূল যে 'নর্ডিক' জাতি, তাহাদের সম্বন্ধে ছোটবড়ো মিলিয়া অনেক কেতাব লিখিয়াছেন। নর্ডিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের দলপতি হইতেছেন ফরাসী পণ্ডিত জোসেফ দ্য গোবিনো (১৮১৬-৮২)। তিনিই প্রথম নর্ডিক শ্রেষ্ঠত্ব নামক কল্পবৃক্ষজাত অমৃত ফলটি য়ুরোপের পণ্ডিতসমাজে গড়াইয়া দেন। ১৮৫৩-৫৫ সালের মধ্যে গোবিনো তিন ভল্যুমে এক বিশাল গ্রন্থ লিখিয়া ফেলেন—*Essai sur l' inégalité des races humaines*, অর্থাৎ 'The Inequality of Human Races'. এই গ্রন্থে তিনি নানা ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব হইতে নজির তুলিয়া প্রমাণের চেষ্টা করেন, প্রধানত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, গৌণত জার্মানি, ডেনমার্ক অঞ্চলে বহু শতাব্দী পূর্ব হইতেই একদল দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, স্বর্ণকেশ, নীলনয়ন, দীর্ঘশির জাতি বাস করিত। তাহারাই 'নর্ডিক' জাতি, সর্বশ্রেষ্ঠ আর্য। ফরাসী *nord* (উত্তর) হইতেই য়ুরোপের উত্তরখণ্ড-বাসী শ্রেষ্ঠ আর্যদের বলা হইয়াছে 'নর্ডিক'। গোবিনো বহি লিখিয়া এই-মতে বিশ্বাসী আরও কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে দলে টানিয়া লইলেন। তাঁহারা 'নর্ডিক' শ্রেষ্ঠত্বকে ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের আরকে ভিজাইয়া পণ্ডিতদের গ্রহণযোগ্য করিবার চেষ্টা করিলেন। ইহাদের মধ্যে স্বজাতিদ্বেষী হোসটন স্টুয়ার্ট চেম্বারলেন নামক এক ইংরাজ জার্মান জাতির দিকে হেলিয়া পড়িলেন, বলিলেন জার্মানরাই সেই খাঁটি নর্ডিকদের উত্তরপুরুষ; য়ুরোপের আর সব খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীরা ভক্ত বা বংশজ।[৫] ভন র‍্যাঙ্কো লাপুজ নামে আর এক জার্মান পণ্ডিত বিশ শতকের গোড়ার দিকে

জার্মান নর্ডিকত্ব প্রমাণের জন্য বেজায় সোরগোল তুলিয়াছিলেন। অবশ্য তাহারও কিঞ্চিৎ পূর্বে কার্লাইলের *Hero and Hero Worship* এবং নীৎশের 'Superman' তত্ত্বে ঐ ধরণের ব্যক্তিপূজা বা জাতিপূজার ইঙ্গিত আছে। গোবিনো-চেম্বারলেন-লাপুজ অ্যাণ্ড কোম্পানীর মতে য়ুরোপের উত্তরে যে শ্রেষ্ঠ আর্যদের নীড় গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারাই নর্ডিক, বিশুদ্ধ আর্য। দীর্ঘশির নর্ডিক ও গোলমুণ্ড অ-নর্ডিকদের ঐতিহ্যগত লড়াই, সেই লড়াইয়ে গোলমুণ্ড (সেমিটিক-হেমিটিক?) জনের পরাজয়—এইভাবে নাকি য়ুরোপে সংস্কৃতির অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আর্য সংস্কৃতির বিকাশ হইয়াছে। এই গাঁজাখুরি তত্ত্বকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে লাগাইবার জন্য হিটলার ইহুদিদিগকে কোতল করিয়াছিলেন। জাতিগত অহমিকা ও অপর জাতিকে দাবাইয়া রাখিবার রোখ চাপিয়া গেলে পণ্ডিতরাও রাজনৈতিক নন্দীভৃঙ্গীর গাড়ু-গামছা বহিতে সঙ্কুচিত হন না, হিটলারের নর্ডিক হুংকারই তাহার প্রমাণ। নর্ডিক তত্ত্বকে বীজমন্ত্র করিয়া কোন কোন পণ্ডিত বলিতে শুরু করিলেন, জাতির দিক হইতে ইহুদিরা অতি-নিকৃষ্ট 'মুলাটো'[৩] শ্রেণীর ঘৃণ্য বর্ণ-সংকর। কিন্তু একালে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, য়ুরোপীয় জাতিতত্ত্বে তিনটি পরিষ্কার শাখা আছে—নর্ডিক, আলপাইন ও ভূমধ্যসাগরীয়, কিন্তু কেহ কাহারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নহে। সুতরাং ক্রমে ক্রমে নর্ডিক-শ্রেষ্ঠত্বের বেলুন চুপসাইয়া যাইতেছে। আর্যেরা খ্রীস্টজন্মের তিন-চার হাজার বৎসর পূর্বে যখন য়ুরাল পর্বতের দক্ষিণ দিকে বাস করিত তখন তাহারা নিজেদের কী নামে অভিহিত করিত জানা যায় না। ইরানে আসিয়া তাহারা বেশ কয়েক শত বৎসর জাঁকাইয়া বসিল। 'ইরান' শব্দে আর্যত্বের গন্ধ বাহির হইতেছে। প্রাচীন ইরানী ভাষায় 'আরিয়া', মধ্য ইরানীয় ভাষায় 'আইরিয়া' বলিতে এই আর্যদের বুঝাইত। এখন য়ুরোপ-ভারত ব্যাপিয়া যে সভ্যজাতি বাস করে তাহাদিগকে ইন্দো-য়ুরোপীয় জাতি বলা হয়। ইরানে অবস্থান করিবার সময়ে তাহারা ঘোড়া ধরিয়া পোষ মানাইল, মেষ ও শূকর চরানোও তাহাদের 'পবিত্র' জীবিকার অন্তর্ভুক্ত হইল। বোধ হয় মেসোপটেমিয়ায় আসিয়া (খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দ) এখান হইতে গোরু এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে ছাগবৎস সংগ্রহ করিল; ইহাদের দুগ্ধ পান, মাংস ভোজন, কিছুতেই তাহাদের আপত্তি ছিল না। মনে হয়, ইহাদের একশাখা খ্রীঃ পূঃ আড়াই হাজার অব্দের মধ্যে ককাশাস পর্বত পার হইয়া পূর্ব-মেসোপটেমিয়ায় প্রবেশ করে। তার পর কয়েক শতাব্দী এখানে অতিবাহিত হইল, পরিশেষে তাহাদের কয়েকটি শাখা ইরান, ইরাক, ভারতের উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত অঞ্চল অতিক্রম করিয়া খোদ্ জম্বুদ্বীপে ঢুকিয়া পড়ে, বোধহয় খ্রীস্টের জন্মের দেড় হাজার বৎসর পূর্বে। এই পশুচারণে দক্ষ যাযাবর গৌরাঙ্গ জাতি নিজেদের শীল-সাধনা, পূজা-উপাসনা ও দেবদেবীর স্তোত্র বিষয়ক কিছু শ্লোক লইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। এই সমস্ত উপাসনাপদ্ধতি ও শ্লোকাবলী বেদে স্থান পাইয়াছে। তাহাদের পূর্ব হইতেই তো এদেশে দ্রাবিড় ও নিষাদ জাতি আসর

জাঁকাইয়া বাস করিতেছিল। ইহাদের সঙ্গে আগন্তুক আর্যদের বহু দিন ধরিয়া খণ্ডযুদ্ধ চলিয়াছিল। এই সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গ দাস-দস্যু ও নিষাদ জাতি সুগঠিত আর্যদের সংহত শক্তির নিকট হঠিয়া গেল, কেহ বনে জঙ্গলে পলাইয়া গিয়া বাঁচিল, কেহ মারা পড়িল, কেহ কেহ আর্যদের নিকট পরাভূত হইয়া শূদ্র দাসে পরিণত হইল। দ্রাবিড়গণ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে সরিয়া গেলে দুই দলে আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য ভাগাভাগি করিয়া লইল। খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর মধ্যেই আর্যজাতি পূর্বভারতে বিদেহ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়াছিল। অনুমান হয় খ্রীঃ পূঃ দশম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে ভোট-চীনাভাষী মঙ্গোল জাতির নানা শাখা-প্রশাখা হিমাচল অঞ্চল ও লৌহিত্য নদীর তীরে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। প্রাচীনকালে ভারতীয় গ্রন্থে তাহাদিগকেই 'কিরাত' বলা হইয়াছে।

৬.

প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে নিষাদ ও কিরাত জাতির নামধাম ও স্বভাব-চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। আর্যসমাজ ইহাদের সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা পোষণ করিলেও কিরাত জাতির পীতবর্ণের জন্যই বোধ হয় ইহাদের প্রতি গৌরাঙ্গ আর্যগণের ততটা অনীহা ছিল না, থাকিলে মহাভারতে মহাদেবকে কিরাতবেশ দেওয়া সম্ভব হইত না, ভারবিও অতবড়ো একখানা মহাকাব্য (কিরাতার্জুনীয়ম্) ফাঁদিতে পারিতেন না। একালে দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মের সীমান্ত হইতে বাল্‌তিস্তান অর্থাৎ কাশ্মীরের পশ্চিমে কারাকোরাম পর্বতের দক্ষিণে হিমালয়-সন্নিহিত অঞ্চলে একটি জাতি নানা নামে, বেশবাসে ও বিবিধ ভাষাসহ বাস করিতেছে। তাহাদিগকে মঙ্গোল এবং তাহাদের ভাষাকে ভোট-চীনীয় (Sino-Tibetan)[৭] গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। নৃতত্ত্বের দিক হইতে তাহারা স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীভুক্ত, তাহাদের ভাষাও অন্য ভাষা হইতে পৃথক। এই পীতাভ জাতি বৈদিক সাহিত্যেও উল্লিখিত হইয়াছে। মনে হয়, এই পর্বতকান্তারবাসী মঙ্গোল-শ্রেণীভুক্ত ভোট-চীনীয়ভাষী জনসমূহ আর্য আগমনের পাঁচ-ছয় শত বৎসর পরে তিব্বতের দিক হইতে ভারতে প্রবেশ করে এবং হিমালয় অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতীয় সাহিত্যে ইহাদিগকে 'কিরাত' বলা হইয়াছে। শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ীসংহিতা ও কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় কিরাতজাতির উল্লেখ আছে। 'পুরুষমেধ' অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, গুহাবাসী কিরাত, পর্বতসানুবাসী জম্ভক এবং পাহাড়িয়া কিম্পুরুষ(কিন্নর)দিগকে যজ্ঞের বলিস্বরূপ অর্পণ করা যায়। অথর্ববেদে আছে, 'কৈরাতিকা' অর্থাৎ কিরাতকন্যা পর্বতশিখরে মাটি খুঁড়িয়া ঔষধ সংগ্রহ করিতেছে। ম্যাকডোনেল ও কীথ *Vedic Index* গ্রন্থে এই তথ্য মানিয়া লইয়াছেন। মনুতে ইহাদিগকে অধঃপতিত ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় কিরাতেরা নিষাদের (অস্ট্রিক কোলমুণ্ডা গোষ্ঠী) মতো সভ্যতায় অতটা পিছাইয়া ছিল না। পূর্ব নেপালে 'কিরান্তি' নামে যে উপজাতি বাস

করে (ভোট-বর্মী শাখাভুক্ত, Tibeto-Burman) তাহারাই কি কিরাতজাতির শেষ বংশধারা ? অথবা কিরাত শব্দটি আদৌ সংস্কৃত শব্দ নহে, কোন ভোটচীনীয় ভাষার অধুনা-লুপ্ত শব্দ ?

একালের লেখকগণ মনে করেন, পূর্ব-হিমালয় অঞ্চল, সিকিম, ভুটান, মণিপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলের মঙ্গোল জাতিরাই কিরাত নামে পরিচিত। উত্তরপ্রদেশে কৃপণ সুদখোর বণিককে 'কিরাত' বলে। পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানগণ নিন্দাচ্ছলে হিন্দুদের নাম দিয়াছিল 'কিরাড়'। আর্যগণ এই সমস্ত কদাচারী কিরাতদের নিন্দাই করিতেন। পরে ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছিল বদমায়েস, খুনী-ডাকাত, জুয়াচোর ইত্যাদি। কিরাত শব্দ খ্রীঃ পূঃ ৭ম-৮ম শতাব্দী হইতেই বৈদিক সংহিতায় পাওয়া যাইতেছে। 'চিরেতা' শব্দটি নাকি 'কিরাততিক্ত' শব্দের অপভ্রংশ। কিরাতের মতো তিক্ত, তাহাই কিরাততিক্ত শব্দটির মূল। এ শব্দে কিরাত জাতির প্রতি প্রীতি সূচিত হইতেছে না। সে যাহা হউক, ইহারা একেবারে বর্বর-শ্রেণীর ম্লেচ্ছ অস্পৃশ্য ছিল না। শুক্ল যজুর্বেদে ('শতরুদ্রীয়') বলা হইয়াছে যে, যাঁহার গ্রীবা নীল, বর্ণ রাঙা, মেষ-পালকেরা নিত্য তাঁহাকে দেখিয়া থাকে, গ্রাম্য জলবাহিকা শ্রেণীর স্ত্রীলোকেও তাঁহার সন্ধান জানে। এই কিরাত তো একেবারে 'নীললোহিত' মহাদেব বনিয়া গিয়াছেন।

পরবর্তীকালে রামায়ণ-মহাভারতেও কিরাতের নামধাম ও স্বভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রামায়ণে "হেমাভ প্রিয়দর্শন ঘোর নরব্যাঘ্র" বলিয়া কিরাতের উল্লেখ রহিয়াছে। শুধু পার্বত্য অঞ্চলে নহে, সমুদ্রোপকূলেও কিরাতেরা বাস করিত। মনে হয় রামায়ণের যুগে কিরাতের কোন কোন শাখা সমুদ্রের ধারেও বাস করিয়াছিল। মহাভারতের একস্থলে ইহাদিগকে 'সাগরকুক্ষিবাসী' বলা হইয়াছে। রামায়ণ অনুসারে মনে হয়, ইহারা কাঁচা মাছ-মাংস খাইত। বিষ্ণুপুরাণে আছে, ভারতের পূর্বে ছিল কিরাত জাতি, পশ্চিমে যবনজাতি। 'মিলিন্দ পঞ্‌হে' যে 'চীন-কিলাত' শব্দটি স্থান পাইয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ 'চীন-কিরাত' শব্দই। প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা মহাভারতীয় ভগদত্তের বাহিনীতে অনেক চীনা ও কিরাত সৈন্য ছিল। তাঁহার পার্বত্যপ্রদেশের অন্তর্গত রাজ্যের চারিপার্শ্বে চীন ও কিরাতজাতির বসবাস ছিল। অজ্ঞাতনামা গ্রীক-লেখকের 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথি য়ান সী' গ্রন্থে 'কিরাদই' নামে যে জাতির উল্লেখ আছে তাহারা কিরাতই হইবে।

এই সমস্ত তথ্য হইতে দেখা যাইতেছে যে, খ্রীঃ পূঃ ১০ম শতাব্দীতে ইহারা ভারতবর্ষের পাহাড়িয়া অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে, নেপাল, ভুটান, সিকিম, মণিপুরের অধিকাংশ জনই এই শাখাভুক্ত। ইহারা দীর্ঘকায়, লম্বা ও হরিদ্রাভ। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাদের পীতবর্ণের আরও উল্লেখ আছে। মহাভারতে তাহাদিগকে 'কাঞ্চনপ্রভ' ও 'হেমাভ পুরুষ' বলা হইয়াছে, কখনও কর্ণিকার ফুলের (সোঁদাল) সঙ্গে তাহাদের গাত্রত্বকের তুলনা দেওয়া হইয়াছে, যাহাকে বলে "চম্পক-শোন-কুসুম-কনকাচল"। মঙ্গোলজাতির হরিদ্রাভ গাত্রবর্ণই আর্যদের নিকট স্বর্ণবর্ণ মনে

হইয়াছিল। অবশ্য ইহাদের গাত্রবর্ণ যত মনোমুগ্ধকর, হালচাল ততটা মোলায়েম নহে। ইহারা ফলমূল মাছমাংস যাহা পাইত তাহাই খাইত, আমমাংসেও আপত্তি ছিল না। মৃগচর্ম পরিত, চন্দনকাঠ, অগুরু, সোনারূপা, মণিমাণিক্যের ব্যবহারও জানিত, ভালো কাপড় বুনিতে পারিত। এখনও উত্তরপূর্ব ভারতের আদিবাসী সমাজে বস্ত্রবয়নের এই ঐতিহ্য বজায় আছে। কিন্তু স্বভাবের দিক হইতে তাহারা ছিল প্রচণ্ড ও নির্মম।

সিলভাঁ লেভির নেপাল-বিষয়ক গ্রন্থে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে কিরাত জাতির কথা আলোচিত হয়। তারপর কাসটেন রোনো ঐ বিষয়ে আর একখানি বহি লিখেন, তাহাতে তিনি কিরাত ও মঙ্গোল জাতির সাদৃশ্য ও ঐক্য প্রমাণ করিয়াছেন। এই জাতিগোষ্ঠী অস্ট্রিকদের মতো বহু স্থান জুড়িতে পারে নাই, সংখ্যার দিক হইতেও অল্প, তাই বোধ হয় তাহাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় নাই। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'Kirāta-Jana-kṛti'-তে তাহার সূচনা করিয়াছেন। উক্ত পুস্তিকায় যে-সমস্ত উপাদানের ইঙ্গিত দিয়াছেন, শুধু তাহার সন্ধান করিলেই একাধিক গবেষণা গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে পারে।

কিরাত জাতি নিষাদের মতো মূল ভারতীয় জনজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া যায় নাই। যখন উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে আর্য ও আর্যেতর জনের মধ্যে সমন্বয় চলিতেছিল তখন নেপালের কিরান্তি ও নেওয়ার, আসাম ও পূর্ববঙ্গের বোড়ো-অহোম, খাসি পাহাড়ের জৈন্তিয়ারা সর্বভারতীয় কেন্দ্র হইতে দূরে দূরে অবস্থান করিতেছিল। এইজন্য তাহাদের অতীত ইতিহাস অনেকটাই অস্পষ্ট ও অজানা। হাজার খ্রীঃ পূর্বাব্দের পূর্বে তাহাদের হাঁড়ির খবর বিশেষ পাওয়া যায় না। এখনও তাহাদের জনসংখ্যা স্বল্পতর, বোধ হয় মোট ভারতীয় জনসংখ্যার এক শতাংশও হইবে না। সংখ্যার স্বল্পতা, ভারতকেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থান এবং মানসিক সঙ্কোচন ও বিচ্ছিন্নতার জন্য তাহারা ভারতসংস্কৃতির ইতিহাসে যথাযোগ্য স্থান পায় নাই। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির অনেক কিছুই আর্য সংস্কৃতিতে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু মঙ্গোল জাতির বিশেষ কোন আধিমানসিক বা পার্থিব ঐতিহ্য ভারতসংস্কৃতিতে উপযুক্ত স্থান পায় নাই, স্থানীয় অঞ্চলেই ইহাদের প্রভাব কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে। ভারতে হিমাচলের সন্নিহিত অঞ্চলে ইহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি ছড়াইয়া পড়ার ইতিহাস গ্রীয়ার্সন *Linguistic Survey of India*-র ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছেন। এবার সে বিষয়ে দু-চার কথা বলিয়া লওয়া যাক।

মঙ্গোল জাতির মাথার খুলির পরিমাপ করিয়া ইহাদের তিনটি স্তর নির্ণীত হইয়াছে :

১. হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলে (নেপাল-আসাম) বসবাসকারী আদিম মঙ্গোল। ইহারা দীর্ঘমুণ্ড, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশেষ পরোয়া করিত না।

২. পরবর্তীকালে আগত গোলমুণ্ড মঙ্গোল। ইহারা সভ্যতায় কয়েক

হাত আগাইয়া গিয়াছিল। ব্রহ্মই তাহাদের মূল কেন্দ্র। সেখান হইতে তাহারা আরাকানের মধ্য দিয়া চট্টগ্রামে প্রবেশ করে।

৩. ভোট-মঙ্গোল—ইহারা দীর্ঘকায়, অধিকতর পীতাভ ও অল্প-স্বল্প গৌরাঙ্গ। মঙ্গোলজাতির মধ্যে ইহারা সভ্য-ভব্য শিক্ষিত। মনে হয় ইহারা সকলের শেষে হিমালয় পার হইয়া ঐ সমস্ত অঞ্চলে বাস করিতে আরম্ভ করে। তিব্বতের মূল ও শাখা-ভাষাই তাহাদের সংলাপের ভাষা। পূর্বে ভুটান-সিকিম হইয়া পশ্চিমে লাদাখ ও বাল্‌তিস্তানের মঙ্গোলজাতিরা, আসামের খাসি সম্প্রদায় ও জৈন্তিয়ারা কোলগোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করে। তাহাদের বাদ দিলে আর সমস্ত ভোট-চীনীয় জাতি-উপজাতি মঙ্গোল-গোষ্ঠীর ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকে। ভারতে মঙ্গোল জাতির সঙ্গে ভারতীয় জনের মিশ্রণে যে মিশ্র ভোট-ভারত সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে এই জনগুলির চিহ্ন পাওয়া যায়: নেপালের নেওয়ার (প্রাচীন-কালে ইহাদিগকে বলা হইত কুনিন্দ), উত্তর আসামের ইন্দোমঙ্গোল উপজাতি, বোড়ো, নাগা, কুকিচীন, অস্ট্রিক-ভাষী খাসি, শ্যামচীনীয় গোষ্ঠীভুক্ত অহোম। ভারতের বাহিরেও মঙ্গোল ভাষাসমূহের এইরূপ একটি তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে:

(ক) উরাল-আলতাই শাখা। এই শাখার দুইটি উপশাখা—উরাল বা ফিনো-উগ্রীয় (হাঙ্গারীর মজ্যার ভাষা, ফিনীয়, এসতোনীয় ও ল্যাপ ভাষা) এবং আলতাই ভাষা (পশ্চিমা তুর্কী অর্থাৎ ওসমানি ভাষা, পূর্বী তুর্কী অর্থাৎ চাঘ্‌তাই ভাষা। ইহার সঙ্গে উল্লেখ করিতে হয় য়াকুট ও মাঞ্চু ভাষা।)

(খ) উত্তর-পূর্ব এসিয়ার মঙ্গোল ভাষা।

(গ) আইনু ভাষা—জাপান ও কোরিয়ার ভাষাগোষ্ঠী। জাপানের হোক্কাইডো ও সাখালিন দ্বীপপুঞ্জে 'আইনু' নামে আদিম উপজাতির বাস। ইহারা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, কিছু-বা জাপানী জনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। মুস্কিল বাধাইয়াছে ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতি। ইহারা দীর্ঘকায়, ইহাদের চোয়ালের হাড় উঁচু, নাক চ্যাপ্টা ও চওড়া, দেহের তুলনায় মুখখানি কিছু ক্ষুদ্র, শরীর শক্ত সমর্থ, গাত্রে কিছু রোম আছে, তাই বলিয়া তাহাদিগকে লোমশ মুনির বংশধর বলিবার কারণ নাই। জাপানী জনের সহিত চলনে-বলনে আকার-আকৃতিতে ইহাদের অনেক পার্থক্য। ইহারা কি ককেশাস গোষ্ঠীভুক্ত? তাহারা এই পাণ্ডব-বর্জিত দ্বীপেই বা আসিবে কি করিয়া? কিছু মৌখিক ধরণের লোকসাহিত্য তাহাদের মধ্যে চালু আছে, কিন্তু লিপি নাই বলিয়া লেখার সাহিত্যও নাই।

(ঘ) আমেরিকায় মঙ্গোল জাতি—বহু পূর্বে কিছু কিছু মঙ্গোলজাতি বেরিং প্রণালী পার হইয়া আমেরিকায় পাড়ি দিয়াছিল। আমেরিকায় বাস করিয়া তাহাদের নিজস্ব ভাষা-প্রকৃতি লোপ পাইয়াছে, তাহারা অনেকদিন ধরিয়া আমেরিকার স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। যে সমস্ত এস্‌কিমো গ্রীনল্যাণ্ড এবং উত্তর আমেরিকার তুষার রাজ্যে বাস করে, তাহারাও মঙ্গোল জাতিভুক্ত, কিন্তু তাহাদের ভাষায় এখন আর মঙ্গোল-গোষ্ঠীর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

আদিম ভোট-চীনীয় ভাষাভাষী জনসমূহ হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর মধ্যবর্তী উত্তর-পশ্চিম তীরে বাস করিত। অতি প্রাচীনকালে ইহাদের এক শাখা দক্ষিণ-চীন ও ব্রহ্মে আসিয়া ডেরা বাঁধে। ব্রহ্মের 'কারেন'-রা ইহাদেরই উত্তরপুরুষ। অবশ্য কারেন ভাষা এত বদলাইয়া গিয়াছে যে, এই ভাষার সঙ্গে ভোট-চীনীয় ভাষার সংযোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ব্রহ্ম ও ইন্দোচীনে এক শ্রেণীর অস্ট্রিক জাতি বাস করে। তাহারা মঙ্গোলগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশিয়া গেলেও নিজেদের অস্ট্রিক ভাষা পরিত্যাগ করে নাই।

পশ্চিম চীনের মঙ্গোল উপজাতি, যাহারা বহু পূর্বে ভোট-চীনীয় ভাষায় কথা বলিত, নানা পরিবর্তনের পর তাহাদের ভাষায় দুইটি স্তর বেশ স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে —(১) ভোট-ব্রহ্মী ভাষা, (২) শ্যামদেশীয় ভাষা। ভোট-ব্রহ্মী ভাষার মধ্যে তিব্বতের উপভাষাসমূহ (কাশ্মীরের পশ্চিমে বাল্‌তিস্তান হইতে পূর্বে লাদাখ পর্যন্ত বিস্তৃত। ভুটান ও সিকিমেও এই গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহৃত হয়), ভারতের হিমাচল-সন্নিহিত অঞ্চলের উপভাষা সমূহ (নেওয়ারি, মগর, গুরুং, মুর্মি, সুনুওয়ারি, কিরান্তি, লেপ্‌চা, টোটো—এগুলি বিশুদ্ধ ভোট-চীনীয়), হিমাচল অঞ্চলের ভোট-চীনীয় ভাষী অস্ট্রিক গোষ্ঠী (সিমলা, নেপাল ও লাহুল উপত্যকার ভাষা), উত্তর-আসামের উপভাষাসমূহ (আকা, মিরি, আবোর, ডাফ্‌লা, মিশ্‌মি), আসাম-ব্রহ্মী গোষ্ঠী (ইহাদের তিন শাখা—(ক) বোড়ো—মেচ, রাভা, কাছাড়ী, টিপ্রা, (খ) নাগা—আও, আঙ্গামি, সেমা, টাংখুল, সোংটেম, লোথা, মাও, কাবুই ইত্যাদি, (গ) কুকিচীন—মণিপুর, ত্রিপুরা ও লুসাই পাহাড়ের মেইথি, মণিপুরি। মণিপুরি ভাষার সাহিত্য উল্লেখযোগ্য), উত্তর-ব্রহ্মের কাচিন ও লোলো গোষ্ঠীর ভাষা, ব্রহ্মের মিয়াম্মা ভাষা।

শ্যামচীনীয় ভাষার মধ্যে থাই, লাও, শান, খাম্‌তি ও অহোম ভাষা উল্লেখযোগ্য। ভারত সীমান্তে খাম্‌তি ভাষার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। বহু পূর্বে (১৩শ শতাব্দী) শান অভিযানকারীরা আসামের অনেকটা অধিকার করিয়াছিল, তাহাদের ভাষাই অহোম ভাষা। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ভাষা আসামে প্রচলিত ছিল। অহোম হইতেই সমগ্র অঞ্চলের নাম হইয়াছে আসাম।

৭.

হাজার তিনেক বছর আগে যে সমস্ত ভোট-চীনীয় ভাষাভাষী মঙ্গোল জাতি ভারতের হিমাচল অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা সভ্যতায় ছিল নিম্নতম। তাহারা খুব সম্ভব গুহাভ্যন্তরে স্বাভাবিক নীড় বাঁধিয়াছিল, মাটি খুঁড়িয়া মূল সংগ্রহ করিত, বৃক্ষশাখা হইতে ফলফুলুরি পাড়িয়া খাইত, বিনা আয়াসে প্রকৃতিদত্ত যে শস্য জন্মায় তাহাই পুড়াইয়া সিজাইয়া চিবাইয়া তাহারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। আমমাংসে তাহাদের অরুচি ছিল না। শুনা যায় বুদ্ধের জীবৎকালেই একদল ভোট জাতি ভারতের হিমাচল অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া বেশ জাঁকাইয়া বসিয়াছিল। তাহাদের বেশ কয়েক শ' বছর আগে মঙ্গোলশাখাভুক্ত অনেক জন ও জাতি (নেপাল অঞ্চলের অধিবাসী—যাহারা এখন নেওয়ারি, শেরপা, মগর, গুরুং, ধিমল, খাম্বু, কানোয়ারি প্রভৃতি ভাষায় কথা বলে) ভারতের হিমাচল অঞ্চলের তরাইভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিল। বোধহয় প্রথমে তাহারা নেপালে প্রবেশ করে, সেখান হইতে ক্রমে ক্রমে পশ্চিমে গাড়োয়াল ও কুমাউন পর্যন্ত ধাওয়া করিয়াছিল। এই দল-উপদলের মধ্যে নেওয়ারি ভাষাভাষীরাই সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে কিছু উন্নত। তাহাদের ভাষা এখনও ভোটবর্মী বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলে, কিছুদিন আগেও তাহারা পূর্বভারতে প্রচলিত 'কুটিল' লিপি ব্যবহার করিত, এখন তাহারা বাধ্য হইয়া নাগরী লিপি ব্যবহার করে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবে নেওয়ারি ভাষার বেশ উন্নতি হইয়াছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে হজম করিয়া তাহারা ভারতীয় সংস্কৃতির পাহাড়িয়া ধারক-বাহকে পরিণত হইয়াছে। ১৭৬৭ খ্রীঃ অব্দে রাজপুতানা হইতে মুসলমান-বিতাড়িত এক সম্প্রদায় নেপালের কিয়দংশ জয় করিয়া লয়, তাহারাই গুরখা। তাহাদের পূর্বে নেপালের সংস্কৃতি-সূত্র নেওয়ারি ভাষীরাই ধারণ করিয়াছিল।

জাতিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, পার্বত্য এলাকার উত্তরপূর্ব পাঞ্জাবে মঙ্গোল জাতির সহিত ভারতীয় জনের সংমিশ্রণে যে মিশ্রজাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাদের পূর্বনাম কুনিন্দ, এখন তাহাদিগকে 'কুনেট' বলা হয়। ভারতে বিশুদ্ধ তিব্বতী ভাষী জনসংখ্যা নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মতো নহে। সম্প্রতি তিব্বত হইতে চীনা-খেদানো বহু তিব্বতী ভারতে আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদের সংখ্যার এখনও সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই। বাল্‌তিস্থান ('ছোট তিব্বত' নামে পরিচিত) ও লাদাখের তিব্বতীভাষী ভুটিয়ার সংখ্যা পাঁচ লাখের কাছাকাছি যাইবে। এই প্রসঙ্গে ভোট-চীনীয়দের অন্যান্য শাখার নাম করা যাইতে পারে। আসামের বোড়ো ও নাগারা আসাম ও পূর্ববঙ্গের অনেকটাই অধিকার করিয়া আছে। নৃতাত্ত্বিকগণ বলেন, নাগাদের শিরাধমনীতে যৎসামান্য নিগ্রোবটু রক্তের মিশাল আছে। বোধহয় পূর্বে তাহাদের বেশবাসের বালাই ছিল না, তাই কি তাহারা নাগা (<নগ্ন) নামে পরিচিত হইয়াছে? কুকিচীনেরা মণিপুর, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও লুসাই পাহাড়ে এখনও ছড়াইয়া ছিটাইয়া আছে। মণিপুরী ও মেইথি ভাষায় স্থানীয় ভাষার বিশেষ

প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম ও সাধনা তাহাদিগকে নূতন জীবন দান করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আসামের খাসিদের উল্লেখ করিতে হয়। তাহারা জাতির দিক হইতে মঙ্গোল হইলেও ভাষার দিক হইতে অস্ট্রিক। অসমিয়া, বাঙালী ও খ্রীস্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে আসিয়া ইহারা ভাষা ও সংস্কৃতির দিক হইতে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে।

কিছু কিছু ভোট-ব্রহ্মী-ভাষা আসামে বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের মূলশাখা (অহোম, অসম) ব্রহ্মদেশ হইতে উত্তর-আসামে অনুপ্রবেশ করে, পরে তাহাদের নামেই সমগ্র অঞ্চল ('আসাম') বিশেষিত হইয়াছে। ১৮২৩ সাল পর্যন্ত অহোমগণ আসাম শাসন করিয়াছিল, তারপর উক্ত অঞ্চল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারে আসে। আসামের ভাষা ও সাহিত্যে ইহাদের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। ইহারাই রাজাদের বংশপঞ্জী ('বুরঞ্জী') গদ্যে লিখিয়াছিল। ভোট-চীনীয়, ভোট-বর্মী ও শ্যামচীনীয় ভাষাভাষী বিভিন্ন জন বিভিন্ন সময়ে ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ভেদ করিয়া আসাম ও চট্টগ্রামে প্রবেশ করে। কালক্রমে তাহারা হিন্দুসভ্যতার সঙ্গে কিছুটা রফা করিযা বসবাস করিয়াছে, ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু কিছু গ্রহণও করিয়াছে। হিন্দু তন্ত্র ও বৌদ্ধ মহাযান মতের সংমিশ্রণে যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ মত গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার অনেক পুঁথিপত্র নেপাল ও সন্নিহিত অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। আসামে শাক্ত, শৈব ও বৌদ্ধ প্রভাব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। মঙ্গোল জাতি ভারত হইতে লইয়াছে অনেক, দিয়াছেও তেমনি। তাহারাই পালযুগে বাংলার তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতাদর্শ ও শিল্পকলা তিব্বতে চালান দিয়াছিল। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিতে তাহাদের বিশ্বাস এত দৃঢ় হইয়াছিল যে, আসাম জয় করিতে মোগল-পাঠানকে হন্দ হইতে হইয়াছিল। আসামের অহোমরাজ গদাধর সিংহ (অহোম নাম—স্থপৎ ফা) ঔরংজেব-বাহিনীকে আসাম হইতে খেদাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রুদ্র সিংহ (অহোম নাম—স্থখাং ফা) মুঘলের কব্জা হইতে বাংলাদেশের কিয়দংশ ছিনাইয়া লইবার মতলব আঁটিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুর জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই। নেওয়ারি ভাষাভাষীরা নেপালে শিল্প, সাহিত্য—বিশেষতঃ নাটক রচনা ও অভিনয়ের বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। মঙ্গোলগোষ্ঠীর ভোট-চীনীয় ও ভোট-বর্মীভাষী জন ভারতে প্রবেশ করিয়া ভাষাগত কিছু স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিলেও এখন তাহারা অনেকটা ভারতীয় বনিয়া গিয়াছে। ভারতীয় জাতির সহিত সংমিশ্রণের ফলে তাহাদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যও কিছু বদলাইয়া গিয়াছে, অবশ্য আচার-ব্যবহারে ও ভাব-ভঙ্গিমায় এখনও কিছু পার্থক্য আছে।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই সমস্ত জনের মূল স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়া জাতিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের প্রমাণ দিয়া দেখাইয়াছেন, নিষাদ-কিরাতের দল যেখান হইতেই আসুক, সংস্কৃতিতে যতই উদ্ভট বলিয়া মনে হোক, তাহারা ক্রমে ক্রমে বৃহৎ ভারতের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। মঙ্গোল গোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতীয়

জনের সমন্বয়ের ফলে যে ভারত-মঙ্গোল সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছে, এখনও ভালো করিয়া তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় নাই। ডঃ চট্টোপাধ্যায় তাহার "দাঁড়া" বাঁধিয়া দিয়াছেন, এবার সে পথে অনেক পথসন্ধানীর আবির্ভাব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কিরাত-নিষাদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি উচ্চবর্ণদের শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টি ফিরাইতে তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার সন্ধান হইতে আমরা বহু অজ্ঞাত তথ্য পাইয়াছি। এই বিশাল জনসংঘের মধ্যে যেমন বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব আছে, তেমনি আছে মস্তকশিকারীদের উত্তরপুরুষ। বোধহয় ইদানীং আইনকানুন কড়া হইবার ফলে আসামের বনে জঙ্গলে আর কাটা মাথা পাওয়া যায় না, বা কেহ নিজ তাগৎ ও কেরামৎ দেখাইবার জন্য শত্রুর মাথা কাটিয়া গলায় ঝুলাইয়া বেড়ায় না, প্রণয়িনীর প্রেমকটাক্ষ লাভ করিবার জন্য কর্তিত মুণ্ড বেড়ার গায়ে টাঙাইয়া রাখে না, বরং বন্দুক পিস্তল চালাইতে অধিকতর উৎসাহ বোধ করে। আচার্য সুনীতিকুমার এই আদিম সংস্কৃতি ও ভাষা আলোচনায় আমাদের ভদ্রলোকি-সংস্কার অনেকটা দূর করিতে পারিয়াছেন। এইজন্য তিনি সমস্ত জাতিরই নমস্য।

অ. কু. ব.

---

১. লাতিন শব্দের অনুকরণে আমরা মেলানেসিয়ার 'কৃষ্ণ দ্বীপপুঞ্জ' নাম দিলাম। প্রশান্ত মহাসাগরে, উত্তর-পশ্চিমে বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জ হইতে দক্ষিণপূর্বে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ—ইহাই ইহার কল্পিত সীমা। নিউ গিনির কিয়দংশ, সলোমন, সান্তাক্রুজ, বাংক্‌স্‌, হেব্রাইডিস, ক্যালিডোনিয়া, লয়াল্টি এবং অ্যাডমিরাল দ্বীপপুঞ্জ কৃষ্ণ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের কৃষ্ণবর্ণের জন্য লাটিন ভাষায় এই দ্বীপপুঞ্জকে Melanesia বলে। এখানকার জনগণ অনেকটা পপুয়াদের মতো এখনও সভ্যতার নিম্নস্তরেই আছে।

২. লাতিন শব্দের বাংলা করিয়া আমরা Polynesia-কে 'বহু দ্বীপপুঞ্জ' নাম দিলাম। পূর্ব-প্রশান্ত-সাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জের এই নাম। সীমা—উত্তরে হাওয়াই, দক্ষিণ পশ্চিমে নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ পূর্বে ইস্টার দ্বীপ। এখানকার অধিবাসীরা পাথুরে কালো নহে, অনেকটা তামাটে ধরণের। তাই ইহাদিগকে নৃতত্ত্বে 'ককাসিয়' বলা হয়। ইহারা দীর্ঘাকার, সুগঠিত, ভদ্র। মাওরি ইহাদের ভাষা। পাথুরে কালো লোকসমূহের মধ্যে হঠাৎ এই আধা-গৌরবর্ণ লম্বামাপের মানুষ কেমন করিয়া আসিল জানা যায় না।

৩. Micronesia-কে আমরা অণুদ্বীপপুঞ্জ নাম দিলাম। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ল্যাড্রোন, ক্যারোলাইন, পালাউ, মার্শাল, গিলবার্ট প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ এই নামে অভিহিত হয়। এখানকার অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ বোধ হয় মালয়েশিয়া হইতে এই সমস্ত দ্বীপপুঞ্জে পাড়ি দিয়াছিল।

৪. প্রাচীনকালে অগ্নিপূজক ইরানীয় পুরোহিতদের 'আথর্বন' (>অথোর্না) বলা হইত। ঋগ্‌বেদেও দেখা যাইতেছে অথর্বা ঋষি সর্বপ্রথম বৈদিক অগ্নি চয়ন করেন, তাঁহার পুত্র দধীচি সেই পবিত্র অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন। সেইজন্য এই গোষ্ঠীর পুরোহিতেরা সেকালের সমাজে অতিশয় মান্য ছিলেন।

৫. হৌসটেন স্টুয়ার্ট চেম্বারলেন (১৮৫৫-১৯২৭) জাতিতে ইংরাজ, ভিয়েনায় দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ ভগ্‌নারের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি জার্মান বনিয়া যান, জার্মান নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়া ইংরাজের সংস্রব বর্জন করেন। জার্মান ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া তিনি জার্মান জাতির উচ্চ প্রশংসা করেন এবং নিজ পিতৃপুরুষের অন্তর্জলির ব্যবস্থা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধে যা-ইচ্ছা-তাই লিখিয়া শ্বশুর কুলের অর্থাৎ জার্মান জাতির শৌর্যবীর্য ও মহত্ত্বের বিস্তর প্রশংসা করেন। তাই ইংরাজগণ দলত্যাগী অকৃতজ্ঞ এই ব্যক্তিকে 'The Renegade Englishman' বলিয়া ঘৃণা করিত। হিটলার কি তাঁহার নিকট তালিম লইয়া গায়ের জোরে জার্মান জাতির নর্ডিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য রক্তারক্তি কাণ্ড বাধাইয়াছিলেন?

৬. মুলাটো (*Mulatto*) শব্দটি মূলতঃ স্প্যানিশ। লাতিনে mulas শব্দের (ইং mule অশ্বতর, অর্থাৎ ঘোড়া-গাধার বর্ণসংকর) স্প্যানিশ রূপ হইতেছে মুলাটো। শ্বেতাঙ্গ পিতা ও নিগ্রো রমণীর সন্তানেরা এই ঘৃণ্য নামে অভিহিত হয়। অনেকটা আমাদের দেশের 'মেটে ফিরিঙ্গী' শব্দের মতো। অবশ্য মুলাটোর রক্তে কয় কাঁচ্চা 'সাদা' রক্ত বহমান, সেই অনুপাতে *quadroon, octoroon, mestizos, pardo* প্রভৃতি নানা শাখাপ্রশাখায় ইহারা বিভক্ত।

৭. আমরা ভোট বলিতে তিব্বতকে নির্দেশ করিতেছি। প্রাচীনকালে তিব্বতের নাম ছিল 'বোড'। ভারতে আসিবার পর তাহারা 'ভোট' নামে পরিচিত হইল। বৌদ্ধ প্রভাবের পূর্বে তিব্বতের ধর্মের নাম ছিল 'বন'। ৭ম শতাব্দীতে তিব্বতরাজ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। নেপাল ও চীনের সঙ্গে তাহাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ঘটিলেও তাহারা কাশ্মীরের শারদা লিপি গ্রহণ করে। এই লিপিতেই তাহাদের বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ রচিত। তাহাদের ধর্ম, দর্শন, ও সংস্কৃতি ভারত হইতে পাওয়া, কিন্তু সভ্যতার স্থূল উপকরণের জন্য তাহারা চীনের নিকট ঋণী।

পুনর্মিলন উৎসব প্রবন্ধাবলী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসবের (১৯৭৬) প্রস্তাবিত স্মারক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপকদের নিকট প্রবন্ধ আহ্বান করা হইয়াছিল। সে আহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহারা প্রশংসনীয় ক্ষততার সহিত উক্ত প্রবন্ধগুলি পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু অনিবার্য কারণে পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় নাই, স্মারক পত্রিকাও প্রকাশিত হয় নাই। 'বাংলা সাহিত্য পত্রিকা'র এই ৫ম বার্ষিক সংখ্যায় তাহা হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ নির্বাচিত করিয়া প্রকাশ করা হইল। দুঃখের বিষয়, স্থানাভাব বশত প্রাপ্ত প্রবন্ধের সবগুলি মুদ্রিত করা সম্ভব হইল না। যাঁহাদের প্রবন্ধ এই অংশে প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহাদের প্রায় সকলেই এই বিশ্ববিদ্যা-লয়ের প্রাক্তন ছাত্র। সুতরাং ধন্যবাদ দিবার অবকাশ নাই। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, এই সমস্ত প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত ও মন্তব্য লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-অধ্যাপক ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র মহাশয় এই সমস্ত প্রবন্ধ সংগ্রহ, নির্বাচন ও বিন্যাস করিয়া দিয়াছেন। —সঃ

স্নাতকোত্তর বাংলার আদিযুগ

জনার্দন চক্রবর্তী

প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মতো স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের আদি, মধ্য ও নব্য তিনটি যুগ। আদিযুগের প্রবর্তক আচার্য দীনেশচন্দ্র, মধ্যযুগের অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র। নব্যযুগের প্রবর্তনায় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত। শুনেছি, বর্তমান বিভাগীয় অধ্যাপক-প্রধান ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থ যুগের উন্মোচন করতে চলেছেন। আদিযুগ থেকে এই বাটে যাঁদের আনাগোনা তাঁদের মধ্যে জীর্ণ অপভ্রংশের মতো এখনও টিকে রয়েছি বলে বোধ হয় পুনর্মিলনের উৎসবকর্তা বন্ধুদের কাছ থেকে স্মৃতিচারণার আহ্বান পেয়েছি।

বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সাংস্কৃতিক ধাত্রীমাতা। এই মায়ের অন্তরঙ্গ সেবাধিকার অধ্যাপনাপর্বে আমি পাইনি। ছাত্রদশায় গুরুদের কৃপা পেয়েছিলাম, আচার্য দীনেশ-চন্দ্রের গবেষণা-সংস্রব ও ব্যক্তিগত সান্নিধ্যলাভ করেছিলাম। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জ্যামিতির স্পর্শকের মতো একটি সেবাবিন্দুতে ঈষৎ যোগ স্থাপিত হয়েছিল। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বল্পকাল ও সরকারি চাকরিতে দীর্ঘকাল চট্টগ্রাম কলেজে কাটিয়ে যখন কোলকাতায় ফিরে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলা বিভাগ গড়বার কাজ আরম্ভ করি তখন স্নাতকোত্তর পাঠনার সঙ্গে যুক্ত হই অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের আহ্বানে। কিন্তু সে-যোগ নিতান্ত বহিরঙ্গের মতো, এক হিসাবে আমি একজন আদিবাসী, তাই আদিযুগের আবছায়া সরিয়ে আজকার সুসমৃদ্ধ সারস্বত আয়োজনের সূচনাপর্বের ওপর কিছু আলোকসম্পাত হয়ত করতে পারব। ব্যক্তিগত কথা অনিবার্যভাবে কিছু এসে যাবে, গুরুমহিমার খ্যাপনকল্পে—যদিও জানি এ-যুগে তার মূল্য নেই। 'নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়াৎ' অনুশাসনটি আমি মেনে চলি, তাই গম্ভীর গঠনমূলক ভঙ্গিতে কিছু বলব না অথবা তথ্যস্ফীত ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করে এ-কালের সুশান্ত ধৈর্য, সুভদ্র রুচি ও ব্যয়সাধ্য মুদ্রণব্যবস্থার ওপর আঘাত হানব না।

শতবর্ষ-পূর্তির বছর একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক অধ্যাপনা সেরে অন্ন-সংস্থানের সমাশ্রয়-ভূমিতে ফিরছিলাম। অধুনা-বিলুপ্ত সিনেট হাউসের কাছে এসে গতিবেগ শ্লথ করতে হ'ল। প্রেসিডেন্সি কলেজের এক স্বনামখ্যাত অবসরপ্রাপ্ত ইতিহাসের অধ্যাপক অবলম্বন-যষ্টিতে ভর দিয়ে ধ্যানদৃষ্টিতে বিধ্বস্তপ্রায় প্রাচীন স্মৃতিবাহী সৌধের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সমাধিভঙ্গ করতে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করলাম। মার্কিণ স্থাপত্যের বহুভূমিক ভারতীয় সংস্করণ অর্থাৎ শতবার্ষিকী ভবন নির্মাণের প্রস্তুতিতে ধ্বংসক্রিয়া নির্মমভাবে এগিয়ে চলেছে। দেহধারী দীর্ঘ-

নিশ্বাসের মতো অভিজাত স্তম্ভ ক'টি নিঃসঙ্গ মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। আসন্ন বিনষ্টির মুখে হয়ত ইষ্টকপ্রস্তরের পরমাণুপুঞ্জে আমাদের অবোধপূর্ব কোনো উপায়ে এখন কোনো স্মৃতিচারণা চলছে। আজি হ'তে শতবর্ষ পূর্বে ভৃত্যের-আগলানো ছাতা মাথায় গোলদীঘি থেকে বঙ্কিম-ভঙ্গিতে বেরিয়ে আসছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামহিম প্রথম স্নাতক। চুয়ান্ন বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতাহানির আশঙ্কায় ক্ষুব্ধ উপাচার্য FREEDOM FIRST, FREEDOM SECOND, FREEDOM ALWAYS মহাবাণী জলদমন্দ্রে আচার্য লীটন-লাটের সান্নিধ্যে ঘোষণা করবার জন্য সমাবর্তন উৎসবের শোভাযাত্রায় আশুগতিতে শার্দুল-বিক্রীড়িত ছন্দে এগিয়ে আসছেন। অথবা পাগড়ী-উষ্ণীষ হ্যাট-ক্যাপ ফেজ-তাজ শিখাসূত্রধারী, স্যুট-নেকটাই-আঁটা বা ফতুয়া উত্তরীয়ে অর্ধ অনাবৃতদেহ ভারতবিদ্যাবিৎ ও বিশ্ববিদ্যার পরিবেশক মনীষিবৃন্দ প্রবেশ করছেন ঐতিহ্য-মণ্ডিত এই সারস্বত নিকেতনে, যেখানে তাঁদের উদার উদাত্ত গুরুশিষ্য-সংবাদের ঐকতান এই সুপ্রাচীন গৃহে ধ্বনিতরঙ্গ তুলে পারাবত-কূজনের সঙ্গে মিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অদ্ভুত বিশ্বসঙ্গীত রচনা করত। ভাবসমাধিমগ্ন প্রবীণের কাছে এসে সসঙ্কোচে সবিনয়ে প্রশ্ন করলাম, ঐতিহাসিক বিবেক ব্যথাভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে বুঝি? ঈষৎ লজ্জিতের মতো হেসে উত্তর করলেন তিনি, হ্যাঁ, ভাই, ঠিক ধরেছেন আপনি। এই কালাপাহাড়ির সত্যই কি প্রয়োজন ছিল?

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কোলকাতার এক সাহিত্যিক-সংবর্ধনায় মহানগরীর সাংস্কৃতিক মহিমা তাঁর নিজস্ব ছন্দে গেঁথে বলেছিলেন, 'হেথা আশুতোষ আশু নিরমিল নব নালন্দা শিক্ষাগেহ। দেশের কিশোর হৃদয়গুলিতে বিথারি পক্ষিমাতার স্নেহ।' ঝঞ্ঝাবাত্যার মুহূর্তে যাঁরা আশুতোষের বলিষ্ঠ পক্ষপুটে নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেতেন, আশুতোষের অতিপ্রিয় সেই সম্প্রদায় সাময়িক উত্তেজনার বশে দ্বারভাঙ্গা ভবনে আশ্রয়দাতার আবক্ষ মর্মরমূর্তিটি বিধ্বস্ত করেছিলেন, যার অধোদেশে উৎকীর্ণ ছিল ইংরেজি ছন্দোবন্ধে গ্রথিত দু'টি সার্থক পংক্তি—বিমাতার মন্দিরে মায়ের জন্য আসনপাতা আশুতোষের অবিনশ্বর ও মহত্তম কীর্তি। আমরা বিশ্বাস করি, কার্যকারণের দুর্নিরীক্ষ্য আবর্তনে পিতৃপুরুষের পাষাণপ্রতিমা তাঁরা ভাঙতে চাইলেও দেশের তরুণের অন্তরে গুরুর চিন্ময় বপুর প্রতিষ্ঠা করবার আকূতি অবচেতনায় এখনও কাজ করছে। উৎসবের দিনে পিতৃকৃত্যের মতো আশুতোষের সঙ্গে দীনেশচন্দ্রের যোগাযোগের বিষয়টি আজকার প্রসঙ্গে বারবার স্মরণ করতে হয়।

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমযুগের প্রত্নরসিক সাহিত্যরথী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তখনকার 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় গ্রন্থকারকে অভিনন্দিত করেন। সংবাদ-প্রভাকরের স্তম্ভে গুপ্তকবি বাংলার প্রাচীন কবিদের নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত ইংরেজিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনা করেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বাংলায় তাঁর বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। কিন্তু একটি দুঃসাধ্য ব্রত

পূর্ববঙ্গের জীবনসংগ্রাম-জর্জর শিক্ষক দীনেশচন্দ্রের প্রতিভা ও অতন্দ্র অধ্যবসায়ের প্রতীক্ষা করছিল। সারা দেশময় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাশি রাশি পুঁথি কীটদষ্ট ও চন্দনলিপ্ত অবস্থায় অথবা গৃহদাহে বিলুপ্তির সম্মুখীন হয়েছিল। চট্টগ্রাম থেকে বাঁকুড়া-বীরভূম পর্যন্ত ভূভাগের পুঁথিপ্রেমিক ঘাটিয়ালদের সহযোগিতায় পুঁথিসাহিত্যের এক বৃহদংশ দীনেশচন্দ্র আহরণ করেন। বঙ্কিমের 'সুহাসিনী সুমধুরভাষিণী' মায়ের, তারও আগেকার মধুসূদনের 'শ্যামা জন্মদে'র দেওয়া ঘড়াভরা ধন ও মাণিক্যের অঙ্গুরী ভক্ত কালকেতুর মতো দীনেশচন্দ্র সযত্নে আগলিয়ে ঘরে তোলেন এবং সেই ধনের সাহায্যে বনকর্তন, নগরপত্তন ও রাজ্যস্থাপন করে নাছবাট, বিষ্ণুমন্দির, শিবের দেউল, দোলমঞ্চ, অতিথিশালা, অনাথমণ্ডপ, নমাজগৃহ ও বাসাড়েজনের জন্য দীঘল মন্দির নির্মাণ করেন। এই কৃচ্ছ্রার্জিত বিরাট সংগ্রহের পাঠোদ্ধার, যুগবিভাগ, রচনার কালনির্ণয় এবং সামাজিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে কাব্যমূল্যায়ন করে সেকালের ইংরেজি অনার্স-গ্রাজুয়েট দীনেশচন্দ্র দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর কাছে গর্বভরে এক নূতন বার্তা প্রচার করলেন। সেই বার্তাটি এই—ইংরেজ আসবার হাজার বছর আগে থেকে বাঙালী এমন এক সাহিত্য গড়ে তুলেছিল যা জগতের যে-কোনও সুসভ্যদেশের সাহিত্যের সঙ্গে সমকক্ষতা করতে পারে।

অতিশ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য ও অর্থাভাব-ক্লিষ্ট দীনেশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাকার্যে কিছু অর্থলাভ করবার জন্য শতাব্দীর প্রথম পাদে কোলকাতায় এসে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে কৃতী ও তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসাহী সদস্য আশুতোষের সঙ্গে দেখা করেন। আশুতোষ শুধু তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নয়, ভারতী প্রদীপ, প্রভৃতি পত্রিকায় নানা সময়ে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত নানা প্রবন্ধের উল্লেখ করে পরীক্ষাপদপ্রার্থীকে বিস্মিত করে দেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এখানেই জ্ঞানী গুণী উত্তর-সূরীদের সাধনপীঠ স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের জন্ম হয়, রাম না হ'তেই রামায়ণের মতো। দীনেশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত এই নূতন সাংস্কৃতিক রাজ্যে সন্নিহিত রাজ্যের নানা-শ্রেণীর প্রজারা এসে প্রচুর ইনাম বখশিশ নিয়ে সুখে সমৃদ্ধিতে বসবাস করেছেন। আমরা এই রাজ্যের সামান্য প্রজামাত্র। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে রচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন আইন মেনে নিয়ে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়কে পরীক্ষাগ্রহণের কেন্দ্র থেকে জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে পরিণত করার নানা প্রকল্প গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্নাতকোত্তর অধ্যাপনার সর্বাত্মক দায়িত্বগ্রহণ এবং বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা। ইংরেজি, ইতিহাস, দর্শন, গণিত প্রভৃতি প্রচলিত বিষয় ছাড়া সংস্কৃতের কাব্যদর্শনাশ্রয়ী নানা শাখা, পালিতে বৌদ্ধশাস্ত্র, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি নূতন বিষয়ের স্নাতকোত্তর পাঠনার প্রবর্তন হয়। বাংলার এই প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থভাবে সর্বভারতীয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে বিশ্ববিদ্যার অনুশীলনে অগ্রগণ্য হয়ে ওঠে। ভারতীয় এবং বহির্ভারতীয় মনীষিমণ্ডলী বাংলার জ্ঞানতাপসদের সঙ্গে মিলিত হলেন। আশুতোষের সন্ধানী দৃষ্টি আবিষ্কার

এবং আবাহন করে নানাদেশের সারস্বত দিক্‌পালদের সমাবেশ করলেন এখানে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাধাকৃষ্ণন রমণ ভাণ্ডারকর অনন্তকৃষ্ণ তারাপুরওয়ালা মনোহরলাল স্টীফেন আকুহার্ট শিরাজি সুরাবর্দী সিদ্ধার্থ কিমুরা স্টেলা ক্রামরীশ।

রামতনু লাহিড়ীর উত্তরাধিকারীদের বদান্যতায় সৃষ্ট গবেষক-প্রবক্তার পদে স্বল্প-বৃত্তিতে যোগ দিলেন দীনেশচন্দ্র। তখন থেকে স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের প্রতিষ্ঠা-কাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় দীনেশচন্দ্রের জ্ঞানসাধনা ও ইংরেজি-বাংলায় অজস্র গ্রন্থরচনার ইতিহাস অল্পবিস্তর সকলেই জানেন, আমরাও নানাস্থানে নানা-প্রসঙ্গে বহুবার সে কাহিনী বলেছি। সেদিন স্বয়ং দীনেশচন্দ্র ও দেশের মানুষ জানতেন না, কিভাবে দীনেশবাবুকে দিয়ে আশুতোষ বিমাতৃমন্দিরে মায়ের আসন পাতবার কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। ১৯১৯ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে ভারতীয় ভাষাসমূহের (Indian Vernaculars) স্নাতকোত্তর বিভাগ জন্ম নিল। ১৯২০-তে সর্বপ্রথম বাংলার এম. এ. পরীক্ষা গৃহীত হ'ল। পরীক্ষার্থীদের অনেকেই অপর কোনও বিষয়ে এম. এ. উপাধি নেওয়ার পর বহিরাগত রূপে পরীক্ষায় বসেছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রথম পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথমোত্তীর্ণ কৃতীতম স্নাতক হিসাবে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। বাংলার এম. এ. পরীক্ষায় তাঁকে দিয়েই শুভ সমারম্ভ। তিনি পরে ইংরেজি ও বাংলা দুই বিভাগে স্নাতকোত্তর অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত হন এবং বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সঙ্গে প্রথম বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছিলেন সহজিয়া সাহিত্যের গবেষক, দীনচণ্ডীদাসের আবিষ্কর্তা সুধী অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ বসু এবং অধ্যবসায়ী ও একনিষ্ঠ অধ্যাপক ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত। এরপর বিভাগীয় ছাত্রেরা নবগঠিত স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়াশুনা করে পরীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। অধ্যাপনা কার্যে যাঁদের সহযোগিতা পরিকল্পনায় ছিল অথবা যাঁরা শেষ পর্যন্ত কার্যতঃ যোগ দিতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দীনেশচন্দ্র সেন, যোগীন্দ্রনাথ বসু, অভয়কুমার গুহ, বসন্তরঞ্জন রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্কমোহন সেন, প্রফুল্লকুমার ঘোষ, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌। যৌল ভাষা পালিপ্রাকৃত ও ফার্সি পড়াবার জন্য আহূত হলেন সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বেণীমাধব বড়ুয়া, শৈলেন্দ্র-নাথ মিত্র, মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, আগা কাজিম শিরাজী। অপরাপর ভারতীয় ভাষার অতিরিক্ত অধ্যাপনা সানন্দে গ্রহণ করলেন অধ্যাপক ভাণ্ডারকর তারাপুরওয়ালা সকলনারায়ণ সিদ্ধার্থ সুরাবর্দী-প্রমুখ পণ্ডিতেরা।

আদিযুগের বাংলার পঠনপাঠনার ত্রুটিবিচ্যুতি ও সারস্বত সম্বলের স্বল্পতার কথা আজকার বর্ধিতায়ন বিভাগের রাজসিক সমারোহের দিনে সুধীদের মুখে মাঝেমাঝে শোনা যায়। এখনকার কৃতীদের মুখে আর একটি কথা শুনে বেশ কৌতুক উপভোগ করি। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার ফাঁকে ফাঁকে গলিয়ে তখনকার পরীক্ষার্থীরা সহজে বেরিয়ে যেতেন। কোন কোন পত্রের প্রশ্নোত্তরে ইংরেজি কলম চালিয়ে বিদেশীয়

ভাবাশ্রয়ে তাঁরা ছাড়পত্র সংগ্রহ করতেন। অভিযোগগুলিতে সত্যাভাস রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধলেখক একলা হ'লে আদিবাসীদের এবং আদিপ্রকল্প-রচয়িতাদের পক্ষ থেকে কোনও কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন ছিল না। আমার সঙ্গে একই বৎসর পরপর যাঁরা গলিষে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই মনে-প্রাণে আচরণে ও জীবনসাধনায় বাঙালী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, বিনায়ক সান্যাল, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্যামাপদ চক্রবর্তী। আমার অবশ্য শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দু'বছর আগে (১৯২৩ খ্রীঃ) বেরিয়ে যাবার কথা ছিল। কোনো কারণে তা হয়নি। গুরু দীনেশচন্দ্র তখন আমার গুরুকুল-বাসের ব্যবস্থা করলেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সহায়কপদে স্বল্পবৃত্তির ব্যবস্থা করে পূর্ববঙ্গ গীতিকার সম্পাদনা, ইংরেজি অনুবাদ, ভূমিকা ও টীকারচনায় সহযোগিতার কাজে নিযুক্ত করলেন। এইসময়ে চন্দ্রকুমার দে ছাড়া চট্টগ্রামের আশুতোষ চৌধুরী, ফরিদপুরের মুনশি জসিমুদ্দীন ও মৈমনসিংহের বিহারীলাল পালা-সংগ্রাহক নিযুক্ত হন। কিছু নতুন খবর এ-সম্পর্কে দেওয়া যেতে পারে, কারও হয়তো সে সব জানা নেই। এখন একজন অধ্যাপকের মর্যাদা রক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় তখন সমস্ত বাংলা বিভাগের ব্যয়-নির্বাহ প্রায় সেই টাকায় হয়ে যেত। দীনেশচন্দ্রের বেতন ৩৫০ টাকা থেকে বর্ধিত হয়ে ৬০০ টাকা পর্যন্ত হয়েছিল। শশাঙ্কমোহন সেনের গৃহীত সর্বোচ্চ বেতন ছিল ১৫০ টাকা। এম. এ. পাশ করবার পূর্বেই আমার সহায়ক পদে নিয়োগের জন্য দীনেশবাবুর ইচ্ছায় আমাকে দেখা করতে হয়েছিল ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে। তিনি তখন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসাহী সদস্য ও Board of Accounts-এর সভাপতি (১৯২৩-২৪)। আমি ইংরেজি অনুবাদের কাজ করতে পারব কিনা, এর উত্তরে আমাকে বলতে হয়েছিল আমি ক্লাসে ইংরেজিতে Manasa-cult and its Literary Expression নিয়ে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম যা দীনেশচন্দ্রের প্রেরণায় এবং উমেশচন্দ্র গুপ্ত, ক্ষিতিমোহন সেন, বহুবল্লভ শাস্ত্রী, অবিনাশচন্দ্র দাশ প্রভৃতি ভারতবিশ্রুত পণ্ডিতের উপদেশে রচিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি আমার ছাত্রবৎসল গুরুকে একদিন অধ্যাপকদের বিশ্রামকক্ষে রাধাকৃষ্ণন হীরালাল হালদার তারাপুরওয়ালা-প্রমুখ মনীষীদের নিকট উপস্থিত করতে দেখে বড়ো লজ্জা পেয়েছিলাম। প্রায় দশ বৎসর পরে আমার চট্টগ্রাম অধ্যাপনা-কালে (১৯৩৩ খ্রীঃ) এই প্রবন্ধটি 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, শ্যামাপ্রসাদবাবুর আগ্রহাতিশয্যে। ইংরেজের Quit India আন্দোলনের সঙ্গে সর্বাত্মক মানসিক যোগ অনুভব করেও ইংরেজির Quit India সাংস্কৃতিক আন্দোলনে আমি এখনও সায় দিতে পারিনে। তেমনই সংস্কৃতানুশীলনকে ভৌতিক আবেশ বলে দূর থেকে পরিহার করে 'রুচিবান' হবার উচ্চকাঙ্ক্ষাও পোষণ করিনে। এম. এ. পাশ করে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরঙ্গ সেবাধিকারের প্রার্থী হয়েছিলাম একসঙ্গে আমি, সুহৃদ্বর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়নি। তাতে আপসোস

নেই, নিষ্ঠাবান্ প্রবীণ বন্ধু তমোনাশ বাবু ও মণীন্দ্র বাবু বিজ্ঞাপিত দু'টিপদ লাভ করেন। তখন বাংলা বিভাগের স্থায়িপদ চার পাঁচটির বেশি ছিল না। সরকারি কলেজে বহুবিপত্তি ও সংগ্রামের সম্মুখীন হয়ে দেড়শো টাকা বেতনে বাংলা অধ্যাপনার জন্য প্রথমসৃষ্ট যে উপাধ্যায়ের পদটি সংগ্রহ করেছিলাম সেটি সম্ভব হ'ত না, যদি শিক্ষা-বিভাগের ইংরেজ অধিকর্তার ন্যায়পরায়ণার আশ্রয় না পেতাম এবং যদি ছাত্রবৎসল গুরু দীনেশচন্দ্র তাঁর অকৃতী ছাত্রাধমের জন্য না লিখতেন, 'Ever since the foundation of the Indian Vernaculars Department, Babu··· · Chakravarti has been by for the best student in English and Sanskrit turned out by the Calcutta University. He writes better English than any first-class M. A. of the present day. He can compose extempur verses in the most difficult of Sanskrit metres.' আরও একটি কথা। চট্টগ্রাম কলেজে আমি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যোগ দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রারম্ভিক বক্তৃতাগুলি ইংরেজিতেই দিয়েছিলাম। আমার চতুর্থবার্ষিক শ্রেণীতে সেবারকার অন্যতম ছাত্র ছিলেন লোকনাথ বল। চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যাপক-সত্তা ও মর্যাদা রক্ষার অনুকূল ব্যাপার হয়েছিল আমার এই বক্তব্যগুলি। কথাটি নিতান্ত-ভাবে সত্য, কিন্তু এর চেয়ে বেশি পরিষ্কার করে বলা জীবনের এই পর্বে-সমীচীন নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় আমি ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতাম বলে অধ্যাপক-বন্ধু জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুযোগ করতেন। কিন্তু আমি জানি, তেমনভাবে বক্তব্য উপস্থাপিত না করলে মেহনতী পরীক্ষক-বন্ধুদের উত্তরপত্রের নিরীক্ষণের অতি স্বল্প পারিশ্রমিক-বৃদ্ধির সংশোধনী প্রস্তাব সিদ্ধান্ত-সভা গ্রহণ করতেন না। সিনেট সভার মুদ্রিত বিবরণীতে তার পরিচয় রয়েছে। সিনেটে সহযোগী স্বনামখ্যাত একজন চিকিৎসক-বন্ধু আমাকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন, আমার কথাগুলি 'roaring of a raging lion'-এর মতো হয়েছিল। কৈফিয়ৎ দেবার জন্যে এতগুলি কথা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বলতে হ'ল ব'লে প্রবন্ধ-পাঠকের প্রশ্রয় কামনা করি। আমার স্বজনবান্ধব সকলেই জানেন, আমি নিতান্তই বাঙালী অধিকন্তু গ্রাম্য। ইংরাজিয়ানার পক্ষপাতী আমি আদৌ নই। আমার সহস্র সহস্র ছাত্র সাক্ষী রয়েছেন।

আশুতোষ ছিলেন বাংলার বাঘ, দীনেশচন্দ্র ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'সুহাসিনী সুমধুরভাষিণী' মায়ের, মধুসূদনের 'শ্যামা জন্মদে'র ভক্ত চারণ। একটি স্বল্পপরিসর কক্ষে ভূম্যাসনে বসে সারাজীবন মায়ের বন্দনাগানে সব্যসাচীর মতো তিনি ইংরেজি-বাংলায় অশ্রান্ত লেখনীচালনা করেছিলেন। তাঁর দেহত্যাগের মুহূর্তে বন্ধু-শ্যামাপ্রসাদ গুরুর ডান হাতের তিনটি আঙুলে অনপনেয় কালির দাগ দেখিয়েছিলেন। আমি যতদূর জানি, বাংলাদেশ নামে ভৌগোলিক ভূখণ্ডের বাইরে তিনি বড়ো বেশি যান নি। জীবনের অন্তিমপর্বে একবারমাত্র জগন্নাথ-দর্শন এবং জঙ্গম-জগন্নাথ সন্ন্যাসি-চৈতন্যের গুহাবাস গম্ভীরা দর্শনের জন্য নীলাচলে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে তাঁর সম্ভোজাত

দৌহিত্রসন্তানের নাম দিয়েছিলেন নীলাদ্রিনাথ। আশুতোষের নখদর্পণে বিশ্বের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় তথ্য প্রয়োজন-মুহূর্তে ভেসে উঠত। কিন্তু জগত্তারিণী-মায়ের ইচ্ছার অনুবর্তন করে তিনি বঙ্গভঙ্গের প্রকল্প রচয়িতা বড়লাট কার্জনের বিলাতযাত্রার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। মহীশূর রাজদরবারে অনাবৃতশীর্ষ এই বাঙালী শিরস্ত্রাণ পরতে রাজি হননি। কিন্তু 'নবনালন্দা' নির্মাণে তিনি প্রাদেশিকতার বহু উর্ধ্বে অবস্থান করে সর্বভারতীয় মনীষীর সমাবেশে বিশ্ববিদ্যার সার্বভৌম আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র রচয়িতাও 'রামায়ণী কথা', 'সতী', 'জড়ভরত', 'কুশধ্বজ', 'ধরাদ্রোণ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে সর্বভারতীয় মনুষ্যমহিমার জয়গান করেছিলেন। তাঁর অজস্র ইংরেজি রচনার গুণগ্রাহী লাট-রোনাল্ডশে তাঁর ইংরেজি রচনা এপিক পর্যায়ের বলে প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বিশ্বকোষ লেনের বাসভবনে দেখেছি, যখন তাঁর দু'খানি চৌকির ওপর মাদুর-বেছানো বৈঠকখানায় মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ, অধ্যাপক হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অথবা স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এসেছেন তখনও তাঁর আচরণ ও বাগ্‌ভঙ্গি ছিল ইংরেজি ভাষায় ও ইংরেজি খানায় অনভিজ্ঞ গ্রাম্য বাঙালীর মতো।

আশুতোষ ও দীনেশচন্দ্র ছিলেন তুল্যরূপে একসঙ্গে অবিরোধে বাঙালী, ভারতীয় ও আন্তর্জাতিকতায় আস্থাবান বিশ্বমানব। এঁদের মধ্যে ছিল এই তিনের ভারসাম্য। আমাদের ভাবদ্বন্দ্ব আজও কাটেনি, বাংলাবিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী-গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে' 'স্মরণীয় তাঁরা, বরণীয় তাঁরা' এমন চারজন বাঙালীর সাধনার কথা বলেছিলাম। তাঁরা হলেন বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। আজকার বাংলা বিভাগ সুধীসমাগমে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। তাঁরা জ্ঞানগবেষণার নূতন নূতন পরিকল্পনা ও পথ প্রস্তুত করছেন। আমরা প্রশংসমান দৃষ্টিতে পথিপার্শ্বে দাঁড়িয়ে প্রত্যাশা করব, মহাপ্রভুর সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্যন্ত সংস্কৃতি-সমন্বয়ের যে অশ্রান্ত প্রয়াস বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে দেখা গিয়েছে সে-বিষয়ে জ্ঞানগবেষণার দ্বারা তাঁরা ছাত্রসমাজকে ও দেশবাসীকে আজকার সভ্যতাসঙ্কটের দিনে পথনির্দেশ দেবেন।

সেই এগার নমবর ঘর

অমিতাভ চৌধুরী

বার্তা সম্পাদক : যুগান্তর

কোথায় শান্তিনিকেতনের গাছের তলা, আর কোথায় এই আশুতোষ বিলডিংয়ের দোতলায় এগারো নমবর ঘর। একেবারে আসমান জমিন ফারাক। ১৯৪৮ সাল। দেশ সবে স্বাধীন হয়েছে। কমিউনিস্টরা বলছেন, 'এ আজাদী ঝুটা হায়।' কলেজ স্ট্রিট পাড়া প্রায়ই রণক্ষেত্র। গুলি, কারফু, মৃত্যু। তার জের এসে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। গুলির ছিটে এসে লাগে ঘরের জানলায়। ভিতরে ক্লাস চলছে। শান্তিনিকেতন থেকে আমরা পাঁচ 'গাঁইয়া' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলুম বাংলায় এম. এ পড়তে। না, ভুল বললুম, আমাদের সময়ে বাংলা নয়, বলা হতো আধুনিক ভারতীয় ভাষা।

বাংলা বিভাগের তখন তুঙ্গে বৃহস্পতি। বাঘা বাঘা সব অধ্যাপক। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, অর্থাৎ হেড। তখন অধ্যাপকপদ সবে ধন নীলমণি ওই একটিই। শ্রীকুমারবাবু রাশভারী লোক। কোঁচাদোলানো ধুতির উপর শার্ট গুঁজে তার উপর চড়াতেন কোট, পায়ে মোজা-সু, চোখে চশমা আর ঠোঁটে গোঁফ। দেখলেই ভয় করতো। তাঁর ভারীক্কি চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে ছিল তাঁর পড়ানোর ভাষা। পড়াতেন বাংলা উপন্যাস, রবীন্দ্রকাব্য (পূরবী)। মাপা মাপা এক একটি শব্দ কামানের গোলার মতো ছিটকে বেরোতো।—"অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ব্রীড়াময় ব্যঞ্জনা", কিংবা "প্রাগৈতিহাসিক নৃশংসতার ভয়ংকর উল্লাস" ইত্যাদি বাক্যের হুংকার মুহুর্মুহু তাঁর কণ্ঠ থেকে উদ্গারিত হতো। তবে চমৎকার পড়াতেন তিনি। কী সুন্দর ব্যাখ্যা, কী বিশদ বিশ্লেষণ।

পড়ানোয় অতুলনীয় শশীবাবুও—শশিভূষণ দাশগুপ্ত। ধুতিপানজাবিপরা বেঁটেখাটো নম্র মানুষটি অধ্যাপনায় সবার সেরা। যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনি প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা। বৈষ্ণব পদাবলী, প্রবন্ধ ইত্যাদি পড়াতেন। পরে কিছুদিন পড়িয়েছেন চর্যাপদ। প্রথমে আমরা চর্যাপদ পড়ি মণীন্দ্রমোহন বসুর কাছে—চর্যাপদের সম্পাদকের একটু অবিন্যস্ত ভাব ছিল চেহারায় ও পড়ানোয়। আমাদের ফিফ্থ ইয়ারের সময়ই বোধহয় তিনি মারা গেলেন।

সুনীতি চাটুজ্জে মশাই পড়াতেন ভাষাতত্ত্ব। আমরা সৌভাগ্যবান, তাঁর কাছে ভাষাতত্ত্ব পড়ার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু তাঁকে পেতুম কদাচিৎ। তিনি কখনও লণ্ডন, কখনও জেনিভা, কখনও নাইরোবি ঘুরছেন। আমাদের একটি ক্লাস নিয়ে হয়ত চলে গেলেন মসকোর এক সেমিনারে যোগ দিতে, আবার দিন পনেরো পর

আর একটি ক্লাস নিতে এসে হয়ত বললেন, কালকেই চলে যাচ্ছি টোকিও—অমুক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে। শুনতে বেশ লাগত। তাঁর পোশাক ছিল সেই একই। একটুতোলা মালকোঁচামারা ধুতি, একটু বেঁটে পাঞ্জাবি এবং গলায় চাদর। হন্তদন্ত হয়ে ক্লাসে ঢুকতেন, যা প্রয়োজন পড়িয়ে দিয়ে হন্তদন্ত বেরিয়ে যেতেন। ছাত্রদের বলতেন 'আপনি'।

'আপনি' বলতেন সুকুমার সেনও। তিনি পড়াতেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ভারী শরীর নিয়ে ভারীক্কি চালে আসতেন। তাঁর পড়ানোর ভঙ্গী ছিল সুন্দর। আমার খুব ভালো লাগত। যা বলতেন ছাঁকা ছাঁকা, একটিও বাজে কথা না, সব পরে কাজে লাগত। তমোনাশ দাশগুপ্ত—দীনেশ সেন মশাইয়ের জামাই—পড়াতেন মঙ্গলকাব্য। বড় পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু রস পেতুম না, মনে হতো বাঁধাধরা বুলি আওড়ে যাচ্ছেন। গোকুল দে পড়াতেন পালি, মহেশ্বর দাস প্রাকৃত—এই ক্লাসও আমার নীরস লাগত। উলনারের 'এন ইনট্রোডাকশন টু প্রাকৃত' চিরকালের মতো আউট অব প্রিন্ট, ভরসা তাই নোট, কিন্তু এতো নোট কে করে!

ক্লাস জমজমাট থাকত দু'জনের—বিশ্বপতি চৌধুরী আর প্রমথনাথ বিশীর। পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে নানারকম চুটকি গল্প দিয়ে তাঁরা দুজনেই মাতিয়ে রাখতেন। বিশ্বপতিবাবু আবার মাঝে মাঝে নস্যি নিতেন। তাছাড়া আমাদের পড়িয়েছেন ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, জনার্দন চক্রবর্তী, ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, ডঃ প্রিয়রঞ্জন সেন। এঁরা তখন সবাই পার্টটাইম ডঃ সেন নামকরা পণ্ডিত। কিন্তু তাঁর পড়ানোর ধরন আমাদের তেমন ভালো লাগতো না। আমরা বলতুম, উনি নিশ্চয়ই ইংরেজির ক্লাস ভালো নেন। আর ওদিকে ইংরেজির ছাত্রদের বলতে শুনেছি, উনি বোধহয় বাংলা ক্লাস ভালো নেন। ডঃ সেন দুই বিষয়েই অধ্যাপক ছিলেন।

আমাদের সময়ে আট পেপারের এক পেপার ছিল অন্য যে কোন ভারতীয় ভাষা। কেউ নিত অসমীয়া কেউ ওড়িয়া কেউ হিন্দী। আমি নিয়েছিলুম হিন্দী। আমাদের পড়াতেন অধ্যাপক শুকুল আর অধ্যাপক লোধা। একদিন মাত্র ক্লাস করেছিলাম হিন্দীর, পড়েছিলুম প্রেমচান্দের 'দো বয়েলো কি আত্মকথা।' পরবর্তী সব ক্লাসের সময়টুকু কেটেছে কফিহাউসে বা সিনেমাহাউসে। হিন্দীতে কী করে পাশ করলুম জিগগেস করবেন না। আজকালকার মতো গণটোকাটুকি চালু থাকলে এবং বুকে দুর্জয় সাহস থাকলে এই পন্থাই অনুসরণ করতুম, কিন্তু আমাকে হিন্দীর বৈতরণী পার হতে হয়েছিল নেহাৎ বরাতজোরে এবং সম্ভবত পরীক্ষকের মহানুভবতায়।

হিন্দী ক্লাস তো তবু ভালো, একটিতে অন্তত আমি হাজির ছিলুম, কিন্তু তমোনাশবাবুর টিউটোরিয়েল ক্লাস? একদিনও যাইনি। কোথায় কখন কোন্ ঘরে সেই ক্লাসটি হতো আমার কাছে এখনও জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে আছে। ক্লাস তো বটেই, অকপটে স্বীকার করছি, উলনারের প্রাকৃত গ্রন্থের মতো কতকগুলি পাঠ্যবইয়ের নাম শুনেছি, পড়া দূরে থাক, চেহারা পর্যন্ত দেখিনি। যেমন দুটি নাটক—পাণ্ডব

গৌরব ও ভীষ্ম। পরীক্ষায় ছুটি থেকেই প্রশ্ন এসেছিল। উত্তরও যথারীতি দিয়েছি। কী করে দিয়েছি, সে প্রশ্নের উত্তর চেয়ে আমাকে লজ্জায় ফেলবেন না। খাতা পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে কোন কটাক্ষ করার সুযোগও আপনাদের দেব না।

এখন বাংলা বিভাগে কত ছাত্র জানিনা, আমাদের সময়ে এক এক ইয়ারে ষাটজনের বেশি ছাত্রছাত্রী ছিল না। তার মধ্যে ছাত্রী জনা কুড়ি। বাসন্তী মুখার্জী, সুরুচি চৌধুরী, গীতা দাস, কল্যাণী ঘোষ, সুলেখা মজুমদার, দুই দীপ্তি, ইলা দত্তগুপ্ত, অঞ্জলি পাকড়াশি, অনিতা ব্যানার্জি, সঙ্ঘমিত্রা—এই কয়জনের নাম মনে পড়ছে। সঙ্ঘমিত্রা ছিল পড়াশোনায় ভালো। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। মেয়েরা বসতো এক পাশে, তবে সবাই যে অধ্যাপকের পিছন পিছন আসতো এমন নয়। আজকালকার মতো এতোটা খোলামেলা না হলেও অফ পিরিয়ডে বা করিডরে মেয়েদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা ছিল। সম্বোধনটা ছিল আপনি-ই। দু'চার জনের মধ্যে একটু বেশি ভাবও ছিল। আমার সহপাঠী বিধান সিংহই বোধ হয় একমাত্র বিয়ে করেছে সহপাঠিনী গীতা দাসকে।

সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই এখন নামকরা। তার মধ্যে তিনজন বাংলা অধ্যাপনার কাজে সসম্মানে নিযুক্ত। আমি প্রণবরঞ্জন ঘোষ, তারাপদ মুখার্জি ও শঙ্করীপ্রসাদ বসুর কথা বলছি। প্রণব ছিল এখনকার মতোই গোবেচারী ভালো মানুষ। দেখলেই মনে হতো কোন আশ্রম টাশ্রম থেকে আসছে। তাঁর হাতের বা কাঁধের ছাতাটি ওই ভালোমানুষটিকে আরও সম্পূর্ণ করতো। প্রণব ছিল যেমন পড়িয়ে, তেমনি আড্ডাবাজ। বি-এ অনার্সে সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে এসেছিল। সে পড়াশোনার মতোই অবসরের আড্ডাতেও ছিল ফার্স্ট ক্লাস। তার ঠিক উলটো ছিল তারাপদ। ধুতির উপর হাতবোতামআঁটা ফুলশার্ট পরে আসত, একটা ক্লাসও ফাঁকি দিত না, অবসর কাটাতো লাইব্রেরিতে বা অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা করে। এম-এ পাশের পর তারাপদ জমিয়ে আড্ডা দিতে শিখল। শঙ্করী আসত হাওড়া থেকে। কথাবার্তায় যেমন বুদ্ধির দীপ্তি, পড়াশোনায়ও তেমনি উত্তম। তবে তখন থেকেই তাঁর আগ্রহ ক্রিকেটে। ১৯৪৮ সালে ভারতে প্রথম খেলতে এসেছিল ওয়েস্ট ইনডিজ দল। গডার্ড অধিনায়ক। শঙ্করী আর হাওড়ার সুনীল ঘোষ (ভালো বল করত, এখন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ভালো কাজ করে) আমার সঙ্গে সব সময় আলোচনা করত ক্রিকেট নিয়ে। আর একজন সুনীল—সুনীল চট্টোপাধ্যায়—এখন যাদবপুরের খ্যাতিমান অধ্যাপক। তখন তার দাড়ি ছিল। পোশাক ও চেহারা ছিল সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী ধরনের। বহুকাল পর এই সেদিন সুনীলের দাড়িহীন চেহারা দেখে প্রথম চিনতেই পারিনি। সুনীলের পাশে বসত সলিল গাঙ্গুলি। আড্ডাবাজ ছেলে। এখন বোধহয় আশুতোষে বাংলা পড়ায়।

আড্ডাবাজদের মধ্যে বেশি মনে পড়ছে কার্তিক মজুমদার আর আশিস দত্তের কথা। এই দু'জনের পাশে আমি বসতুম। আমরা তিনজন পালা করে একে অন্যের

প্রকসি দিতুম। কার্তিক ভালো লিখত, ভালো ছবি আঁকত, ভালো ফোড়ন কাটত। আশিস ছিল সিনেমা পাগল। ধ্যানজ্ঞান সব টলিউড। পড়াশোনায় ফাঁকিবাজ কিন্তু বুদ্ধিতে প্রখর। আশিস এখন আসাম সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার। আর একজন পড়ুয়া সহপাঠী অনন্ত চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরে ডেপুটি সেকরেটারি। সৌরেন বসু ছিল বিশেষ বন্ধু। নিপাট ভালোমানুষ অথচ মেধাবী ছেলে। পড়তে পড়তেই করপোরেশনে চাকরি নিয়ে নেয়।

দেবী ভট্টাচার্যকে সবাই ডাকতুম দেবীদা বলে। সহপাঠী, কিন্তু তার কথাবার্তা চালচলনে এমন একটা অভিভাবক-অভিভাবক ভাব ফুটে উঠতো যে আমাদের 'দাদা' ডাক অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। দেবীদা বেশ ফিটফাট জমিদারী চালে ক্লাসে আসতেন। পীযূষ চট্টোপাধ্যায়ও ছিল মেধাবী ছাত্র। সে এখন রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান শিক্ষক—শিক্ষাবিদ হিসাবে সুপরিচিত। সোনার চশমাপরা বড়লোকের ছেলে সুজয় দত্ত, রোগাটে কল্যাণ, হাসিখুশি সুখেন্দু সরকার (এখন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের জাঁদরেল অফিসার), সৌমেন গঙ্গোপাধ্যায় (গবেষণায় খ্যাতিমান), কৃষ্ণনাথ মল্লিক, লক্ষ্মী, নিরঞ্জন, মুক্তিপ্রসন্ন, মানিক নাগ কত জনের কথাই না মনে পড়ছে। বিধানের কথা আগেই বলেছি, বিধান তখন খুব রাজনীতি করত, এখন শান্তশিষ্ট গৃহী এবং আনন্দবাজারের একজন নামী সাংবাদিক। আর তাছাড়া গোড়ায় যে পাঁচ গাঁইয়ার কথা বলেছিলুম, তার মধ্যে আমি ছাড়া অন্য চারজন হলেন নির্মল চক্রবর্তী (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক), বিভাস চৌধুরী (সম্ভবত এ. জি. বেঙ্গলের চাকুরে। বিভাস অধ্যাপনা লাইনে কেন গেল না বুঝতে পারিনি), মকবুলার রহমান ও সুসীমা দাশগুপ্ত। মকবুল কুষ্টিয়ার লোক এখন বাংলাদেশে জানিনা কেমন আছে। আমরা এই পাঁচজনই শান্তিনিকেতন থেকে বাংলায় সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স নিয়ে কলকাতায় পড়তে এসেছিলুম। অন্যের কথা জানি না, আমি কিন্তু বাকি জীবন ওই সেকেণ্ড ক্লাসই থেকে গেলুম।

আমাদের সময়ে অন্য বিভাগের ছাত্রদের সঙ্গেও বেশ ভাব ছিল। বিশেষ করে ইংরেজির সঙ্গে। ওদের ক্লাস হতো তিনতলায়। মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য ছিলেন হেড। মাঝে মাঝে দুটো ক্লাস মিলিয়ে আমরা আনুষ্ঠানিক রঙ্গব্যঙ্গের আসর বসাতুম। বলা বাহুল্য, তাতে অনিবার্যভাবে দেবীদা সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করতেন। ইংরেজি ক্লাসের শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন নামকরা কবি নবকান্ত বরুয়া, সত্য গুপ্ত, অম্বিকা গুপ্ত, অরুণ সোম আর আমার সমনামী অমিতাভ চৌধুরীর (শ্রীনিরপেক্ষ) সঙ্গে ভাব বেশি ছিল। অমিতাভ আমার বাল্যবন্ধু। দীর্ঘদিন যুগান্তরে সসম্মানে ও সগৌরবে সাংবাদিকতা করে এখন সে ম্যানিলায় নামী ও দামী সংবাদ সংগঠক। অম্বিকা—ওমেগা গুপ্ত বলে পরিচয় দিত নিজের। মিমিক্রি ও চুটকি মন্তব্যে যদি কোন নোবেল প্রাইজ থাকতো, অম্বিকা তা নির্ঘাৎ পেতো। অম্বিকা এখন দিল্লির ইউ-এস-আই-এসের অন্যতম বড় কর্তা হয়ে নানা রকম কাণ্ডকারখানা

করছে। অরুণ সোম—যাকে বলতুম সানডে মানডে—অত্যন্ত সপ্রতিভ বুদ্ধিমান ছেলে, এখন কেন্দ্রীয় সরকারের কোন একটা দপ্তরে বড় চাকুরে। আসল সানডে মানডে অবশ্য রবি—ইংরেজিতেই পড়ত। আর পড়ত শোভন চট্টোপাধ্যায় দিলীপ চৌধুরী, দিলীপ মুস্তফি ও জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। দিলীপ ও জ্যোতির্ময় ভালো কবিতা লিখত। কেন ছেড়ে দিল জানি না। আমাদের কাগজ বেরোত একতা—তাতে এই দুজনের কবিতা থাকতোই থাকতো। অন্য বড় কাগজেও ওরা লিখত। যেমন লিখত ইংরেজির নীলিমা গাঙ্গুলি—এখন নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়। ওই ইংরেজিরই রেখা বরুয়া অবশ্য এখনও মাঝে মাঝে লিখে থাকেন। পলিটিকেল সায়ান্সের অশোক মুস্তফি এবং মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার ভাব ছিল। মহাদেব শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র, এখন হেতমপুর কলেজে। পলিটিকেল সায়েন্স সেবার প্রথম খোলা হল। হেড ছিলেন বিনয় সরকার। তিনি আমেরিকা চলে যেতেই এলেন ডি. এন. ব্যানার্জি।

ইউনিয়নের পাণ্ডা ছিল মনোজ বরুয়া। ফিলজফির ছাত্র। মনোজ প্রেসিডেন্ট, ফিজিক্স না সাইকোলজির অমল মুখার্জি সেকরেটারি। ক্যানটিনের কাছাকাছি একটি ঘরে ছিল ইউনিয়নের অফিস। কোন রাজনৈতিক দলের ছাপ তখনকার ইউনিয়নে থাকতো না। ওই ইউনিয়নের সূত্রেই বন্ধুত্ব বর্তমানে পোর্ট কমিশনার্সের অফিসার দেবব্রত পালিত, বর্তমান বিড়লা ব্রাদার্সের অফিসার সন্তোষ মুখার্জি, ব্যবসায়ী মাখন মুখার্জিদের সঙ্গে। আমাদের এক ক্লাস নিচে বাংলায় পড়ত চিত্তরঞ্জন ঘোষ, নমিতা, সুকুমার ব্যানার্জিরা। আমাদের এক ক্লাস উপরে বাংলায় ছিলেন কবি কৃষ্ণ ধর। ইউনিয়নের সাহিত্যশাখা ছিল 'রবিবাসর'। আমি ছিলাম তার সেকরেটারি। একবার সেনেট হলে বিরাট একটা রবীন্দ্রজয়ন্তীর আয়োজন করেছিলুম। প্রধান আকর্ষণ ছিল মূল বাংলার সঙ্গে বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ পাঠ। দারুন জমেছিল। ইতিহাসের তৎকালীন অধ্যাপক ডঃ কালিদাস নাগ এই ব্যাপারে আমায় খুব সাহায্য করেছিলেন। ঠিক ওই রকমই রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের ইংরেজি 'স্যাকরিফাইস' অভিনয় করিয়েছি। রঘুপতি অম্বিকা, গোবিন্দ মাণিক্য অরুন বাগচি (এখন আনন্দবাজারের বার্তা সম্পাদক), অপর্ণা নমিতা সেনগুপ্তা (এখন সিংহ রায়, এককালের নামকরা অভিনেত্রী), গুণবতী নীলিমা গাঙ্গুলি, নক্ষত্র রায় সন্তোষ বলে একটি ছেলে আর জয়সিংহের ভূমিকায় যে অভিনয় করেছিল, তার নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। থাকত রূপচাঁদ মুখার্জি লেনে। নাম বোধহয় সুনীল।

আমাদের সময়ে প্রথম উপাচার্য ছিলেন ডঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জি। কী একটা গণ্ডগোল হল, তিনি ল-কলেজের প্রিনসিপ্যাল হয়ে চলে গেলেন, এলেন চারুচন্দ্র বিশ্বাস। তারপর চারুবাবু মন্ত্রী হয়ে দিল্লি চলে যেতেই এলেন বিচারপতি শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রেজিস্ট্রার ছিলেন সতীশ ঘোষ মশাই। উনি আর উপাচার্য

বলতেন দ্বারভাঙ্গা বিলডিংয়ের সেই উত্তর দিকটায়। আমরা কখনও সাহস পাইনি ওদিকটায় যাবার। সতীশবাবুর বাজখাঁই গলা শুনলে তো আমরা সবাই দে-ছুট। আমরা সাধারণত যেতাম শৈলেন মিত্তির মশাইয়ের কাছে। আর্টস বিভাগের সেক্রেটারি। কোন কাজে নয়, মাস মাহিনা মকুব করাতে। কুললে তো বারো টাকা, তা'ও খরচ হয়ে যেত কফি হাউসের বিল মেটাতে। শৈলেনবাবু সজ্জন ব্যক্তি। আমাদের সাত আট মাসের মাইনে এক সঙ্গে মাফ করে দিতেন। কিন্তু হায়রে কপাল, এতো মাফটাফ চেয়ে এবং পেয়েও পঞ্চাশ সালে এম-এ পরীক্ষায় বসতে পারলুম না। পরীক্ষা দিলুম পরের বছর। ওই যে, ইউনিভারসিটিতে ভরতি হওয়ার পরই শুনেছিলুম অন্তত একবার নাকি ড্রপ দিতে হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এম. এ. পাঠ্যক্রম বিচার

প্রমথনাথ বিশী

প্রাক্তন রবীন্দ্র-অধ্যাপক ও বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আমি যখন বাংলায় এম-এ পাশ করলাম একজন হিতৈষী গুরুজন পরামর্শ দিয়েছিলেন—বাপু হে, যা করেছ করেছ (যেন ঘোরতর কোন দুষ্কর্ম করেছি) তবে চাকুরির দরখাস্ত করবার সময়ে ওটা আর লিখোনা। ঐ যে ইংরাজিতে অনার্স পেয়েছ, ওটাই লিখো সুফল হতে পারে। আর একজন গুরুজন বাংলায় এম. এ পাশ করেছি শুনে প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তারপরে অট্টহাস্য করে উঠলেন। হাসির ধমক ক্ষান্ত হলে বললেন—আশু মুখুজ্যের কাণ্ড দেখো, অবশেষে বাংলায় এম-এ করে বসলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের হল কি। ঐ হাসিই তার মন্তব্য। এ দুটি ঘটনা যে বলতে হল তার কারণ ওটাই ছিল বাংলায় এম-এ সম্বন্ধে তখনকার শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাব। সকলেই ব্যাপারটাকে স্যার আশুতোষের একটা খেয়াল বলে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতখোয়ানোর চিহ্ন বলে মনে করেছিল। এ হচ্ছে ১৯৩২ সালের কথা। তারপরে এখন বাংলার এম-এ সম্বন্ধে দেশের মত বদলিয়েছে, তবু যেন সম্পূর্ণ বদলায়নি। এখনো ইংরাজির এম-এ, অর্থনীতির এম-এর পরে বাংলার এম-এ বলতে ছাত্ররা যেন একটা হীনম্মন্যতা অনুভব করে।

স্যার আশুতোষ দেশের মনোভাব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন তাই তাঁকে অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রসর হ'তে হয়েছিল। তিনি জানতেন বাধা পাবেন, আর সে বাধা প্রধানত আসবে বাঙালী সমাজের কাছে থেকেই। সেই কথা মনে করেই এম-এর প্রথম পাঠ্যক্রম এমন ভাবে তাঁকে ঢালাই করতে হয়েছিল যার মধ্যে বাংলা সাহিত্যের স্থান ছিল সঙ্কীর্ণ। আট শ নম্বরের মধ্যে দুখানি মাত্র বাংলা বই ছিল যা সাহিত্য পদবাচ্য, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ও মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্য। অন্য কোন বই এম-এর যোগ্য বিবেচিত হয় নি। মনে রাখতে হবে তখন রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এ গেল প্রথমার্ধ অর্থাৎ চারশো নম্বরের বিবরণ। দ্বিতীয়ার্ধের চারশো নম্বরের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের কোন যোগ ছিল না, নিতান্ত পরোক্ষ যোগ ছিল। আরও রহস্য এই যে মাত্র পঞ্চাশ নম্বরের উত্তর বাংলা ভাষায় লিখতে হ'তো—বাকি সাড়ে সাতশ নম্বর ইংরাজিতে। এ ১৯২০ সালের কথা। এ পাঠ্যক্রম চলেছিল ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকায় তৃতীয় বর্ষের (১৯৭৫) সংখ্যায় শ্রীঅ. কু. ব. লিখিত বাংলা পাঠ্যক্রমের বিবর্তন প্রবন্ধ থেকে বর্তমান প্রবন্ধ রচনায় আমি সাহায্য ও দিগ্দর্শন পেয়েছি। এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে ঐ প্রবন্ধটি অবশ্য পঠনীয়।

১৯৩৩ সালে বিভাগীয় অধ্যক্ষ হলেন অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, তার আগে ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। বিভাগীয় প্রধানের অভিরুচি পাঠ্যক্রমে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। দীনেশচন্দ্র ছিলেন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের অনুরাগী আর খগেন্দ্রনাথ ছিলেন বৈষ্ণব সাহিত্যের এবং সেই সঙ্গে বর্তমান সাহিত্যের। খগেন্দ্রনাথের সময়ে বর্তমান সাহিত্য পাঠ্যক্রমে প্রবেশ লাভ করেছে। তারপরে ১৯৪৬ সালে বিভাগীয় প্রধান হয়ে এলেন অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ইংরাজি সাহিত্যে পণ্ডিত সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যেও বটে। তিনি সমস্ত পাঠ্যক্রম ঢেলে সেজে ইংরাজি পাঠ্যক্রমের সঙ্গে বাংলার সমতা স্থাপিত করতে চেষ্টা করলেন। কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও এখনো সেই ধারা চলছে মনে করলে অন্যায় হবে না। বর্তমান বিভাগীয় অধ্যক্ষের প্রচেষ্টায় যে পরিবর্তন হয়েছে তার বিবরণ তাঁর লিখিত প্রবন্ধে আছে। বাংলা এম. এ. সংশোধিত পাঠক্রমের ১৯৭৬ সালের বিবরণ এই প্রবন্ধে আছে, তাতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ৭ম ও ৮ম পত্র। এই দুই পত্রে দশটি নূতন বর্গ সংযোজিত হ'য়েছে, কতক নূতন কতক পুরাতন ধারার অন্তর্গত। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে, এখন এই পর্য্যন্ত।

এখানে একটি সাধারণ বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। প্রত্যেক যুগে নানা কারণে একটি বিশেষ ভাষাকে অবলম্বন ক'রে যুগবিদ্যার ধারা প্রবাহিত হয়। এ-যুগে সেই ভাষা ইংরাজি। এক সময় এ দেশে সেই ভাষা ছিল সংস্কৃত, পরে কতক পরিমাণে ফার্সি, তারপর থেকে ইংরাজি। ইংলণ্ডের সঙ্গে এদেশের রাজনৈতিক যোগ তার একটা প্রাথমিক কারণ। কিন্তু যে-সব দেশের সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক যোগ ঘটেনি, সে-সব স্থানেও ইংরাজি ভাষার চর্চা বাড়ছে। শুনতে পাই চীন দেশেও এখন ইংরাজি ভাষার চর্চা সুরু হয়েছে। আমরা ইংরাজকে তাড়িয়েছি, এখন ইংরাজিকে তাড়াতে পারলে বাঁচি। শুনেছি ইতিমধ্যেই দেশের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি ছাড়াই বি-এ পর্য্যন্ত পাশ করা যায়। আমাদের কাণ্ডজ্ঞান কিছু বেশি বলেই হোক কিম্বা অন্য কোন কারণে আমরা ইংরাজিকে তাড়াইনি, তবে তাকে তরল করে ফেলেছি। এই তরলীকরণের ফলে ইংরাজি পাঠ্যক্রমের চাপ কমে গিয়েছে, আর কমে গিয়েছে ইংরাজি পাশ নম্বর। এর প্রতিক্রিয়া বাংলা পঠন পাঠনের উপরে হ'তে বাধ্য। তার উপরে আবার সংস্কৃতর অনার্স ছাত্রছাত্রীর পক্ষে বাংলা এম-এ ক্লাসে ভর্তি হওয়া চলে না। তার ফল হয়েছে এই যে নবাগত ইংরেজি সাহিত্যের ধারা ও প্রথাগত সংস্কৃত ধারার সঙ্গে বাংলা এম-এর পাঠ্যক্রমের যোগ শিথিল হয়ে এসেছে। যদিচ বাংলা সাহিত্যের নয়। বাংলা পাঠ্যক্রম বাংলা সাহিত্যের ধারাকে অনুসরণ করবে এটা বাঞ্ছনীয়। তাতে বিঘ্ন ঘটছে। নব্য বাংলা সাহিত্যের ভূপ্রকৃতি কি! নবাগত ইংরাজি ভাষা, প্রথাগত সংস্কৃত ভাষা এবং দেশাগত বাংলা ভাষার ত্রিবেণীর মুখে যে পলিমাটি জমছে তাকেই বলি বাংলা সাহিত্যের ভূপ্রকৃতি। এই তিনটির মধ্যে দুটির সঙ্গে যোগ যদি শিথিল হয়ে আসে তবে এই পলিমাটির স্বরূপজ্ঞান অসম্পূর্ণ হ'তে বাধ্য।

মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচিত সাহিত্য সম্বন্ধে সম্যকজ্ঞান যা নাকি এম-এ পাশ ছাত্রছাত্রীর পক্ষে একান্ত আবশ্যক তা কতদূর কি হচ্ছে। অবশ্য এম-এ পাঠ্যক্রমে ইংরাজি ও সংস্কৃত কিছু কিছু পড়াবার ব্যবস্থা হ'য়েছে, কিন্তু এ যেন কতকটা পত্রের শেষে 'পুনশ্চ' দিয়ে ২।৪ ছত্র যোগ ক'রে দেওয়ার মতো। এই কি যথেষ্ট? আমার ধারণা নয়। এখন যাঁরা বাংলা এম. এ ক্লাসে ভর্ত্তি হন নব্য সাহিত্য বুঝবার পক্ষে তাঁদের ইংরাজি ও সংস্কৃত যথেষ্ট নয়। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার এম-এ ক্লাসে পড়াতে গিয়ে দেখেছি ইংরাজি সাহিত্যের অতি সুপরিচিত নাম করলেও তারা বুঝতে পারে না। দোষ তাদের নয়। তাদের বি-এ পাঠ্যক্রমে মাত্র একশ নম্বর ইংরাজি, তার মধ্যে বিরাট ইংরাজি সাহিত্যের ভাগ্যে পঞ্চাশ নম্বরের বেশি জোটেনি, বাকি Composition প্রভৃতি। এখানেও দোষ বাংলা পাঠ্যক্রমের নয়; দোষ কতকটা দেশের হাওয়ার, কতকটা ভাগ্যের। এখন, দোষ যাঁরই হোক, শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াচ্ছে এই যে বাংলা পাঠ্যক্রম ও নব্য বাংলা সাহিত্যের মধ্যে একটা অবাঞ্ছনীয় ব্যবধান থেকে যাচ্ছে। বোধ করি এই ত্রুটির প্রতিকার নেই, কারণ দেশের হাওয়া অর্থাৎ দেশের মন এর প্রতিকূল আর আশঙ্কা ক্রমে প্রতিকূলতর হবে।

পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তব্য—

গতস্য শোচনা নাস্তি নীতি অবলম্বন ক'রে আগের পাঠ্যক্রম ছেড়ে দিয়ে ১৯৭৬ সালের পাঠ্যক্রম থেকে আরম্ভ করা যেতে পারে।

প্রথম পত্রের দ্বিতীয় অর্দ্ধে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সীমা ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত টেনে আনা হয়েছে, আগে ছিল ১৮৫০ সাল। আগের সীমা ও বর্ত্তমানের সীমা কোনটাই যুক্তিবহ নয়। ১৯৫০ সালটি সাহিত্যে বা অন্যকারণে বিশেষ চিহ্ন নয়, খুব কাছেও যদি সেই সীমা টেনে আনতেই হয় তবে ১৯৪১ সালকে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে—রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময়। ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত টেনে আনলে চলতি সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে, যার অধিকাংশ এখনো ইতিহাসের অঙ্গীভূত হয়নি, কোন কালে হবে কিনা সন্দেহ।

দ্বিতীয় পত্র ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক, অর্থাৎ সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ। একমাত্র পাঠ্যগ্রন্থ রঘুবংশের কিয়দংশ। কিন্তু রঘুবংশ কেন। বরঞ্চ শকুন্তলা হলে যথাযোগ্য হতো, কারণ তাতে মাঝে মাঝে প্রাকৃত আছে—রঘুবংশে প্রাকৃত নেই। তদুপরি পালি প্রাকৃত অপভ্রংশ জ্ঞান বাংলা সাহিত্যবোধে বিশেষ সহায়ক হবে মনে হয় না। ওটা বিশেষ পত্রের অন্তর্গত হওয়া উচিত।

আবশ্যিক পত্রগুলির ৪র্থ ও ৫ম পত্রে রবীন্দ্রনাথের মাত্র চারখানি গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি মাত্র উপন্যাস। বলাবাহুল্য এ দুই শ্রেষ্ঠ লেখকের আরও গ্রন্থ থাকা উচিত, নতুবা ভারসাম্যের অভাব সূচিত হওয়ার আশঙ্কা।

এবার বিশেষ পত্রগুলি। মঙ্গলকাব্যের ভাগে 'সিংহের অংশ' পড়েছে, একেবারে ২০০ নম্বর। মঙ্গল কাব্যের কি এতই গৌরব? দুখানি মাত্র মঙ্গলকাব্য, মুকুন্দরামের

চণ্ডীমঙ্গল এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল সাহিত্য পদবাচ্য আর এ দু'খানি বাংলা সাহিত্যের দু'খানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বাকি সমস্ত সাহিত্যের নয়, সাহিত্যের ইতিহাসের বিষয়। আবশ্যিক পত্রের তৃতীয় পত্রে একখানি মঙ্গলকাব্য অবশ্যপাঠ্য, তার উপরে আবার বিশেষ পত্রে পুরা ২০০ নম্বর। মঙ্গলকাব্যের প্রতি এ অহেতুক আকর্ষণের হেতু কি? বর্তমান বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তার যোগ কতটুকু? সেই সঙ্গে লোক সাহিত্যের। দ্বিতীয় বর্গের ৫ম পত্রে লোক সাহিত্যের ভাগে পড়েছে ১০০ নম্বর কিন্তু কার্য্যত ২০০ নম্বর বলতে হবে। "লোকগীতি, ছড়া, ধাঁধা প্রভৃতি" বস্তুতঃ সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের সত্যকার যোগ, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তার যোগ নিতান্ত ভাষাগত অর্থাৎ বাংলা ভাষায় এগুলি লিখিত এই পর্য্যন্ত। আবার পঞ্চম বর্গে "নাটক, রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যতত্ত্বে" পুরা ২০০ নম্বর।" এ-ও বাড়াবাড়ি। এর অসুবিধা কোথায় বোঝাতে চেষ্টা করি। পরীক্ষার্থীদের বিশেষ পত্রগুলির মধ্যে দু'খানি পত্র দিতে হয়। তারা পরীক্ষা পাশের জন্য স্বভাবতই সহজপথের পথিক। মঙ্গলকাব্য ও লোকসাহিত্য পরীক্ষা পাশের পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত পথ। তারা সেই দু'খানি পত্রই নেবে। শুনেছি এখনো তাই নেয়। এমন সহজপন্থা ছেড়ে কে সংস্কৃত ও ইংরাজি নেবে? এম-এ পাঠ্যক্রমে "ছড়া, ধাঁধা প্রভৃতি"—(এই প্রভৃতির মধ্যে আরও কত কি আছে জানি না)—বিষয়ের অবতারণায় বাংলা এম-এ পরীক্ষা কতকটা খেলো হ'য়ে পড়বে বলে আশঙ্কা। এবারে যদি কোন হিতৈষী গুরুজন অট্টহাস্য করে ওঠেন তবে তাঁকে দোষ দেওয়া যাবে না। এখনো পাঠ্যক্রমের এই অংশ সংশোধনের উপায় আছে কিনা জানিনা, থাকলে তার সম্বন্ধের হেরফের অবিলম্বে সংশোধন করা আবশ্যক।

পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে তৃতীয় বক্তব্য—

একবার কোন প্রতিবেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ পাঠ্যক্রম নির্ধারণ কমিটিতে গিয়ে দেখি হেম নবীন মারা পড়েছেন অর্থাৎ তাঁরা সাকুল্যে বাদ। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে ওদের আর কেউ পড়ে না, ও ভাবে ও ভাষায় কেউ লেখে না তাই বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন করলাম তবে বৌদ্ধ গান ও দোঁহা কেন, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কেন? এ সব কি কেউ পড়ে, এ ভাবে এ ভাষায় কেউ লেখে কি? হেম নবীন তবু পড়লে বোঝা যায়—ও গুলোর ভাষা তো অবোধ্য। এগুলির প্রতিযুক্তি না থাকায় সে যাত্রা হেম নবীন গাড়ী চাপা পড়তে পড়তে রক্ষা পেয়ে গেলেন। জানি না পরেও রক্ষা পেয়েছেন কিনা। আমি হেম নবীনের বিশেষ যে পক্ষপাতী তা নই। হেমচন্দ্রের গোটাকতক সামাজিক ব্যঙ্গ কবিতা এবং নবীনের পলাশীর যুদ্ধ এবং ও আমার জীবন (বাংলা সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ) ছাড়া কি পাঠ্য আছে জানি না। তবে তাঁরা যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অঙ্গীভূত হয়েছেন সন্দেহ নাই, কাজেই সাহিত্যে তাঁদের স্থান সঙ্কীর্ণ হলেও ইতিহাসে তাঁদের স্থান চিরকাল থাকবে। কিন্তু এমন যে ভ্রান্তি ঘটে, যেমন ঘটবার উল্লেখ এইমাত্র করলাম তার কারণ আমরা সব সময়ে মনে রাখি না যে বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাহিত্য সভা ও মাসিক

পত্রের কাজ ভিন্ন। সাহিত্যসভা ও মাসিক পত্রের কারবার চলতি সাহিত্য নিয়ে। যে সব রচনা নিত্য নিয়ত লিখিত হচ্ছে, ক্ষণকালের জন্য আনন্দদান করে লোপ পাচ্ছে সাহিত্য সভা ও মাসিক পত্রের অধিকার সেই সব রচনায়। তাদের মধ্যে কিছু কিছু রচনা স্বকীয় সত্যের জোরে টিকে যাচ্ছে এবং কালক্রমে স্থায়ী সাহিত্যের আসনে স্থান লাভ করে ইতিহাসের অঙ্গীভূত হচ্ছে। এইসব রচনাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার। যে কোন সভ্য দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় এই নিয়ম মেনে চলে। যে-সব রচনা এখনো তরল অবস্থায় আছে, যাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, গোষ্ঠীবিশেষ বা স্তাবক গোষ্ঠীর হস্তক্ষেপে যারা সাময়িক গুরুত্ব লাভ করেছে, সাধারণ পাঠক সমাজে যারা এখনো প্রবেশাধিকার পায়-নি, ভ্রান্ত সাহিত্যানুরাগের বশে বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত করে দিয়ে কৃত্রিম অমরতা দানের চেষ্টা নিতান্ত ক্ষতিকর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ থাকবার ফলে স্থায়ী সাহিত্য বা মহৎ সৃষ্টি বলে শিক্ষকের ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। এর পরিণাম এই যে তুচ্ছকে স্থায়ী ও মহৎ মনে করবার ফলে লোকের রুচিবিকার ও বিচার বিভ্রাট ঘটে আর বিশ্ববিদ্যালয় যদি তার সহায়ক হয় তার চেয়ে পরিতাপের আর কি হ'তে পারে! এখন মাথা গুণে সত্য নির্ধারণের যুগ, এর মধ্যে মাথা ঠিক রেখে মস্তিষ্ক চালনা করতে হয় কমিটির সদস্যদের। তা যে সম্ভব হয় না তার কারণ হয় চক্ষুলজ্জা নয় ইতিমধ্যেই সরষেয় ভূত আশ্রয় করেছে—অর্থাৎ রুচিবিকার ঘটে গিয়েছে। প্রতিবেশী বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেই পথে না নেমে প্রাচীন সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় যথা অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের পাঠ্যক্রমের দিকে দৃষ্টিপাত করে নীতি নির্ধারণ করা কর্তব্য ছিল। সাহিত্যে অদ্যতন মানে শ্রেষ্ঠ নয়, আবার পুরাতন মানে নিকৃষ্ট নয়। এ নীতি জামা কাপড় সম্বন্ধে চলতে পারে সাহিত্য সম্বন্ধে অচল, অন্ততঃ তাই হওয়া উচিত।

চতুর্থ বক্তব্য—

বাংলা এম. এ-তে অবিলম্বে ইংরাজি পাঠ্যক্রমের মতো একটি Group B বিভাগ পত্তন অত্যাবশ্যক। তাহলে সাহিত্যের যে সব বর্গ যেমন অপভ্রংশ, পালি, প্রাকৃত এবং গৌণ মঙ্গলকাব্য, লোকসাহিত্য অনধিকার প্রবেশ করে এম-এর আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক পত্রে যে স্থান সঙ্কীর্ণতা ঘটিয়েছে তার প্রতিকার হয়। আর তার চেয়েও ভাল হয় গৌণ মঙ্গল কাব্য ও লোক সাহিত্যকে সরাসরি Sociology ও Anthropologyর বিভাগে স্থানান্তরিত করা। ওর সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক কেবল ভাষাগত অর্থাৎ বাংলা ভাষায় লিখিত একথা আগেই বলেছি। ইংরাজি এম. এ. পাঠ্যক্রমে কই ওসব তো নাই, এমন কি নীরস Group B-তেও নাই, বাংলায় হঠাৎ এমন উদ্ভট খেয়াল হ'লে চলবে কেন? বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রেরণায় কেউ এম. এ ডিগ্রি নিতে আসে না। আসে ব্যবহারিক প্রয়োজনে। ধাঁধার উত্তর শিখে সে প্রয়োজন কতটুকু সিদ্ধ হয়? U.G.C.-র কল্যাণে এখন অর্থের অপ্রতুলতা নাই। বিভাগীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের

উচিত আগৌণে অর্থ সংগ্রহ ক'রে Group B খুলে Group A-র স্বকীয়তা ও সাধনার পথ বিঘ্নরহিত করা।

এসব কথা অনেকদিন থেকে বলবার ইচ্ছা ছিল এবারে সেই সুযোগ দেওয়ার জন্যে উদ্যোক্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।*

* এখানে যে সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্যার অবতারণা করা হইয়াছে তাহা লেখকের ব্যক্তিগত মতামত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। —সঃ অবশ্যই—লেঃ

উত্তরবঙ্গ ঃ মধ্যযুগের বাংলা-চর্চা

তরণীকান্ত ভট্টাচার্য

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাঙ্‌লা সাহিত্যের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের দান সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপক আলোচনার সুযোগ এখনও নাই ; ভবিষ্যতে কি হইতে পারে তাহারও পূর্বাভাস দেওয়া চলে না। প্রধান কারণ, এই অঞ্চলে পুঁথিশালা গড়িয়া উঠে নাই। পুঁথিসংগ্রহ না করিয়া মধ্যযুগের এই অঞ্চলের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার কথা ঠিকমত বলা কঠিন। স্বল্পসঞ্চিত পুঁথি যাহা কুচবিহার স্টেট লাইব্রেরীতে ছিল এবং ছিল কুচবিহার সাহিত্য সভায়, তাহারও উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ হইতেছে কিনা বলা কঠিন। ইহা ছাড়া মালদহ মিউজিয়ামে কিছু পুঁথি থাকিতেও পারে। কিন্তু একটি বড় অঞ্চলের পক্ষে ইহা অতি সামান্য। রংপুর সাহিত্য পরিষদ এবং বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটিতে যাহা কিছু ছিল তাহা দেশবিভাগের ফলে নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

একথা অবশ্য খুবই বিশ্বাস্য যে যে-বিরাট অঞ্চলটিতে বাঙলা ভাষার দুইটি উপভাষা কামরূপী ও বরেন্দ্রী চলিত সেখানে মধ্যযুগে সাহিত্য সাধনা না হইয়াই পারে না। এ পর্যন্ত নমুনাও অনেকই পাওয়া গিয়াছে ; কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই যে এই অঞ্চলের নানা সমাজস্তরে এককভাবে যে পুঁথিগুলি ছিল তাহা দ্রুতবেগে অবলুপ্ত হইয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। এই অঞ্চলে অনুসন্ধানও তেমন হয় নাই। দুইচার জায়গায় সংগ্রহ করিতে যাইয়া দেখা গিয়াছে পরিবারের অমঙ্গল আশঙ্কায় অথবা ছেলেকে একটি চাকুরী যোগাড় করিয়া দেওয়ার সর্ত ছাড়া পুঁথি অন্যের হাতে তুলিয়া দিতে পুঁথির মালিক নারাজ।

যে অঞ্চলে দুইটি উপভাষা চলিত তাহারও অনেকটাই চলিয়া গিয়াছে অধুনা দুষ্প্রবেশ্য বাঙলা দেশে অথবা আসাম প্রদেশে। উভয় অংশেরই সংবাদ সংগ্রহ ব্যক্তিগত চেষ্টায় বিফল হইতে বাধ্য। এককালে এই অঞ্চলেও বিবাহাদি উপলক্ষে হয়তো আদিরসাত্মক গান গাওয়ার রেওয়াজ ছিল। তাহার নায়কও ছিলেন কৃষ্ণ। পরে রাধা আসিয়া জোটায় এই অঞ্চলের ধামালী গানের উদ্ভব হওয়া সম্ভব ; শোনা যায়, কৃষ্ণধামালির পুঁথি কুচবিহারের গ্রামাঞ্চলে এখনও পাওয়া যায়। ইহা ছাড়াও বেহুলার ভাসান, সোনারায়, ধরমঠাকুর, গোরখনাথ, সত্যপীরের গান বা ছড়া এই অঞ্চলে এখনও মিলিতেছে ; ইহা হইতে অনুমান করা চলে যে—ইহাদিগকে লইয়া ছোটবড় নানা কাহিনী কাব্যও গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বভারতী প্রকাশিত গোর্খ বিজয়ের ও নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রকাশিত মীনচেতনের পুঁথি দুইটিই উত্তরবঙ্গ হইতে সংগৃহীত। ‘গুপীচন্দ্রের সন্ন্যাস’ নামক

গ্রন্থটি সুকুর মামুদের রচনা—সুকুর মামুদ রাজশাহী জেলার সিন্দুরকুসুমী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

মানকর ও দুর্গাবর নামে দুই কবি দুইখানা মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। উভয়ের কাব্যেই বিশ্বসিংহের নাম উল্লিখিত হওয়ায় মনে হয় দুই কবিই কুচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহের রাজ্যের ও আমলের লোক। বিশ্বসিংহ রাজত্ব করেন আনুমানিক ১৪৯৬ হইতে ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। মানকরের গ্রন্থে শিবের বংশীবাদন ও কোচরমণীতে আসক্তির কথা উল্লিখিত; গঙ্গার পুত্রের নাম দেওয়া আছে 'ভাঙ্গুর'। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই দুর্গাবর রচিত রামায়ণের অরণ্য-কাণ্ডের অনুবাদ সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে; ইহা এক কৃষকের বাড়ীতে মাচার উপর অন্য কয়েকটি পুঁথির সহিত রক্ষিত ছিল; কিন্তু পরবর্তীকালের সন্ধানে অন্য পুঁথিগুলির একটিও পাওয়া যায় নাই। সোনারায়ের একটি ছোট পুঁথিও সম্প্রতি মালদহ হইতে প্রকাশোন্মুখ। কুচবিহাররাজ বিশ্বসিংহের আমলে পীতাম্বর দাস ভাগবতের দশম স্কন্ধের একটি মূলানুগ অনুবাদ করিয়াছিল; মূলানুগতার দিক হইতে এই অনুবাদ মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। পীতাম্বর মার্কণ্ডেয় পুরাণেরও বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। নলদময়ন্তী নামে একটি কাব্যও তাঁহার রচনা বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু একটি প্রাচীন পুঁথিতে দেখিয়াছি কোন গ্রন্থকারের নাম ভণিতায় নাই। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় 'উষা-অনিরুদ্ধ' নামে অপর একটি পৌরাণিক কাব্যও পীতাম্বরের রচনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণের আমলে (আঃ ১৫৩৩-৮৭) রাম সরস্বতী মহাভারতের ৭টি পর্বের বাঙ্‌লায় অনুবাদ করেন বলিয়া জানা যায়। এতদ্ব্যতীত কংসারি, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও কলাপচন্দ্র দ্বিজ, যথাক্রমে বিরাট ও কিরাত পর্বের, ভবিষ্যৎ পুরাণের এবং ভাগবত ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ স্কন্ধের অনুবাদ করেন। এই কলাপচন্দ্রই 'রামায়ণ-চন্দ্রিকা' লেখেন। অনন্তকন্দলীও এই সময়েই শ্রীরামকীর্তন লেখেন। মাধবকন্দলী রামায়ণের ছয়টি কাণ্ডের এবং শঙ্করদেব সপ্তম কাণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত করেন। রামায়ণচন্দ্রিকা ও শ্রীরামকীর্তন রামায়ণের আশ্রয়ে লিখিত হইলেও ইহারা গান গাওয়ার প্রয়োজনে অনেকটা স্বাধীন রচনা। অনন্তকন্দলী, মাধবকন্দলী ও শঙ্করদেব এখন অনেকটা অসমীয়া সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু মূলে তেমন না থাকারই কথা। কারণ তাঁহাদের রচনা নরনারায়ণের রাজ্য মধ্যেই ঘটিয়াছিল এবং তাঁহারা রাজভ্রাতা চিলা রায়ের (শুক্লধ্বজের) অনুগ্রহপুষ্ট ছিলেন।

কোচবিহাররাজ লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকালে (আনুমানিক ১৫৮৭-১৬২৭) গোবিন্দ মিশ্র ভগবদ্গীতার অনুবাদ সমাপ্ত করেন এবং এই অনুবাদকালে তিনি কয়েকটি টীকারও সাহায্য লইয়াছিলেন। বিপ্রবিশারদ মহাভারতের বনপর্ব, বিরাট-পর্ব ও কর্ণপর্বের অনুবাদ করেন। রামচন্দ্র জৈমিনি সংহিতা অনুসরণে অশ্বমেধ

পর্বের অনুবাদ করেন। রাজা বীরনারায়ণের আমলে কবিশেখর বিরাট পর্বের অনুবাদ করেন।

রাজা প্রাণনারায়ণ নিজে বিদ্বান ছিলেন—শোনা যায় তিনি অনেকগুলি গানের রচয়িতা—কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের ফলে এই সব গান ভস্মীভূত হয়। এই রাজার অন্যতম সভাকবি শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ। তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর নামে একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। শ্রীনাথ মহাভারতের আদি পর্বের অনুবাদ সমাপ্ত করিয়া দ্রোণপর্বের প্রায় অর্দ্ধেকের অনুবাদ করেন। এই সময়ে অপর সভাকবি রামেশ্বরও মহাভারতের কয়েকটি পর্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। শ্রীনাথ 'বিশ্বসিংহচরিতম্' নামে সংস্কৃতে ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কবিরত্ন নামক অপর একজন লেখক রাজখণ্ড নামে অপর একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা অধুনালুপ্ত। রাজা মোদনারায়ণের আমলে (১৬৬৫-১৬৮০) দ্বিজকবিরাজ শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের অসমাপ্ত দ্রোণপর্বের অবশিষ্ট অংশের অনুবাদ করিয়া পর্বটি সমাপ্ত করেন। রাজা মহীন্দ্রনারায়ণের আমলে নিত্যানন্দ ঘোষ ভীষ্ম, সভা, শল্য ও নারীপর্বের অনুবাদ করেন। দ্বিজরামও ভীষ্মপর্বের অপর একটি অনুবাদ একই সময়ে করেন। কৃষ্ণানন্দ বসু শান্তি ও স্বর্গারোহণ পর্বদ্বয়ের অনুবাদ করেন এবং রামনারায়ণ দ্রোণপর্বের অনুবাদ সমাপ্ত করেন। রাজা উপেন্দ্রনারায়ণের আমলে (১৭১৪-১৭৬৩) দ্বিজনারায়ণ নারদীয় পুরাণের উত্তর ভাগের অনুবাদ করেন।

রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ (১৭৮৩-১৮২৯) এই অনুবাদ-উৎসাহে এই রাজবংশে অদ্বিতীয়। তিনি নিজে আগমনী সঙ্গীত, দুর্গাস্তব, শ্যামা সঙ্গীত, নারদ-হিমালয় সংবাদ প্রভৃতি রচনা করেন। মহাভারতের সভা, শল্য, ঐশিক ও শান্তিপর্বের অনুবাদ তিনি নিজেই করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার উৎসাহে নানা বিদ্বান্ ব্যক্তি মহাভারতের বিভিন্ন পর্বের, রামায়ণের বিভিন্ন কাণ্ডের ও কয়েকটি মহাপুরাণ ও উপপুরাণের অনুবাদ সমাপ্ত করেন। অনুবাদের তালিকা সংক্ষেপে এইরূপ :—

মহীনাথ—প্রাস্থানিক, অশ্বমেধ ও বনপর্বের অংশ

দ্বিজ রঘুরাম—আদি, ভীষ্ম, শান্তি এবং বনপর্বের অংশ

ব্রজসুন্দর—সভাপর্ব

লক্ষ্মীরাম—কর্ণপর্ব

বৈদ্যনাথ—মুষল, শান্তি এবং বনপর্বের অংশ

রুদ্রদেব—আদি

বলরাম
পরমানন্দ
রঘুরাম
মাধবানন্দ } —একত্রে বনপর্বের পাঁচ অধ্যায় পর্যন্ত; পরে মহীনাথ ইহা সমাপ্ত করেন।

দ্বিজ কীর্তিচন্দ্র—আশ্রমিক, জয়দেব—সভাপর্বের অংশ, দ্বিজরামনন্দন—শল্যপর্ব, রাজা স্বয়ং স্কন্দপুরাণের অংশ ও বৃহদ্ধর্মপুরাণের অংশ অনূদিত করেন। সভাকবি রিপুঞ্জয় ও রঘুরামের সহিত মিলিত হইয়া রাজা পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসার অনুবাদ করেন। বৈদ্যনাথ ও রিপুঞ্জয় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের, ব্রজসুন্দর ও রামনন্দন নৃসিংহপুরাণের, রামনন্দন ধর্মপুরাণের, মাধব বিষ্ণুপুরাণের, সারদানন্দ ব্রহ্মবৈবর্তের অংশের, দ্বিজ জগন্নাথ ভাগবতপুরাণের অংশ, মণিরাম দাস গরুড় পুরাণের এবং ধর্মেশ্বর মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুবাদ করেন। শ্রীনাথ দ্বিজ, দেবীনন্দন, দ্বিজরঘুনাথ যুক্তভাবে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের অনুবাদ করেন। দ্বিজরঘুনাথ, সারদানন্দ ও শতানন্দ যুক্তভাবে উত্তরাকাণ্ডের, দ্বিজরঘুনাথ অযোধ্যাকাণ্ডের, ব্রজসুন্দর লঙ্কাকাণ্ডের এবং দ্বিজ রুদ্রদেব-অরণ্যকাণ্ডের অনুবাদ করেন। দুর্গাদাস রচিত হরভক্তিতরঙ্গিণী ও জগদ্দুর্লভ বিশ্বাস রচিত 'সঙ্গীত শঙ্কর' গ্রন্থদ্বয়ে এই রাজার রাজত্বকালের বিবরণ পাওয়া যায়। সভাকবি রিপুঞ্জয় রচনা করেন রাজবংশাবলী। শিবেন্দ্রনারায়ণ মহীনাথকে দিয়া মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ও দ্বিজ বৈদ্যনাথকে দিয়া শিবপুরাণের অনুবাদ করান। ইহার আমলেই মাধবচন্দ্র লেখেন চণ্ডিকার ব্রতকথা। শিবেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী বৃন্দেশ্বরী লেখেন বেহারোদন্ত। নরেন্দ্রনারায়ণের মুন্সী জগন্নাথ ঘোষ লেখেন রাজোপাখ্যান। প্রায় সমসাময়িক রচনা দরং রাজবংশাবলী, খড়্গনারায়ণের বংশাবলী ও স্বর্গনারায়ণের বংশাবলী; এই তিনখানাই পূর্ব-কামরূপ রাজবংশের বিবরণ। কুচবিহার রাজবংশের বঙ্গভাষা প্রীতির নিদর্শন—প্রাচীনপত্র সঙ্কলন নামক ছাপাপো বইএ বিধৃত।

একটি প্রাচীন রাজবংশ বাঙলা সাহিত্যের অনুবাদ শাখায় যাহা দান করিয়া গিয়াছে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়। কিন্তু ইহার সবকিছুই কাল কবলিত হওয়ার আশঙ্কাই বেশী। আশ্চর্যের বিষয়, আরও একটি সুপ্রাচীন রাজবংশ উত্তরবঙ্গে ছিল। সেই দিনাজপুর রাজবংশের কোন দানের কথা আজও জনসমাজে অজ্ঞাত। সম্প্রতি এই বংশের বিবরণ-সম্বলিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও মুদ্রিত একটি পুঁথি আমাদের হাতে আসিয়াছিল। ভিতরে কি আছে না আছে তাহা এখনও অজ্ঞাত। একমাত্র ব্যতিক্রম এই বংশের রাজা প্রাণনাথের আমলে কুচিয়ামোড়া গ্রামের জগৎজীবন ঘোষালের রচনা মনসামঙ্গল (আঃ ১৭০০ খৃঃ)। নরোত্তম দাসের বৈষ্ণবভূমি খেতরী এই অঞ্চলেই অবস্থিত। রংপুরের কবি দ্বিজকমললোচন চণ্ডিকা-বিজয় রচনা করিয়াছিলেন। বগুড়া জেলার কবি জীবন মৈত্র (১৭৪৪ খৃঃ) রচনা করেন মনসামঙ্গল। মালদহের প্রাচীন কবি চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা মাণিক দত্তকে ইতিহাসকারগণ সকলে এখনও প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃতি দিতে পারেন নাই। মালদহ জিলায় অপর এক গ্রন্থ মনসামঙ্গল—রচয়িতা তন্ত্রবিভূতি। মনসা সম্পর্কিত উত্তরবঙ্গীয় ধারাটি নাকি তন্ত্রবিভূতিতেই ভালভাবে রক্ষিত। কুচবিহার জেলার গোসানীমারীতে আরাধিতা গোসানী দেবীকে কেন্দ্র করিয়া কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত

গোসানীমঙ্গল নামক কাব্যের রচয়িতা রাধাকৃষ্ণ বৈরাগী ; এই রাধাকৃষ্ণ কুচবিহার রাজ হরেন্দ্র নারায়ণের নাম তাঁহার কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে মনে হয় তিনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

অনুসন্ধান করিলে উত্তরবঙ্গের মধ্যযুগীয় বাঙ্‌লা সাহিত্যের আরও অনেক গ্রন্থই বাহির হওয়ার সম্ভাবনা। উপরে যেটুকু বলা হইল তাহা হইতে ইহা বিশ্বাস করা চলে যে অন্ততঃ মধ্যযুগে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সংস্কৃতিহীন ছিল না।

বাংলা কবিতা ও জর্মন মানস

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

জর্মনিতে গত ক'বছর ধরেই আধুনিক চিত্রকলা/কবিতা বিষয়ে একটি নম্র অথচ নিশ্চিত এষণা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সহসা কেন আজ ওদেশে জীবনানন্দের কবিতা বা সুনীল দাসের পপ-কোলাজ নিয়ে এরকম একটি ঔৎসুক্য জায়মান, সেটির অন্তত একটি প্রত্যক্ষ কারণ খনন করে নিতে অসুবিধে হয় না। উইলিয়াম জোন্‌সের ইংরেজী শকুন্তলা থেকে গিয়র্গ ফর্স্টরের 'সরাসরি পুনরনূদিত' জর্মন শকুন্তলা কালান্তর ঘটিয়ে দিয়েছিল জর্মনিতে একদিন। এই ক্রান্তিক্ষণও, গ্যোয়েটের ভাষায়, ঘটেছিল শান্ত ভঙ্গিতেই, ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে। গ্যোয়েটের কাছে এই বছরটি ছিল 'একটি আত্মস্থ বছর' ('ein ruhiges Jahr'), জর্মন কবিতা ও সংগীতে যখন চারদিক থেকে সৃষ্টির প্রাণদ স্রোত এসে মিলতে শুরু করে দিয়েছিল। এই মোহানামুহূর্তের উপহার ভারতবিদ্যা। এই বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত যতই জীবিত হোক না কেন, ক্রমশই সেই সত্তার সংগীত পর্যবসিত হলো নিষ্ঠানিথর স্বরলিপির ব্যাকরণে। ভারততত্ত্ব আর পাণিনি প্রায় সমার্থসূচক দুটি শব্দের সংজ্ঞা হয়ে গেল বলে নব্য ভারতীয় আর্যভাষার গহনে কীরকম কাজ চলছিল এসম্পর্কে এই বিদ্যায়তনের শিবিরে এতটুকু সাড়া জাগেনি সেদিন। নাৎসি সময়েও যখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভারততত্ত্বের জন্যে নাকি তেরোটি প্রধান অধ্যাপকপদ মঞ্জুর হয়েছিল, তখনও, কিংবা তখনই হয়তো, ভারতচর্চা বিষয়টি একটি মর্যাদা-প্রতীকে পরিণত হয়ে উঠল।

মহাযুদ্ধোত্তর কালে নিঃসন্দেহে ভারতবিদ্যার অন্তঃশরীরে বারংবার সমকালীন ভারতীয়তার একটি বেপথু-টান তৈরি করবার চেষ্টা করেছেন অনেকেই। এই প্রয়াস সম্প্রতি সার্থকতা পাচ্ছে কোনো-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ঃ প্রত্নভারতবিদ্যা থেকে উদ্‌ভিন্ন এবং সৃষ্টির নিয়মে বিশ্লিষ্ট হয়েই দেখা দিচ্ছে 'নতুন ভারতবিদ্যা'। আজকের অমসৃণ, অমীমাংসিত এবং উত্থানভঙ্গুর ভারতবর্ষের সমস্ত রকম নান্দনিক প্রবর্তনা এই বিদ্যার পরিধিভুক্ত। তাই হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রশাখার উদ্যোগে কয়েকমাস আগে রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ী কবিতার অনুবাদকই প্রকাশ উপলক্ষে যে-উৎসব আয়োজিত করেছিল, তার উদ্দীপন-অনুষঙ্গে শুধু রবীন্দ্রনাথের ছবিই নয়, এখনও প্রায়-অনামিক একটি মেধাবী তরুণ বাঙালির (সমীর দত্তগুপ্ত) অবচেতনাশ্রিত অনেকগুলি ছবিও প্রদর্শিত হয়েছিল। আর তার ফলে উপস্থিত বিদগ্ধ ও অদীক্ষিত ভাবুকদের মনেও সহজে সংক্রমিত হতে পেরেছিল রবীন্দ্রনাথের দুর্মর সাম্প্রতিকতা, যা কোনো-দিনই গীতাঞ্জলির নানা-হাতে-ঘোরা ভাষান্তরের সৌজন্যে মেলেনি। একদা রবীন্দ্র-

অস্পৃহ পণ্ডিতেরা বলাবলি করতে থাকলেন: 'এই রবীন্দ্রনাথকে তো আমরা চিনতুম না। ইনি যে আমাদেরই গটফ্রীড বেন্-এর মতোই একজন আধুনিক কবি।'

আসলে আধুনিকতা ও ভারতীয়তা যে দুই মেরুর ব্যাপার নয়, এ সম্পর্কে আমাদের দেশে কি ওদেশের পণ্ডিতবর্গের মানসে কিছুদিন আগে পর্যন্তও কোনো বোধ আভাসিত হয়ে ওঠেনি। তাই ভারতীয় যে-অধ্যাপক হয়তো উনগারেত্তি কিংবা এনসেন্‌স্‌বার্গারে প্রত্যহ দু-বেলা গাহন করেন, তিনি কিশোর কবির ছন্ন 'উৎকেন্দ্রিক আধুনিক' একটি উচ্চারণও বরদাস্ত করতে পারেন না, তাঁর কেবলই মনে হতে থাকে, এই বুঝি আমাদের সাত পুরুষের ভিটের ভিত্তি ভাঙতে বসল। পক্ষান্তরে নামজাদা প্রাচ্যতত্ত্ব-বেত্তা সংবেদনশীল ইয়োরোপীয় ভাবুককেও দেখেছি যিনি নবীন স্পেনীয় কবির যাবতীয় ভাবার্জিত দৌরাত্মপনাও বাৎসল্যচোখে দেখতে ভালবাসেন, কিন্তু সইতে পারেন না বিলিতি পাৎলুন-পরা অনতি-উনিশ ভারতীয় ছাত্রের ধরনধারন, তাঁর কেবলই আশঙ্কা হতে থাকে তীর্থময় ভারতাত্মা বুঝি-বা কলুষিত হলো ট্যুরিজমের অভিচারময় উপসর্গে। কিন্তু জর্মনিতে আজকের বিদ্বান ভারতপথিকেরা এই অবিবেকী সরলীকরণের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলতার যে বিষময় দিকটি আছে, সেসম্বন্ধে সচেতন। এবং তাঁদের এই সচেতনতা শুধু ক্লাসঘরের বাগ্মিতায় ফুরিয়ে যায় না, সঞ্চারিত হয়ে যায় নিরন্তর চর্যা ও পার্বণে।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই স্বাভাবিক উদ্দীপনার কেন্দ্রে আছে বাংলাভাষা, পূব ও পশ্চিম বাংলাদেশে সৃজ্যমান সাহিত্য বিষয়ে এক জাগর শুভেচ্ছা। দুই বাংলার কবিতা নিয়ে জর্মন ভাষায় প্রকাশিত একটি সংকলন ওখানে (এবং অস্ট্রিয়া ও সুইৎজারল্যাণ্ডে) সাধারণ মানুষের হাতেও পৌঁচেছে। তাঁরা বাংলা কবিতার বিচিত্র-অথচ ঐকিক আয়োজন দেখে মুগ্ধ। স্বনামী সমালোচকেরা মাঝে মাঝে—ব্যাখ্যামন্থর বিশ্লেষণের বদলে—এক-একটি গোটা কবিতাই উদ্ধৃত করে দিচ্ছেন তাঁদের সমালোচনায়। তাঁরা অনুধাবন করেছেন, এই কবিতায় আছে ঐতিহ্যের সঙ্গে অঙ্গীকারের (আঁগাজমা) এক অনন্য অন্বয়।

অর্থাৎ অতীত ও বর্তমান—প্রাচ্য ও প্রতীচীর মধ্যে কোনো কৃত্রিম বিভাজন আজকের মানুষের মোক্ষ হতে পারে না। এবং সেই সঙ্গে একথাও প্রবলভাবে সত্য, আজ সারা পৃথিবী জুড়ে চৈতন্যের দ্রাঘিমা রেখায় যে-স্নায়ব সন্ধিৎসা দেখা দিয়েছে সেখানেই আমাদের স্বদেশ। আজকে মরাঠি কবির কবিতায় যদি প্রতীচীর নাগরিক জীবাত্মার জন্যে বাসনা জেগে ওঠে, বাঙালি কবির অন্ত্যমিলহীন সূক্তিতে যদি আচমকা তরুণ ত্রুবাদুরের তাগিদে ফরাসি মনস্কতা নিষ্ক্রান্ত হয়ে আসে, তাকে বিদ্রূপ করবার অধিকার নেই কোনো আর্য সমাজপতির। বিশ্বকবিতা আজ অনেকটা একই জায়গায় এসে পৌঁচেছে হয়তো। অগ্রণী ভাষাগুলির রিচ্যুয়ালের বৈচিত্র্য নিয়েই এই অনুভূমিক সামীপ্যের নিবিড় সমাচার। জর্মনির একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, বিষয় 'কবিতার জন্ম:

একটি সম্ভাব্য নন্দনতত্ত্ব'। সমীপকালীন ভারতের বিভিন্ন ভাষাশ্রিত কবিতার মধ্যে একটি সাদৃশ্যসূত্র সন্ধানের কাজে মেতেছিলেন এই সেমিনারের সতীর্থেরা। প্রধানত বাংলা, হিন্দি, মরাঠি, তামিল, কানাড়ি ভাষায় রচিত আধুনিক কবিতার একটি সংকলন তৈরি ক'রে স্বরচিত কবিতাবলি বিষয়ে কবিদের কাছ থেকে ভাষ্য দাবি করা হয়েছিল। এবং পরিশেষে যখন প্রাচীন সংস্কৃত / দ্রাবিড় অলংকার শাস্ত্র থেকে নব্য-ভারতীয় কবিতার প্রস্থানভূমির উচ্চারিত পার্থক্যটি পরিমাপ করা হলো, ইয়োরোপীয় কবিতার সঙ্গে তার চারিত্র প্রকৃতির আত্মীয়তায় আবিষ্ক্রিয়ার আনন্দ পাওয়া গেল। এ আত্মীয়তা অধমর্ণের সঙ্গে উত্তমর্ণের নিয়তিবিধুর ঘনিষ্ঠতার নামান্তর নয়। ভারতীয় কবিতা যে ইয়োরোপীয় কবিতার পাশাপাশি উপনীত হয়েছে এবং এ দুয়ের মধ্যে একটি দেয়া-নেয়ার মিলন ঘটতে চলেছে, এই তথ্যটিও বেরিয়ে এল। আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত কবিতার মধ্যে বাংলা ভাষায় নিবদ্ধ রচনারই সংখ্যা ছিল বেশি। বাংলা কবিতা যে অন্যান্যভাষী ভারতকবিতাকে স্পর্শ করছে, সেই অবলোকনও এড়িয়ে গেল না কারো সংবেদন।

এতদিন ভারততত্ত্ব বলতে যে কমনীয় একটি ছদ্ম-চিরায়ত ম্যমির লালনপালনের কাজটি চলছিল, তার পালা এখন শেষ হতে চলেছে বললে ভুল হবে না। এবং আজ সে জায়গায় আকর্ষণ কাড়ছে আজকের ভারতবর্ষের সাহিত্য যার শুমস্তক মণি কবিতা। এক্ষেত্রেও ভারতীয়তার প্রধান, যদিও বেসরকারি, দায়িত্ব নিচ্ছে বাংলা সাহিত্য, তার কবিতা। মিউনিখে একটি ভারত-জর্মন সংস্থার সভায় কিছুদিন আগে এই প্রথম একালের ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে আলোচনা সম্পন্ন হলো। বক্তা হিসেবে নিশ্চয়ই বর্তমান লেখকের মনে উপচেতন একটি প্রবণতা ছিল বাংলা কাব্য-জিজ্ঞাসাকে একটি নিখিল-ভারতীয় প্রাধান্য অর্পণ করার দিকে। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সংস্কারের ছিল বোধহয় এই প্রত্যাশা, যার অভিষেকে বাংলা-ভারত সমীকরণের প্রতিষ্ঠিত ঘটনাটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সেদিনের কথককে আত্যন্তিক অনৃত কথনের আশ্রয় নিতে হয় নি। বাংলা কবিতা সম্পর্কে জর্মনিতে নবজাগ্রত আগ্রহের একটি নিরিখ সম্ভবত মিউনিখের সেই সান্ধ্য অনুষ্ঠান।

বাঙলা ছোটগল্প (১৯৪৭-১৯৭০)

অরুণ বসু

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

উদ্ভিদবিজ্ঞানী এক নিশ্বাসের বক্তৃতায় কলমের গাছ সম্পর্কে ছোটখাট একটা তথ্যভার জ্ঞান দিয়ে দেবেন। বলবেন, গাছ থেকে কলম বানানো একটি আদিম প্রথা, তবে এই প্রথার বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলন ও উৎকর্ষ একালের উদ্ভিদবিজ্ঞানেরই দান। কলম করার কারণগুলির মধ্যে আছে, প্রকারের ও প্রজাতির স্বকীয় প্রবৃত্তি মেনে চলা, উদ্ভিদের বংশবিস্তার, অল্পসময়ে ফুল-ফোটানো ফুল-ধরানো, ছোট জায়গায় ছোট মাপের স্বল্পশাখান্বিত অনতিদীর্ঘ গাছ বানানো, দুর্বলমূল গাছের বংশবিস্তার, মূলের ব্যাধিদূরীকরণ, বাজে মাটির ত্রুটিসংশোধন ইত্যাদি। দেখে শুনে মনে হয়, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর থেকে আধুনিক বাঙলাসাহিত্যে ছোটগল্প বছর পঁচিশের মধ্যে একটি কলমের চারা থেকে দিব্বি বেড়ে উঠেছে। একালের ছোটগল্প উপন্যাসের অঙ্গজ বিস্তার মাত্র। এখন তার শিল্পরূপের অদ্বিতীয় মৌলিকতা নিয়ে কোনো পরীক্ষণ নেই, কেবল কথাশিল্পের বংশবিস্তারই এর লক্ষ্য। অল্প সময়ে ফুল ফোটানোর জন্য, অনতিদীর্ঘ পল্লবসহকার বানানোর জন্য সাহিত্যিকরা উপন্যাসের কাণ্ডে কন্দে-বদ্ধলে কায়দা করে গুটিকলম দাবাকলম শাখাকলম জোড়কলম বানাচ্ছেন। তারই নাম একালের ছোটগল্প। পূজাসংখ্যার প্রদর্শনীর তাগিদ, স্বল্প মূল্যে বিকোবার তাগিদ অথচ বৃহত্তর ক্রেতা পাঠকের নিঃস্পৃহতাই এই কলম-ব্যবসাকে পাকা করেছে। তারাশংকর প্রস্তূয়মান উপন্যাসকে ছোটগল্পের আকারে লিখতেন, মানিক উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলিকেই পূজা সংখ্যায় ছোটগল্প বলে ছাড়তেন। একালের শ্যামল সুনীল-সন্দীপনের ছোটগল্প-বড়গল্প-উপন্যাস শুধু ফর্মার ইতরবিশেষ মাত্র।

বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে ছোটগল্পের আসরে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন অদ্বৈত স্রষ্টা। কিন্তু তবু সমকালে গল্পগুচ্ছ সেই পরিমাণ বাঞ্ছিত জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। বরং প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সাময়িক পত্র-পত্রিকায় সেইজাতীয় ছোটগল্পই ছিল পপুলার, যেগুলি কথাসরিৎসাগরের উত্তরাধিকার, যেগুলি দিল্‌কৌতূহলখুশ্‌, দ্বিপ্রহরের ভানুমতী চিত্তবিলাস। কল্লোল যুগের নতুন কালের লেখকরাই ছোটগল্পের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন আত্মপ্রকাশের এক বিচিত্র সম্ভাবনা। জীবনানন্দের ভাষায়, 'জীবনের রূপ আর রক্তের নির্দেশ/পৃথিবীর কাম আর বিচ্ছেদের ভূমা—মনে হয়—এক তিলের সমান'। সেই তিলের জন্য সমরখন্দ বোখারা বিলিয়ে দেবার সংকল্পে মেজাজ দেখালেন দুঃসাহসী তরুণ কথাশিল্পীরা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই দেশ জুড়ে সাহিত্যের একটা নূতন পাঠক শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। মহাযুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশ ছোট-

গল্পের ভাণ্ডার পূর্ণ করে দিল বিধ্বস্ত দেশ ও জাতির রক্তবমনের উপকরণ দিয়ে। তিরিশ-চল্লিশের দশক ছোটগল্পে একালের সোনার পর্ব।

তারপর দেশবিভাগের অসহ অভিশাপ এবং সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃঘাতের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার নামাবলী গায়ে এল স্বাধীনতা। পঞ্চাশের দশক শুরু হল তারই দুঃস্বপ্ন নিয়ে। এল ছিন্নমূল কয়েক কোটি মানুষের জাগ্রত প্রলাপ, মাতৃহারা সন্তানের বিবর্ণ মুখ, স্বামীহারা বিধবার নিঃসহায় আর্তি, কৌমার্যহারা যুবতীর অমোঘ নরকবাসের নিমন্ত্রণ। ইস্টিশান প্লাটফর্ম পার্ক বারান্দা ক্যাম্প লাইসেন্সহীন মাংসের দোকান ক্ষুধা লোভ বেসাতি মুনাফা সর্বস্ব হারানো বিভীষিকা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় অবিশ্বাস্য বৈচিত্র্য এনে দিয়েছিল, পঞ্চাশের দশকের লেখকরা তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। সমাজতান্ত্রিক জার্মানির ব্রুনো আপিৎস, ফ্রান্সের লুই আরার্গঁ, ইতালির কোম্নেনজি, কিউবার গুইলারমো, ক্যাবরেরা, আলজিরিয়ার হেনরি অ্যালেগ, আরবের ইসান আবদেল কুদ্দুসের মত গল্পকার পঞ্চাশের দশকে এদেশে জন্মালে বর্তে যেতেন।

তিরিশের দশকের ছোটগল্প ছিল মনস্তত্ত্বপ্রধান, জটিল মনোবিকারের গ্রন্থি-উন্মোচক। প্লটও ছিল একমুখী ঘটনার খণ্ডযোজনা। চল্লিশের দশকের গল্পকারদের জীবন-অভিজ্ঞতায় ভয়ংকরভাবে এসে পড়েছিল মহাযুদ্ধ, আর মন্বন্তরের বীভৎসতা। মারী ও দাঙ্গা, ব্রিটিশ শাসনের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র, মানুষজন্তুর হুহুংকার, পণ্ডিতের মূঢ়তা, ধনীর দৈন্যের অত্যাচার, সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপ নিয়ে ছোটগল্পের আর্ট সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। সেইসঙ্গে গ্রাম-বাঙলার মাটি ও মানুষ, আঞ্চলিক জীবনের চাঞ্চল্য, শিল্পায়নের গ্লানি, শহরতলীর ম্লানালোক, মধ্যবিত্তের ধূমাঙ্কিত কালিমা ছোটগল্পের পটে শাণিত বর্ণে আঁকা হতে লাগল। চল্লিশের দশকে সাংকেতিকতা, বুদ্ধিদীপ্ত ভাষার নিপুণ ইঙ্গিত, রোমান্টিকতা ও নিরাসক্তি, কায়াগঠনের কুশলতা ছোটগল্পকে বিশিষ্ট শিল্পরূপ দান করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর বাঙলা ছোটগল্প তার পূর্ব মর্যাদার সুদ ভোগ করেছে, নতুন মূলধনে সমৃদ্ধ হতে পারেনি। দেশের ভূগোল-ইতিহাস-সংস্কৃতির পঞ্জরভেদী দ্বিখণ্ডীকরণ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, উদ্বাস্তু সমস্যা, দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান ঊর্ধ্বগতি, এবং মনুষ্যত্বের ক্রমক্ষীয়মান মূল্যবোধের বন্ধুর জমিতে পঞ্চাশের গল্পকাররা আসন গেড়েছেন। পূর্ববর্তী দশকের কয়েকজন গল্পকার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েছেন, কেউ কেউ অভিজ্ঞতার প্রৌঢ়ত্বে ও খ্যাতির সৌভাগ্যে শীর্ষ শ্রেণীতে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তরুণদের মধ্যেও অল্পবিস্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সঞ্চার হয়েছে।

ষাটের দশক ছোটগল্পকারদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়েছে, কিন্তু ছোটগল্পের শিল্পগুণ নষ্ট করেছে। চল্লিশ-পঞ্চাশের কিছু লেখক এই দশকে বিদায় নিয়েছেন, কয়েকজন ঐতিহাসিক রোমান্টিকতায় বা পৌরাণিক পরিহাসে পাশ কেটেছেন, কিছু লেখক উদ্ভট বিজ্ঞান-ভূগোল-শিশুরঞ্জনে নতুন পাঠক খুঁজেছেন, কেউবা নির্লিপ্ত হয়ে ছড়ার খইমুড়কি ছড়িয়েছেন। ষাটের দশকে ছোট গল্পের ইতিহাসে নিজস্ব কতকগুলি

প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ছোটগল্প একান্তই সাময়িক পত্রিকানির্ভর শিল্প হয়ে উঠেছে, গল্প সংকলনের প্রকাশক দুর্লভ হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের বাজারদর বেশি হবার ফলে ছোটগল্পের চেয়ে উপন্যাসের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠাই লেখকদের কাম্য হয়েছে, তাই ছোটগল্প আবার উপন্যাসের অঙ্গবিস্তার হতে শুরু করেছে। হরেক রকম সরকারী আধা সরকারী বেসরকারী পুরস্কারের মোহে লেখকদের বিবেক সততা বাস্তবচেতনা পর্দানশিন হয়েছে। বড় বড় প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকার আনুকূল্য এবং নেপথ্যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার হাতছানি লেখকদের জাত খোয়াতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ছোটগল্পকারদের শ্রেণীবিভাগ হয়েছে প্রকাশ্য অলক্ষ্যে। তাই গল্পের উপকরণ সংগ্রহে এই দশকের ছোটগল্পকাররা নির্বিচার নন, বরং উপকরণের সংকেতেই এই দশকের গল্পকারদের শ্রেণী নির্ণয় করা যায়। আর বিষয়ের দীনতা ঢাকার জন্য দেখা দিয়েছে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রয়োগপদ্ধতির অবান্তর অবহেলা, শব্দছক, দুর্বোধ্যতার সচেষ্ট আয়োজন, ক্ষুধার্ত প্রজন্মের বিকৃত বিলাপ, ছোটগল্প আন্দোলনের জন্য একাধিক পত্রপত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা। ছড়ানো-ছিটোনো শৌখিন গল্পকারদের মধ্যে কয়েকজন অবশ্য দশকের অন্তে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, বাকিরা পত্রিকাতেই দেহরক্ষা করেছেন।

তবে পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি এবং ষাটের দশকে বামপন্থী এবং প্রগতিশীল সাহিত্যপত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে ছোটগল্পের একটি বলিষ্ঠ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। কল্লোল ও কল্লোল-উত্তরপর্বের বাস্তববাদী জীবনধর্মী সমাজসচেতন কথাসাহিত্যিকরাই এই ধারার প্রবর্তক ছিলেন। তারপর স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস অনিবার্যভাবে এই ধারাটিকে পরিপুষ্ট করেছে। অর্থনৈতিক দুর্দশা, কলকারখানায় শ্রমিক অশান্তি, ছাত্র-আন্দোলন, কৃষকদের মধ্যে জোতদার-হানাদার-বিরোধী সংগ্রাম, কংগ্রেস-বিরোধী বামপন্থী গণ-আন্দোলন নাগরিক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী চিত্তে যে মোহভঙ্গ ও আদর্শচ্যুতির বিপন্ন বিস্ময় সৃষ্টি করেছে, বামপন্থী ছোটগল্পকারগণ তারই সূচীপত্র সংকলন করেছেন। পুরস্কার অর্থ খ্যাতি তাঁদের দায়িত্বকে পথভ্রষ্ট করেনি। চরিত্রহীন দেশশাসন, বেকারির বিভীষিকা, শহরতলীর বুভুক্ষা, অভিজাত সমাজের ব্যভিচার, কালোবাজারি, বিধ্বস্ত নাগরিক জীবন, মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস, গলিত মূল্যবোধ, অবক্ষয়, শূন্যতা কিছুই তাঁরা গোপন করেন নি। কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁদের গল্পে প্রকাশ পেয়েছে বামপন্থী আন্দোলনের অলীক স্বপ্ন, উজ্জ্বল রক্তাক্ত ভবিষ্যতের ব্যবহৃত আশাবাদ, গণবিক্ষোভের মার্কামারা পরিণাম সম্পর্কে তাত্ত্বিক ভাষ্য—আর সেখানেই ষাটের দশকের প্রগতিশীল ছোটগল্পকারদের সৃষ্টির সীমা নির্ধারিত হয়ে গেছে। আবার তারই পাশে পুরস্কার ভিখারি অনুগ্রহপ্রত্যাশী কিছু লেখক অর্থমূল্যে প্রতিভা বিক্রয় করে যৌন মনস্তত্ত্ব, নারীপ্রত্যঙ্গের জন্য লুব্ধ যৌবনের হাহাকার, সাংকেতিক দুরূহতা, বিচ্ছিন্নবাদের বিলাসিতা নিয়ে আর এক জাতের ছোটগল্পের পশরা সাজিয়েছেন। এইসব পরস্পর-

বিরোধিতা, স্ববিরোধিতা ও অস্তিনাস্তির টানাপোড়েনে ষাটের দশকের ছোটগল্পের বিচিত্র ইতিহাস গড়ে উঠেছে।

সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি চরিত্র প্রবণতা দশকের হিসাবে চলে না, তবু আলোচনার খাতিরে দশকের মোটা দাগ অনেক সময় কাজে লাগে। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি বাঙলা ছোটগল্প এসে দাঁড়িয়েছে। এই দশকের শুরু ভয়ংকর ভাঙনের মধ্য দিয়ে। অপচিত যৌবনের বিহ্বল বিলাপে পশ্চিম বাঙলার সমাজজীবন বিচলিত হয়ে উঠেছে ষাটের দশকের শেষ থেকেই। উন্মার্গ বামপন্থার নেশায় নির্বোধ তারুণ্য নিষ্ফল পাথরে মাথা কুটে মরেছে, ঘরছাড়া পলাতকের দল অন্ধকারচারী ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মত বনেজঙ্গলে নিরাশ্রয় অবস্থায় হন্যে হয়ে ঘুরেছে। দুঃসাহসী নির্ভীক বিপ্লবী একটা জাতির ধীরে ধীরে অপসংস্কৃতি ও জান্তব রাজনীতির ক্রীড়নকে পরিণত হচ্ছে। ছোটগল্পকাররা এখনো এই বাস্তব অসহায় সর্বনাশের ছবিকে নিষ্ঠুর নিরাসক্ত সত্যে ফোটাতে পারেন নি। এখনো গল্পকাররা ষাটের দশকের গুঞ্জনে জোড়কলমের কাজে আত্মবিস্মৃত। এখন ছোটগল্পের—সামগ্রিক বাঙলা কথাসাহিত্যেরই দুর্দিন। সাহিত্যকরা রাজনীতির তেজস্ক্রিয়তায় নির্জীব। ছোটগল্পের ঘুম কবে ভাঙবে জানি না।

বঙ্গসাহিত্য প্রসঙ্গে

স্নধাকর চট্টোপাধ্যায়

প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে বাংলার দান অসাধারণ। এমন একদিন এসেছিল যেদিন বাংলা সাহিত্যকে অগ্রগণ্য ক'রে বহির্বঙ্গীয় ভারতীয় সাহিত্যের আধুনিকীকরণ হয়েছিল। যে-কটি ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে আমার কিছুটা পরিচয় হয়েছে তাতে দেখেছি হিন্দী-ওড়িয়া-অসমীয়া এবং উর্দুতে কিছু পরিমাণে বাংলার অনুবাদ অনুসরণ ঘটেছে। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমি ইংরাজী হিন্দী ও বাংলা প্রবন্ধে ও গ্রন্থে তুলে ধরেছি। যাঁরা আগ্রহী তাঁরা আমার "আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান" এবং "রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য" বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থগুলি দেখবেন। এখানে বিস্তারিত আলোচনার স্থান নেই। কেবল সংক্ষেপে আরও কয়েকটি উল্লেখ্য কথা বলি—

(ক) ফরাসী ভাষাতে চণ্ডীদাসের পদাবলীর কিয়দংশের অনুবাদ হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। এই অনুবাদে অনুবাদিকা চণ্ডীদাসের কবিতাকে বলেছেন Song of Songs (le Cantique des Cantiques) এবং চণ্ডীদাসের কবিতাগুলির গদ্য অনুবাদ ক'রে বলেছেন এই মহান বাঙালী কবি (grand barde Bengali) লিখিত পদে আমার হৃদয় অভিভূত (mon ame est touchée par le charme du poeme)। অনুবাদে অনেক দোষ ত্রুটি আছে। তা আমি অন্যত্র আলোচনা ক'রে দেখিয়েছি। কিন্তু বাঙ্গালী হিসেবে এটি আমাদের পরম আনন্দের সামগ্রী। চণ্ডীদাস হ'তে রবীন্দ্রনাথ অনেক কালের ব্যবধান। কিন্তু একদিন শুনলাম আঁদ্রে জিদ-এর নিকট এক বিশিষ্ট বাঙ্গালী সাহিত্যিক যখন দেখা করতে যান তখন "গীতাঞ্জলি" অনুবাদের একটি গান তিনি গাইছিলেন "Tu as allumé dans mon Coeur le feu de la musique" (Thou hast illumined in my heart the fire of music) অর্থাৎ, তুমি দিলে জ্বালিয়ে আমার হৃদয়ে আগুন সুরের। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গানটি তাঁর মনের মধ্যে সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

(খ) প্রাক্ রবীন্দ্র বাংলার হেম-মধু-বঙ্কিম বহির্বঙ্গীয় ভারতীয় সাহিত্যে প্রবল প্রেরণা দিয়েছেন। হিন্দী সাহিত্যের আধুনিকীকরণে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই বলে যে হিন্দী সাহিত্যিকরা যেন "জ্ঞানবৃদ্ধা বড় বোন বাংলার রত্ন ভাণ্ডারের" সাহায্য নেন। ভারতেন্দু হ'তে আধুনিক কালের "নিরালা" পর্যন্ত অনেকেই সে পথে চলেছেন। মধুসূদনের মধু পান করে হিন্দী কবি হয়েছেন "মধুপ"। অনুবাদ করেছেন মৈথিলীশরণ "মেঘনাদ বধ"

"পলাশীর যুদ্ধ"। প্রবর্তিত করেছেন হিন্দীতে পনেরো অক্ষরের অমিত্রাক্ষর। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের অনুসরণ করে চতুর্দশ অক্ষরের অমিত্রাক্ষর এনেছেন ওড়িয়াতে কবি রাধানাথ রায়। তাঁর পূর্বপুরুষ বাঙ্গালী। অসমীয়াতে মধুসূদন দত্তকে 'বঙ্গ কবি কুলমণি' বলে উল্লেখ করে ভোলানাথ দাস "সীতাহরণ কাব্য' রচনা অমিত্রাক্ষরের ধারা প্রবাহিত করেছেন। অসমীয়া কবি দুর্গেশ্বর শর্মা বলেন, 'আমি বাঙ্গালী নই কিন্তু মধুসূদন তোমাকে প্রণাম করি' (ন হওঁ বঙ্গালী কিন্তু করিলোঁ প্রণাম)। পদ্মধর চালিহা বলেছেন, "বঙ্কিমর নিচিনা নভেল লিখিম"। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী হিন্দীতে (বালমুকুন্দ গুপ্ত) এবং অসমীয়াতে (লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার মধ্য দিয়ে নিজের আসন ক'রে নিয়েছেন।

(গ) বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ কেবল বাংলার নন সমগ্র ভারতের সাহিত্য-ক্ষেত্রে ঘরের লোক।

(ঘ) হিন্দী ওড়িয়াতে অনেক মৌলিক লেখা বলে স্বীকৃত রচনা আসলে বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ-অনুসরণ। যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ হিন্দীতে পণ্ডিত কেশবরাম ভট্ট লিখিত যে নাটকটি ("সজ্জাদ সম্বুল") দীর্ঘদিন পড়ানো হয়েছে তা বিখ্যাত বৃটিশ রাজরোষ উৎপাদনকারী উপেন্দ্রনাথ দাসের "শরৎ সরোজিনী" নাটকের হুবহু অনুবাদ। আর ওড়িয়াতে ফকীরমোহন সেনাপতির মৌলিক ছোট গল্প বলে সমাদৃত "পেটেন্ট মেডিসিন" গল্পটি মূলতঃ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'নিদিধ্যাসন' নামক একটি নাটকের না-বলা রূপান্তর।

(ঙ) হিন্দী সাহিত্যে বাংলার প্রভাব অত্যন্ত গভীর। এ বিষয়ে আমার আলোচনা গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ বেরোবার কয়েক বৎসর পর পঞ্জাব হ'তে শ্রীসমরেন্দ্রকুমার তনেজা আধুনিক হিন্দী নাটকের উপর বাংলা নাটকের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে ডক্টরেট পেয়েছেন। আমার পরম স্নেহভাজন তিনি আমার কাছে এসেছিলেন এবং আমার সামান্য ক্ষুদ্র আলোচনাকে আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক অনুসন্ধানের দ্বারা আরও তথ্যবহুল করেছেন। হিন্দী সাহিত্যে বাংলার বই মৌলিক বলে চালাবার বিরুদ্ধে অধ্যাপক শ্রীইন্দুকান্ত শুক্ল 'কুম্ভীলোপাখ্যান' বা 'গাঁটকাটার গল্প' গ্রন্থটি বার করেছেন। তাতে তিনি দেখিয়েছেন হিন্দী সাহিত্যের অনেক মহা মহা রথীরা কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাংলার গল্প হুবহু নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন।

(চ) উর্দু সাহিত্যে বাংলার প্রভাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। একটি আলোচনা বিদগ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেছে। আর একটি আলোচনা করেছেন আমার বন্ধু মৌলানা আজাদ কলেজের অধ্যাপক এম. এন. হাসনী "জবেদ নেহাল" সাহেব। তাঁর মূল উর্দু প্রবন্ধটি আমি বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছি তাঁর অনুরোধে। তাতে আমি জানতে পারলাম ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পূর্বপুরুষ রাজা জন্মেজয় মিত্র উর্দু কবি ('আরমান') হিসেবে খুবই শ্রদ্ধার আসন পেয়ে থাকেন।

তবে একালের বাংলা সাহিত্য সেকালের সম্মান পাচ্ছে না। আর আমরাও

কূপমণ্ডূক হয়ে গেছি। আমরা জানি না, হিন্দী সাহিত্য বাংলা সাহিত্য হ'তে অন্ততঃ অনুবাদ ও ভারতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক বেশী এগিয়ে গেছে। আমরা জানি না কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও তুলসীদাসের রামায়ণের অপূর্ব সুন্দর তুলনামূলক আলোচনাগ্রন্থ হিন্দীতে বেরিয়েছে। শ্রীচৈতন্য-বৈষ্ণব সাহিত্য ও হিন্দী বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিতরের যোগসূত্র নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা জানি না ভারতীয় একাঙ্ক সাহিত্য নিয়ে আলোচনাগ্রন্থ ও অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে হিন্দীতে। হিন্দীর জাগ্রত কৌতূহল আমাদের নেই। জিজ্ঞাসা নেই, 'তাই জ্ঞান নেই একালের বাংলার প্রতিবেশী সাহিত্য সম্বন্ধে। তাই আমি যখন হিন্দী-উর্দু-ওড়িয়ার কয়েকটি গল্প "প্রতিবেশিনী" নামে অনুবাদে গ্রন্থাকারে প্রকাশের কথা ভাবি তখন কানে আসে অন্য ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বাঙ্গালীর উদাসীনতা বা বিরূপ সমালোচনা। বাংলা সাহিত্য একদিন ভারতীয় সাহিত্যে অগ্রগণ্য হয়েছিল একথা ঠিক, কিন্তু আজকের ভারতীয় সাহিত্যে বাংলার সেই স্থান নেই এবং একথা সত্য, যে কারণেই হোক্ হিন্দী সাহিত্য যে পরিমাণ এগিয়ে চলেছে আমরা বাঙ্গালীরা তার কোনও খবর রাখি না। এটা ঠিক নয়। অন্য ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ কৌতূহল নিয়ে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে।

বিভাগীয় সংবাদ

বাংলা সাহিত্য পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যাটি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্মরণসংখ্যা-রূপে প্রকাশিত হইল। এই অংশের সমস্ত প্রবন্ধ বিভাগীয় অধ্যাপকদের দ্বারা রচিত। এই সংখ্যার ক্রোড়পত্রে পুনর্মিলন উৎসব প্রবন্ধাবলী শীর্ষক উপচ্ছেদে বিভাগের বাহির হইতেও কিছু কিছু প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইয়াছে। কী প্রসঙ্গে এই সমস্ত প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা উক্ত উপচ্ছেদের প্রারম্ভে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রধানতঃ বিদ্যুৎ সঙ্কটের জন্য পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল।

* * *

ডঃ শ্রীমতী সতী ঘোষ সাত বৎসর এই বিভাগে সুচারুরূপে অধ্যাপনা কর্ম নির্বাহ করিয়া গত আগস্ট মাসে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তৎপূর্বে তিনি লেডি ব্র্যাবোর্ণ কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধানা অধ্যাপিকা ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অবসর-জীবন শান্তিপূর্ণ হোক ইহাই আমাদের একান্ত কামনা।

ডঃ শ্রীযুক্ত প্রদ্যোত সেনগুপ্ত গত বৎসর আগস্ট মাসে (১৯৭৭) বাংলা বিভাগে অধ্যাপকপদে যোগদান করিয়াছেন। তিনি আমাদের পুরাতন ছাত্র। তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

* * *

বাংলা পুঁথিশালার প্রাক্তন সংরক্ষক ডঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র পাল অবসর গ্রহণের পর বাংলা প্রকাশনা বিভাগের সম্পাদক ডঃ শ্রীযুক্ত তুষার মহাপাত্র পুঁথিবিভাগও দেখাশুনা করিতেছেন। দীর্ঘকাল পরে পুঁথি-বিন্যাস, পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করা হইয়াছে, পুঁথিসমূহ পুনর্বিন্যস্ত হইয়াছে। কিছু কিছু পুঁথি প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে প্রকাশনাকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হইতেছে না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কৃত্তিবাস রামায়ণের আদিকাণ্ড প্রকাশনার জন্য পুঁথির পাঠ মেলান হইতেছে, শীঘ্রই সম্পাদনা ও মুদ্রণ আরম্ভ হইবে। সপ্তদশ শতাব্দীর ওড়িয়া কবি দ্বারিক দাস ওড়িয়া হরফে 'মনসামঙ্গল' নামে যে বাংলা কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহা বাংলা হরফে বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা প্রকাশনা বিভাগ হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ডঃ শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ পাণ্ডা এই কাব্য সম্পাদনা করিতেছেন। স্বর্গত শশিভূষণ দাশগুপ্ত সংগৃহীত নবচর্যাপদ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত মুসলমান কবিদের বৈষ্ণব পদসংগ্রহ, ডঃ শ্রীমতী উমা রায় সম্পাদিত পদামৃতসমুদ্র, ডঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস সম্পাদিত তন্ত্রবিভূতির মনসামঙ্গলকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থগুলির মুদ্রণকর্ম শীঘ্রই সমাপ্ত হইবে।

* * *

আঞ্চলিক অভিধান, শব্দকোষ ও লোকবৃত্ত সংকলনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা বিভাগের গবেষণা পরিষদের সংগ্রহ-কর্মে যে আর্থিক আনুকূল্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় গবেষকগণ পরিভ্রমণ করিয়া বহু আঞ্চলিক শব্দ, শব্দের ব্যবহার, উচ্চারণ,

শব্দের নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক স্বরূপ সম্বন্ধে বিস্তারিত উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। তাঁহার আনুকূল্যে গবেষক-গবেষিকাগণ পশ্চিম ও উত্তর বাংলার দুর্গম গ্রামাঞ্চলেও শব্দসংগ্রহকার্য সুষ্ঠুভাবে সমাধা করিতে পারিয়াছে। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য আমাদের বিভাগের ছাত্র ছিলেন, সুতরাং তাঁহার আনুকূল্যের উপর আমাদের একটা স্বাভাবিক দাবী আছে। ইহা ছাড়াও সরকারী কর্মচারী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ আমাদের এই প্রকল্পের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিতেছেন বলিয়া কাজটি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। ইতিমধ্যে বারো হাজারের অধিক আঞ্চলিক শব্দ, উচ্চারণ ও ব্যবহারের তালিকা সহ সংগৃহীত হইয়াছে। এই বৃহৎ কর্ম সমাধা হইলে এবং গবেষণার ফলাফল কয়েকটি বিশাল খণ্ডে প্রকাশিত হইলে আঞ্চলিক অভিধান সংকলনের একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইবে বলিয়া আশা করিতেছি।

* * *

এ বৎসরের পাঠচক্রটি পূর্বের মতোই নানাবিধ সাহিত্য-আলোচনায় উৎসাহ দেখাইয়াছে। বিভাগের অধ্যাপক ডঃ শ্রীযুক্ত প্রণবরঞ্জন ঘোষ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মানস মজুমদারের আন্তরিক সহযোগিতার ফলেই পাঠচক্রের অধিবেশন এতটা সক্রিয় হইয়াছে। বসন্তোৎসব, নবীনবরণ উৎসব, বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন প্রভৃতি অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সমাধা হইয়াছে। সঙ্গীত, আবৃত্তি ও বক্তৃতায় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ বিশেষ উৎসাহ ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। বাংলা বিভাগ যে একটি যৌথ পরিবার, তাহা এই সমস্ত অনুষ্ঠান হইতে বুঝা যাইবে। পাঠচক্রের উদ্যোগে কয়েকটি মূল্যবান আলোচনাসভাও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, অধ্যাপক ডঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ শ্রীযুক্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র গুপ্ত, কবি অমিয় চক্রবর্তী, নাট্যকার দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট আলোচকগণ নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের কৌতূহল বৃদ্ধি করিয়াছেন। বিদেশী সাহিত্য-সমালোচক মিঃ রিকার্ড ক্রীস্ট্ একদিন এই পাঠচক্রে যোগ দিয়া ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের সঙ্গে সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করেন। আচার্য সুনীতি-কুমার, পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন এবং অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়দের প্রয়াণে বিভাগে স্মরণসভার আয়োজন করা হইয়াছিল। শুধু চিন্তাশুদ্ধ আলোচনাই নহে, মাঝে মাঝে সঙ্গীতের অনুষ্ঠানও হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র মিত্রের নাম উল্লেখ করি। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতাকে গানে রূপান্বিত করিয়া পাঠচক্রের এক অধিবেশনে পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও কৌতূহলপ্রদ হইয়াছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরোধে শ্রীযুক্ত মিত্র সমকালীন কবিদের বহু কবিতা সুরারোপ করিয়া গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি কবিতা ও সঙ্গীতের এমন একটি যুক্তবেণী রচনা করিয়াছিলেন যে, বাংলা কাব্য-কবিতার আর একটি দ্বার খুলিয়া গেল তাহা বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করিবেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।